লীলাবতী

হুমায়ূন আহমেদ

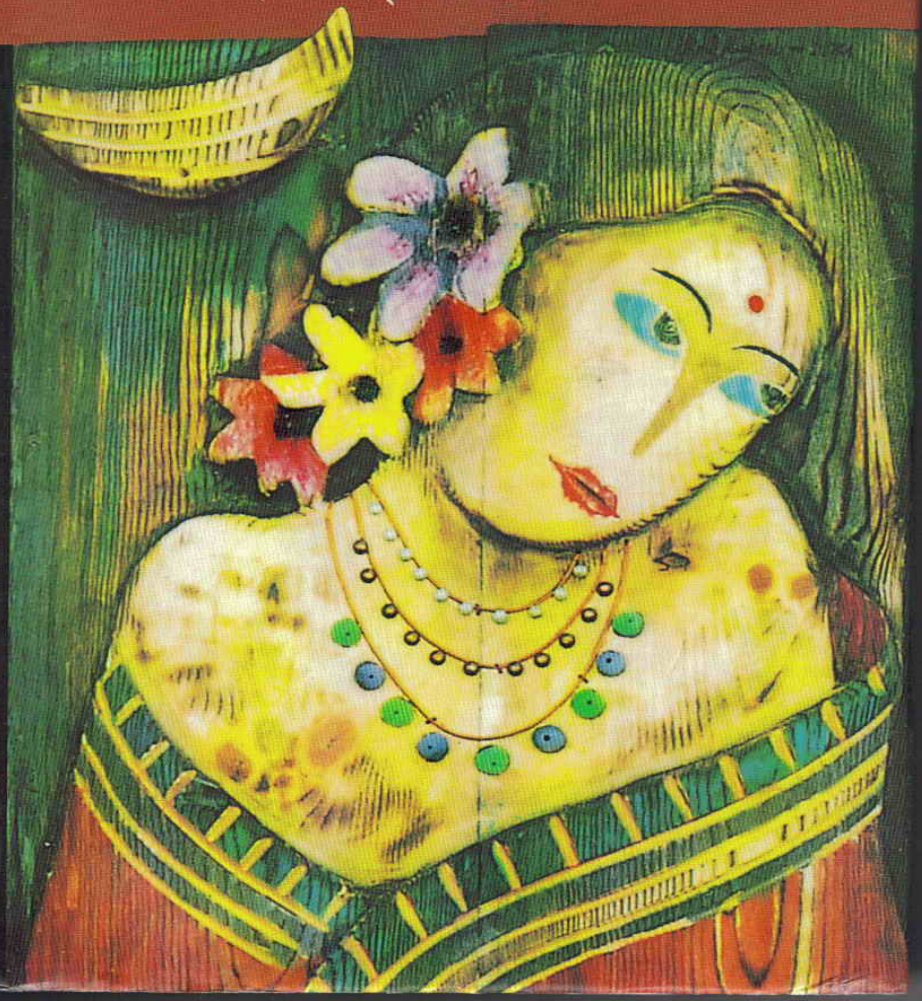

বিডিবাংলা ডট কম

বিডিবাংলা ডট কম

রেললাইনের উপর একটা বক বসে আছে। মেছো বক। এ ধরনের বক বিলের উপর উড়াউড়ি করে। অল্প পানিতে এক ঠ্যাঙ ডুবিয়ে মাছের সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের ডাঙায় আসার কথা না। আর যদি আসেও গম্ভীর ভঙ্গিতে রেললাইনে বসে থাকার কথা না। সিদ্দিকুর রহমান বিস্মিত চোখে বকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এর ঘটনাটা কী ? এ কী চায় ?

বকটা ধবধবে সাদা। পানির বকের পালক সাদাই হয়। সারাক্ষণই পানিতে ডোবাডুবি করছে। পালকে ময়লা লেগে থাকার কোনো কারণ নেই। ডাঙার বকের পালক এত সাদা না— বাদামি রঙ। মেছো বক পানিতে যেমন এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে থাকে, রেললাইনের উপরও এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নড়াচ্ছে না, শরীর নড়াচ্ছে না, স্থির দৃষ্টি। সিদ্দিকুর রহমানের বিস্ময় আরো প্রবল হলো, বকটা কী দেখছে ? বিলের পানিতে এভাবে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার অর্থ আছে— মাছের গতিবিধি লক্ষ করা। এখানে বকটার একদৃষ্টিতে রেললাইনের পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকার অর্থ কী ? সে কি রেললাইনের পাথর দেখছে ?

ঝিকঝিক শব্দ আসছে। ট্রেন চলে এসেছে। সিদ্দিকুর রহমান যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে ট্রেন দেখা যাচ্ছে না। ঘন জংলায় আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ট্রেন দেখা যাবে। বকটা এখনো নড়ছে না। রেললাইনের কম্পন তার অনুভব করার কথা। ধ্যান ভঙ্গ হবার সময় এসে গেছে। সিদ্দিকুর রহমান বুকের ভেতর সামান্য চাপ অনুভব করলেন। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তাঁর এরকম হয়। বুকে চাপ ব্যথা বোধ হয়। নিঃশ্বাসে কষ্ট হয়।

রেলের ইঞ্জিনটা এখন দেখা যাচ্ছে। কয়লার ইঞ্জিন। বুনকা বুনকা ধোঁয়া ছাড়ছে। কী সুন্দর দৃশ্য! বকটাকেও দেখা যাচ্ছে। বক আগের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। সিদ্দিকুর রহমান অস্থির বোধ করলেন। 'হুশ! হুশ!' শব্দ করে বকটাকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছে কিন্তু গলা কেমন যেন আটকে আছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। বুকে চাপ ব্যথা। তিনি তাকালেন রেলের ইঞ্জিনের

WWW.BDBANGLA.COM

দিকে। ভালো স্পিড দিয়েছে। ট্রেন ছুটে যাচ্ছে বকটার দিকে। সিদ্দিকুর রহমানের হঠাৎ মনে হলো, তিনি আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। গাঢ় ঘুমে তার চোখের পাতা নেমে এসেছে। চারদিকে অদ্ভুত এক শান্তি-শান্তি নীরবতা। বাতাস মধুর ও শীতল। বুকের ব্যথাটা নেই। নিঃশ্বাসের কষ্ট নেই।

একসময় তিনি চোখ মেললেন। অবাক হয়ে দেখলেন মাঠের উপর তিনি লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর বাঁ-দিকে প্রকাণ্ড শিমুল গাছ। গাছটার ছায়া পড়েছে তাঁর শরীরে। ছায়াটা এমনভাবে পড়েছে যেন মনে হচ্ছে তিনি একটা ছায়ার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর চোখের সামনে আশ্বিন মাসের মেঘশূন্য আকাশ। আকাশে দু'টা চিল উড়ছে। অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে। তাদের দেখাচ্ছে বিন্দুর মতো। তিনি উঠে বসলেন।

ফাঁকা মাঠ। আশেপাশে কেউ নেই। থাকার কথাও না। রেললাইনের উপর বকটা দাঁড়িয়ে নেই। সে ট্রেনের নিচে চাপাও পড়ে নি। চাপা পড়লে তার রক্তমাখা শরীর পড়ে থাকত। সিদ্দিকুর রহমান দুই হাতে ভর দিয়ে হেলান দেয়ার ভঙ্গিতে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। বিকেলের আলো দ্রুত কমে আসছে। রেললাইনের ওপাশের জলে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। কয়েকটা ক্যাচক্যাচি পাখি তার পায়ের কাছেই ঘোরাফেরা করছে। তিনি চাপা গলায় বললেন— 'হুশ! হুশ!' সেইসঙ্গে ডান পায়ে মাটিতে বাড়িও দিলেন। পাখিগুলি একটু দূরে চলে গেল— তবে ভয় পেয়ে উড়ে চলে গেল না। ক্যাচক্যাচি পাখিগুলি চড়ুই পাখির মতোই সাহসী। এরা মানুষের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। ধূসর বর্ণের পাখি। চোখ হলুদ। সারাক্ষণ ক্যাচক্যাচ করে বলেই নাম ক্যাচক্যাচি পাখি। তাদের আরো একটা বিশেষত্ব আছে— এরা সাতজনের একটা দল বানিয়ে থাকে। ক্যাচক্যাচি পাখির ঝাঁকে সবসময় সাতটা পাখি থাকবে। সাতের বেশিও না, কমও না। যদি কখনো কেউ দেখে দলে সাতটার কম পাখি আছে, তাহলে তার ঘনিষ্ঠ কোনো একজনের মৃত্যু ঘটে। অর্থহীন প্রচলিত প্রবাদ, তার পরেও ক্যাচক্যাচি পাখি দেখলেই সবাই পাখি গোনে। সিদ্দিকুর রহমানও গুনতে শুরু করলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। একটা পাখি তো কম! তিনি আবারো গুনলেন। পাখি ছয়টা। এর মানে কী ? পাখি ছয়টা কেন ?

ধুলাবালির উপর বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু তাঁর উঠতেও ইচ্ছা করছে না। বরং আবারো শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। সন্ধ্যা না মিলানো পর্যন্ত শুয়ে থাকলে মন্দ হয় না। সন্ধ্যা মিলাবে। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়বে। আজ চাঁদের নয় তারিখ, চাঁদের আলো আছে। সেই আলো কুয়াশায় পড়বে। কুয়াশাকে মনে

হবে চাঁদের আলোর হাওর। সেই হাওরের ভেতর দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া। খোলা মাঠে চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নানান বিষয়ে চিন্তা করতে খারাপ লাগার কথা না। তাঁর বয়স সাতান্ন। এই বয়সে মানুষ পার করে আসা জীবনের কথা চিন্তা করে। সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করে। কোনো হিসাবই মেলে না। এই বয়সটা হিসাব মেলানোর জন্যে ভালো না।

সিদ্দিকুর রহমান চারদিক দেখে নিয়ে আবারো শুয়ে পড়লেন। পাঞ্জাবিতে ধুলা যা লাগার লেগে গেছে। বাড়িতে পৌঁছে গরম পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে। বড় এক বালতি গরম পানিতে সামান্য কিছু কর্পূরদানা ছেড়ে দিয়ে আরাম করে গোসল। পানিতে কর্পূর দিয়ে গোসলের অভ্যাস তিনি পেয়েছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী আয়নার কাছ থেকে। কর্পূর দিয়ে গোসলের জন্যে আয়নার শরীরে কর্পূরের গন্ধ লেগে থাকত। কাপড়ে কর্পূরের গন্ধ লাগলে কাপড় বাসিবাসি মনে হয়। মানুষের গায়ে এই গন্ধ আবার অন্যরকম লাগে। আয়না কতদিন আগে চলে গেছে, কিন্তু তার অভ্যাস রেখে গেছে। মানুষ কখনো পুরোপুরি চলে যায় না। কিছু-না-কিছু সে রেখে যায়।

তিনি আয়নার চেহারা মনে করার চেষ্টা করলেন। চট করে চেহারা চোখে ভেসে উঠল। এটাও একটা আশ্চর্য হবার মতো ঘটনা। আগে অনেকবার চেষ্টা করেছেন, চেহারা মনে করতে পারেন নি। লম্বা মুখ, সরু কপাল, বড় বড় চোখ। চোখের রঙ বাদামি। একটা কিশোরী মেয়েকে শাড়ি পরিয়ে বড় করার চেষ্টা করলে যেমন দেখায় তাকে সেরকম দেখাচ্ছে। সে তরুণীও না, কিশোরীও না। দুয়ের মাঝামাঝি থেকেই আয়না তার ক্ষুদ্র জীবন শেষ করে গেল। আফসোসের ব্যাপার। খুবই আফসোসের ব্যাপার।

নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে তিনি যখন প্রথম বাড়িতে ঢোকেন তখন তাঁর দাদিজান ফুলবানু জীবিত। বুড়ির বয়স সত্তুরের উপরে। মেরুদণ্ড বেঁকে গেলেও শক্তসমর্থ শরীর। কানে শুনতে পান না কিন্তু চোখে খুব ভালো দেখেন। নতুন বউকে দেখে ফুলবানু বিরক্ত মুখে বললেন— শুনছি বউ হেন, বউ তেন। কই গায়ের রঙ তো ময়লা! ভালো ময়লা। তিন রাইজ্য খুঁইজ্যা কী বউ আনল ?

সিদ্দিকুর রহমানের এক ফুপু বললেন, আম্মা আপনি কী বলেন ? কী সুন্দর চাপা রঙ!

ফুলবানু বললেন, হাতের আর মুখের চামড়ার রঙ কোনো রঙ না। পেটের চামড়ার রঙ আসল। পেটের চামড়া দেখছো ? ও নতুন বউ, শাড়ির আঁচলটা টান দিয়া পেট দেখাও।

নতুন বউ দাদিজানের কথা শুনে কেঁদেকেটে অস্থির।

রাতে সিদ্দিকুর রহমান স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, দাদিজানের কথায় তুমি কিছু মনে করবে না। দাদিজান এরকমই। আয়না ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল, কেউ আমাকে কোনোদিন কালো বলে নাই।

কেউ বলে নাই, এখন একজন বলেছে। তাতে কী ?

তাতে অনেক কিছু।

সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, গায়ের রঙ কিছু না বউ। মনের রঙ আসল রঙ। মনের রঙ কালো না হলেই হয়।

নতুন বউ তাঁকে অবাক করে দিয়ে বলল, এটা তো ভুল কথা। আমার গায়ের রঙ কালো হলে আপনি কি আমাকে বিবাহ করতেন ? আপনারা প্রথম খুঁজেছেন রঙ। আপনারা সম্বন্ধ করতে গিয়ে কোনো মেয়ের মনের রঙ কী সেই খোঁজ নেন নাই। মনের রঙ দেখা যায় না। গায়ের রঙ দেখা যায়। আমি কি ভুল বলেছি ?

সিদ্দিকুর রহমান জবাব দেন নি, তবে স্ত্রীর উপর সামান্য বিরক্ত হয়েছেন। নতুন বউ মুখের উপর কটকট করে এত কথা বলবে কেন ? বাসররাতে স্বামী কথা বলবে, স্ত্রী লম্বা ঘোমটা টেনে বসে থাকবে। মাঝে মাঝে হ্যাঁ-নাসূচক মাথা নাড়বে। এটাই চিরকালের নিয়ম।

নতুন বউয়ের মুখের উপর কথা বলার এই স্বভাব অল্পদিনেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই মেয়ে মুখ বন্ধ রাখে না। কেউ কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। ফুলবানু নাতবউয়ের উপর খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি তার নাম দিলেন— 'কটর কটর পক্ষী'। বাড়িতে কেউ এলেই ফুলবানু আয়োজন করে নতুন বউয়ের নতুন নাম শুনিয়ে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে গল্প করতে বসেন— ভাটি অঞ্চলের মেয়ে। পানির মধ্যে বড় হইছে। পাইন্যা স্বভাব হইছে। পাইন্যা স্বভাব কী বুঝলা না ? পানি কী করে ? গড়াইয়া চলে। নয়া বউ গড়াইয়া চলে। সবসময় গড়াইতেছে। মেয়ের কেমন বাপ-মা কে জানে! কোরান মজিদ পাঠ করতে শিখে নাই। নাতবউরে সেদিন বললাম— কোরান মজিদ পাঠ কইরা শুনাও। সুরা ইয়াসিন পাঠ করো। নাতবউ বলল, সে কোরান মজিদ পড়তে শিখে নাই। তোমরা কেউ এমন কথা কোনোদিন শুনছো— মেয়েরে কোরান মজিদ পাঠ করতে না শিখাইয়াই মেয়ে বিবাহ দিয়েছে ? ছি ছি ছি! ঝাড়ু মারি এমন বাবা-মা'র মুখে। এরা শিয়াল কুত্তার অধম।

আয়না কোরান মজিদ পাঠ করতে পারে না শুনে সিদ্দিকুর রহমানও বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি মনের বিরক্তি চেপে রেখে বলেছিলেন— কোরান মজিদ পাঠ করতে পারাটা খুবই প্রয়োজন। তুমি শিখে নাও। জুম্মাঘরের

মওলানা সাহেবরে বলব। তুমি বোরকা পরে তাঁর কাছে সবক নিবা। আয়না তাঁকে বিস্মিত করে বলেছিল, কোরান মজিদ তো আমি পড়তে পারি।

পড়তে পারো তাহলে দাদিজানের কাছে মিথ্যা বললে কেন ?

উনি কানে শোনেন না। উনি কোরান মজিদ পাঠ কী শুনবেন ?

তোমাকে পড়তে বলেছে তুমি পড়বে। উনি শুনতে পান কি পান না সেটা উনার ব্যাপার।

উনার কোনো কথা আমি শুনব না।

কেন শুনবে না ?

উনি আমার সাথে অশ্লীল কথা বলেন।

কী অশ্লীল কথা ?

সেটা আমি বলতে পারব না। আমি মুখে আনতে পারব না।

গ্রামদেশের বৃদ্ধারা নাতবউয়ের সঙ্গে অশ্লীল কথা বলে। এতে দোষ হয় না।

দোষ-গুণের কথা না। আমার ভালো লাগে না।

তোমার ভালো লাগা দিয়ে তো দুনিয়া চলবে না।

না চললে না।

সিদ্দিকুর রহমান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি দুষ্ট প্রকৃতির মেয়ে।

আয়না সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি দুষ্ট প্রকৃতির মেয়ে না। আপনার দাদি দুষ্ট প্রকৃতির। আপনিও দুষ্ট প্রকৃতির। দুষ্ট দাদির নাতি দুষ্ট হয়।

সিদ্দিকুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, আমার সম্পর্কে যা ইচ্ছা বলো কোনো ক্ষতি নাই কিন্তু আমার দাদি সম্পর্কে এই ধরনের কথা আর কোনোদিন বলবে না। শৈশবে আমার মা-বাবা মারা গিয়েছিলেন। আমাকে মানুষ করেছেন আমার দাদিজান। এটা মাথায় রাখবা।

আয়না শান্ত গলায় বলেছে, এটা আপনি মাথায় রাখেন। উনি আপনাকে মানুষ করেছেন। আমাকে করেন নাই। আমি উনাকে দুষ্ট মহিলা বলব।

এই পর্যায়ে সিদ্দিকুর রহমান রাগ সামলাতে পারেন নি। আয়নার গালে চড় বসিয়ে দিলেন। আয়না ব্যাপারটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে খাটের এক কোনায় বসেছিল— খাট থেকে হুড়মুড় করে নিচে পড়ে গেল। সিদ্দিকুর রহমান ধরতে গেলেন। তার আগেই আয়না উঠে পড়ল। শান্ত ভঙ্গিতে খাটের যে জায়গায় আগে বসেছিল সেই জায়গায় বসল। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে বলল, আপনার দাদিজান আমার শরীর শুঁকে বলেছেন— আমার শরীরে শয়তানের গন্ধ আছে। আপনার গায়ের গন্ধ উনি চিনেন। আপনার গায়ের গন্ধ

WWW.BDBANGLA.COM

না-কি আমার শরীরে নাই। প্রথম যে-পুরুষের সঙ্গে মেয়ে শোয় সেই পুরুষের গন্ধ গায়ে লেগে যায়। আমি না-কি বিয়ের আগে অন্যপুরুষের সঙ্গে শুয়েছি। সেই পুরুষের টক-টক গন্ধ আমার গায়ে আছে। যে মহিলা এমন কথা বলেন তাকে আমি দুষ্ট মহিলা বলব।

সিদ্দিকুর রহমান কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। স্ত্রীর গালে চড় মারার ব্যাপারটায় তিনি নিজেও হকচকিয়ে গেছেন। এখন আয়না কী বলছে সেটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না। তাঁর উচিত এখনি স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়া। কীভাবে চাইবেন তাও বুঝতে পারছেন না।

আয়না বলল, আমি কাল সকালে বাপের বাড়ি চলে যাব। আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। যদি না করেন তাহলে আমি নিজেই চলে যাব। যতদিন আপনার দাদি জীবিত থাকবেন ততদিন আমি আসব না। উনার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পর আসব।

এটা কেমন কথা ?

কেমন কথা আমি জানি না। আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো কথাই নাই। কাল সকালে আমাকে বাপের দেশে পাঠাবেন।

মুখে বললে তো হয় না, আয়োজন করতে হবে। সঙ্গে লোক দিতে হবে। একা তোমাকে কোনোদিনই ছাড়ব না।

লোক জোগাড় করেন। যতদিন না লোক জোগাড় হয়েছে ততদিন আমি এই বাড়ির কিছু খাব না। পানিও না।

তুমি বাড়াবাড়ি করছ।

মানুষমাত্রই অল্পবিস্তর বাড়াবাড়ি করে। আপনিও করেন। আমিও করি। আপনি চড় দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন, আমিও খাওয়া বন্ধ করে বাড়াবাড়ি করব।

এই বলেই খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আয়না শুয়ে পড়ল। সিদ্দিকুর রহমান অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, আয়না ঘুমিয়ে পড়েছে।

আয়না সত্যি সত্যি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিল। সিদ্দিকুর রহমান নানানভাবে চেষ্টা করলেন, কোনো লাভ হলো না। তার পরের দিন দুপুরে নান্দাইল রোড স্টেশনে তিনি স্ত্রীকে তুলে দিতে গেলেন। ট্রেনের কামরায় ওঠার পর আয়না এক চুমুক পানি খেয়ে তার অনশন ভঙ্গ করল।

ফুলবানু ঘোষণা করলেন, আয়নাকে ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টা করলে তিনি সবার সামনে গুড়ের শরবতে ইঁদুর-মারা বিষ গুলে খাবেন। যদি না খান তাহলে

তিনি সতী মায়ের সতী কন্যা না। বাজারের বেবুশ্যা। তিনি শুধু যে একা বেবুশ্যা তা না, তাঁর মাও বেবুশ্যা। তার পরেও সিদ্দিকুর রহমান আয়নাকে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেছেন। নিজে গিয়েছেন কয়েকবার। লোক পাঠিয়েছেন। আয়না রাজি হয় নি। তার এক কথা— যতদিন বুড়ি বেঁচে থাকবে ততদিন আমি যাব না। বুড়ি যেদিন মারা যাবে তার পরদিন আমি উপস্থিত হব।

আয়না পরের বছরই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল। ফুলবানু আরো এগার বছর বেঁচে রইলেন। শেষের দিকে ফুলবানু চোখে দেখতে পেতেন না। একেবারেই কানে শুনতে পেতেন না। হাঁটাচলার শক্তি নেই। ঘা হয়ে শরীর পচে গেল। চিত-কাত করে শোয়াতে গেলে হাত দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না। কচি কলাপাতা গায়ের উপর দিয়ে ধরতে হয়। সেই কলাপাতাও গায়ে লেগে যায়। পাতা টেনে তোলার সময় তিনি ব্যথায় চিৎকার করেন। এমন অবস্থাতেও মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে কথা বলার শক্তি এবং প্রবল ঘ্রাণশক্তি নিয়ে তিনি বেঁচে রইলেন।

বয়সের সঙ্গে এই দু'টি শক্তি বেড়েছে। বাড়ির সীমানার ভেতর কেউ ঢুকলেই তিনি গন্ধ শুঁকে শুঁকে বলে দেন কে ঢুকেছে।

'পাকনা বড়ই খাইয়া কে ঘরে ঢুকছে ? কে ঢুকছে ? লাটসাবের নাতি হও আর যে-ই হও মুখ ধুইয়া আয়। চুকা গন্ধ আসতাছে। চুকা গন্ধে বয় (বমি) আসতাছে। যে আসছে সে তো পিসাব কইরা পানি নেয় নাই। আমি পিসাবের গন্ধও পাইতেছি।'

ততদিনে সিদ্দিকুর রহমান দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। স্ত্রীর নাম মোসাম্মত রমিলা খাতুন। থালার মতো গোলাকার মুখ। রুগ্ন শরীর কিন্তু কাজ করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা। রমিলার উপর ভার পড়ল ফুলবানুর সেবা-শুশ্রূষার। রমিলা খুবই দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দাদিশাশুড়ির সেবা করতে শুরু করল। ফুলবানুর রমিলাকে পছন্দ হলো। সারারাত ফুলবানুর ঘুম হয় না। গল্প করার জন্যে রমিলাকে ডেকে আনেন। গলা নিচু করে জগতের অশ্লীলতম গল্প করতে থাকেন। বিকারগ্রস্ত মানুষের প্রলাপ। রমিলাকে মাথা নিচু করে শুনতে হয়। একটু পরে পরে 'হুঁ' বলতে হয়।

'ও নাতবউ শোনো, ঘোড়ার চেট দেখছো ? দেখো নাই ? না দেখলে গফ যেটা করতেছি এইটা বুঝবা না। সিদ্দিকরে বলো মর্দ ঘোড়া একটা আনতে। ঘোড়ার পুটকিতে ঝাড়ু দিয়া খোঁচা দিলে ছলাৎ কইরা বাইর হয়। একটা দেখনের মতো জিনিস। হি হি হি হি।'

মৃত্যুর তিন মাস আগে ফুলবানুর জবান বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ঠোঁট নাড়েন, জিভ নাড়েন— কোনো শব্দ বের হয় না। এই সময় তাঁর শরীর থেকে তীব্র পচা গন্ধ বের হতে শুরু করল। সিদ্দিকুর রহমান বসতবাড়ি থেকে অনেক দূরে পুকুরপাড়ে তড়িঘড়ি করে ছনের ঘর তুলে তাঁর দাদিজানকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সেবা করার জন্যে রমিলা সঙ্গে গেল। জুম্মাঘরের মওলানা সাহেবকে এনে ফুলবানুর মৃত্যু প্রার্থনা করে বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা হলো। এক লক্ষ দশ হাজার বার দুরুদে শেফা পাঠ করা হলো। তার পরেও মৃত্যু আসে না।

রাত একটু বাড়লেই পুকুরপাড়ের ছনের ঘরের চারপাশে শিয়াল হাঁটাহাঁটি করে। রমিলা ঘরের ভেতরও মানুষজনের হাঁটাহাঁটির শব্দ পায়। তাদের ফিসফাস কথা শোনে। এরা এই জগতের মানুষ না— বিদেহী আত্মা। হয়তো ফুলবানুর মৃত পিতামাতা। তাদের সন্তানকে দেখতে এসেছে। ভয়ে রমিলার হাত-পা কাঁপে। রমিলা ভয় প্রকাশ করে না। খাটের চার মাথায় চারটা হারিকেন জ্বালিয়ে আয়াতুল কুরসি পড়ে রাত কাটায়। মাঝে মাঝে তার কাছে মনে হয়, কে যেন পেছন থেকে তার ঘাড়ে হিমশীতল নিঃশ্বাস ছাড়ে। সে পেছন ফিরে তাকায় না। মাথা আরো নিচু করে কোরানশরিফের পাতা উল্টায়। পেছনে তাকালে সত্যি সত্যি যদি কিছু দেখা যায়! কী দরকার?

এক শ্রাবণ মাসের মধ্যরাতে রমিলার মুক্তি ঘটল। ফুলবানু হঠাৎ গোঙানি ধরনের শব্দ করে নিথর হয়ে গেলেন। রমিলা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। ফুলবানুর ঘরের দরজা ভালোমতো বন্ধ করে পুকুরপাড়ে চলে গেল। গায়ে সাবান ডলে মনের আনন্দে সাঁতার কেটে পুকুরে গোসল করল। ভেতর বাড়িতে ফিরে এসে ভেজা কাপড় বদলে পাটভাঙা নতুন একটা শাড়ি পরল। চুল বাঁধল। চোখে কাজল দিল। সূর্য ডোবার পর আয়নায় নিজেকে দেখা নিষেধ, তার পরেও অনেকক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখে সিদ্দিকুর রহমানের শোবার ঘরের বন্ধ দরজার কড়া নাড়ল। সিদ্দিকুর রহমান ভীত গলায় বললেন, কে? কে?

রমিলা শান্ত গলায় বলল, আমি। খারাপ সংবাদ আছে। আপনার দাদিজান মারা গেছেন।

কী সর্বনাশ! বলো কী! কখন?

এই তো কিছুক্ষণ। দরজা খোলেন।

তিনি দরজা খুলে স্ত্রীকে দেখে খুবই অবাক হলেন। মরা-বাড়িতে সে এত সাজগোজ করেছে কেন? তার কি মাথায় গোলমাল হয়েছে! যে-যন্ত্রণা তার উপর দিয়ে গিয়েছে মাথায় গোলমাল হবারই কথা।

রমিলা বলল, আপনি যান মুনশি-মওলানা খবর দেন, আত্মীয়স্বজন খবর দেন। আমি কিছুক্ষণ শান্তিমতো ঘুমাব। অনেকদিন আমি শান্তিমতো ঘুমাইতে পারি না। কেউ যেন আমারে না ডাকে।

মারার সময় দাদিজান কি কিছু বলেছেন? অনেক সময় মৃত্যুর আগে-আগে জ্ঞানবুদ্ধ মানুষের জবান খুলে যায়। কথা বলে। দাদিজান কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ, বলেছেন। তিনি বলেছেন আপনি যেন আপনার প্রথম স্ত্রীর সন্তানটাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসেন। নিজের সন্তান অন্যখানে মানুষ হবে এইটা কেমন কথা?

সত্যি বলেছেন?

রমিলা ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না, দাদিজান কিছু বলেন নাই। মারার সময় তাঁর জবান খুলে নাই। এইটা আমার নিজের কথা। আপনার প্রথম স্ত্রীর যে মেয়েটা আছে সে এখন কত বড়?

অনেক বড় হয়েছে। দশ-এগার বছর। সে আসবে না। আগেও কয়েকবার চেষ্টা করেছি। তার মামারা দেয় না। সেও আসতে চায় না।

আপনার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করতে তো দোষ নাই। মেয়েটার নাম কী?

ভালো নাম লীলাবতী। সবাই লীলা বলে ডাকে।

বাহ, সুন্দর নাম— লীলা! তারা যদি দুই ভইন থাকত তাইলে পরের ভইনের নাম হইত খেলা। দুই ভইনের একত্রে নাম— লীলা-খেলা।

বলতে বলতে রমিলা হেসে ফেলল। শব্দ করে হাসি। হাসির দমকে তার স্তনের কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। একসময় সে হাসি সামলাবার জন্যে মুখে বালিশচাপা দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। মাথার ঘোমটা খুলে শাড়ির আঁচল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সিদ্দিকুর রহমান অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, হাসো কেন?

রমিলা বলল, জানি না কেন হাসি।

হাসি থামাও।

থামাইতে পারতেছি না।

সে হাসতেই থাকল।

রমিলার মাথা-খারাপের লক্ষণ সেদিনই প্রথম প্রকাশ পেল।

হাসি থেমে গেছে। সিদ্দিকুর রহমান আগের জায়গাতেই বসে আছেন। এখনো শীত লাগার কথা না, কিন্তু শীত-শীত লাগছে। সারা শরীরে আরামদায়ক

আলস্য। একটা কম্বল থাকলে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে থাকা যেত। সেটা মন্দ হতো না। গায়ের উপর হিম পড়ত। শীতের প্রথম হিমের অনেক গুণাগুণ আছে। আয়ুর্বেদিক কিছু ওষুধে প্রথম শীতের শিশিরের ব্যবহার আছে।

তিনি উঠে বসলেন। দীর্ঘ ঘুমের পরে শরীরে ভোঁতা ভাব চলে আসে, সেই ভাবটা আছে। হাত-পা ভারি-ভারি লাগছে। বাড়ির দিকে রওনা হতে ইচ্ছা করছে না। বরং ইচ্ছা করছে রেললাইনের স্লিপারে পা দিয়ে হাঁটা শুরু করতে। তিনি একজন সুখী এবং পরিতৃপ্ত মানুষ। সুখী মানুষদের মধ্যেই হঠাৎ বৈরাগ্য দেখা দেয়। অসুখী মানুষরা সাধু-সন্ন্যাসী হয় না। তৃপ্ত পরিপূর্ণ মানুষরাই হয়।

বৈষয়িক দিক দিয়ে তিনি সফল মানুষ না। বাড়ি-ঘর, দিঘি জলমহালের তাঁর যে বিশাল সাম্রাজ্য সেটাও পূর্বপুরুষের করে যাওয়া। তিনি পূর্বপুরুষের সম্পদ রক্ষা করে যাচ্ছেন। এর বেশি কিছু না।

ভোগী মানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি তাও না। 'শহরবাড়ি' নামের সুন্দর বাংলো বাড়ি ছেড়ে তিনি বাস করেন মূল বাড়িতে। মূল বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দুই দিকেই ঘন জঙ্গল। হাওয়া একেবারেই আসে না। গরমের সময় কষ্ট হয়। তালের পাখা পানিতে ভিজিয়ে বাতাস করতে হয়। গরমের সময় হাওয়া করার জন্যে তাঁর নিজস্ব একজন লোক আছে। তার নাম বদু। সে সারারাত একতালে পাখা করে যেতে পারে। তিনি বদুকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। উত্তরবন্দে বদুকে তিনি দুই বিঘা ধানী জমি দিয়েছেন। মুখে-মুখে দেয়া না— দলিলপত্র করে দেয়া। দাতা হিসেবে তাঁর কোনো সুনাম নেই। বিত্তবান মানুষরা এক পর্যায়ে স্কুল দেয়, মাদ্রাসা দেয়, নতুন মসজিদ বানায়। সিদ্দিকুর রহমান সেদিকে যান নি— তবে তিনি তাঁর নিজের খুব কাছের মানুষদের জন্যে অনেক করেছেন। লোকমান এবং সুলেমান এই দুই ভাইকেও এক বিঘা করে জমি দিয়েছেন। ঘর তুলে দিয়েছেন। এই দুই ভাই তাঁর পাহারাদার। এরা সারারাত বাড়ির উঠানে বসে থাকে। লোকমানের হাতে থাকে টোটাভরা দোনলা বন্দুক। সুলেমানের হাতে অলঙ্গা। তালকাঠ দিয়ে বানানো বর্শাজাতীয় অস্ত্র। অলঙ্গাচালনায় সুলেমান অত্যন্ত পারদর্শী।

অতি বিত্তবান মানুষদের শত্রু থাকবেই। তাঁরও আছে। উপগ্রহের মতো তারা তাঁকে ঘিরে পাক খায়। তাঁকে সাবধান থাকতে হয়। দিনেরবেলা একা ঘুরে বেড়ালেও রাতে তা করা যায় না। লোকমান এবং সুলেমানকে সঙ্গে রাখতে হয়। তিনি সাবধান থাকেন।

রেললাইনের স্লিপারে পা দিয়ে অতি দ্রুত কে যেন আসছে। কুয়াশার কারণে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাঁটার ভঙ্গিতেই সিদ্দিকুর রহমান

বুঝে ফেলেন— লোকমান। তাঁর খোঁজে আসছে। লোকমান জানে চেয়ারম্যান সাহেবের রেললাইনের পাশ ধরে হাঁটার অভ্যাস আছে। প্রথমে সে খোঁজ নিতে এসেছে রেল সড়কে।

তিনি গলা-খাঁকারি দিলেন। এতদূর থেকে গলা-খাঁকারির শব্দ শুনতে পাবার কথা না। কিন্তু লোকমান ঠিকই শুনল। থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং মাথা সামান্য নিচু করে দ্রুত তাঁর দিকে আসতে শুরু করল। সিদ্দিকুর রহমান এক ধরনের তৃপ্তি বোধ করলেন। অর্থ-বিত্তের মতো লোকমানও এক ধরনের সম্পদ। এই সম্পদের গুরুত্বও কম না।

কোনো খবর আছে লোকমান?

জি-না।

মাগরেবের ওয়াক্ত কি হয়েছে?

লোকমান চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করে হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল। যদি হাতের পশম না দেখা যায় তাহলে সূর্য ডুবে গেছে। মাগরেবের নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম আকাশ লাল থাকতে থাকতে নামাজটা পড়ে ফেলতে হয়।

লোকমান বলল, জি, নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে।

নামাজের ব্যবস্থা করো। নামাজ পড়ে তারপর যাব। ওজুর পানি লাগবে না। ওজু আছে।

লোকমান অতি দ্রুত গাছের শুকনা পাতা সরিয়ে নিজের গায়ের চাদর পেতে দিল। গায়ের চাদর সরানোয় লোকমানের কাঁধে রাখা বন্দুক দেখা যাচ্ছে। সে বন্দুক মাঠে শুইয়ে রেখে ঝিম ধরার মতো করে বসে আছে। বন্দুকের মাথা পূর্বদিক করে রাখা। বন্দুকের মাথা কখনো পশ্চিম দিক করে রাখতে নাই।

সিদ্দিকুর রহমান নামাজ শেষ করলেন। অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে দোয়া করলেন। অদ্ভুত দোয়া। তিনি বললেন, হে রহমানুর রহিম, তুমি রমিলার প্রতি তোমার রহমত প্রকাশ করো। তুমি তার মৃত্যু দাও। আমি তোমার পাক দরবারে তোমার বান্দার মৃত্যু কামনা করছি। এই অন্যায় দোয়ার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো পরাশক্তি।

চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। বনের ভেতরে শিয়াল ডাকতে শুরু করেছে। এতবছর শিয়ালের ডাক প্রায় শোনেনই নি। এই বছর শিয়ালের উপদ্রব বেড়েছে। প্রায়ই হাঁস-মুরগি খাচ্ছে। এত শিয়াল কোত্থেকে এসেছে কে জানে? বন্য পশু-পাখি কখনো এক জায়গায় থাকে না। তারা জায়গা বদল করে। মানুষও তো এক

অর্থে পশু। তার ভেতরেও জায়গা বদলের প্রবণতা আছে। কিন্তু সে জায়গা বদলায় না। সে চেষ্টা করে শিকড় গেড়ে বসতে। বাড়ি-ঘর বানায়। গাছপালা লাগায়। এমন ভাব করে যেন সে থিতু হয়েছে। অথচ সে কখনো থিতু হয় না। সে সবসময়ই জায়গা বদলের অস্থিরতা নিয়ে বাস করে।

সিদ্দিকুর রহমান চাদর থেকে নামলেন। চাপা গলায় ডাকলেন, লোকমান!

লোকমান ছুটে এলো।

সাথে টর্চ আছে?

জি আছে।

চলো রওনা দেই।

জি আচ্ছা।

সিদ্দিকুর রহমান ইতস্তত করে বললেন, চলো একটা কাজ করি। বাড়িতে না গিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটি। উত্তরদিকে যাই।

জি আচ্ছা।

সিদ্দিকুর রহমান বকটা যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেখানে উপস্থিত হলেন। লোকমান কোনো কথা না বলে তাঁর পেছনে পেছনে আসছে। একে বলে আনুগত্য। এ-ধরনের আনুগত্য আজকাল পাওয়া যায় না। তাঁর ভাগ্য ভালো তিনি পেয়েছেন। তিনি যা করতে বলবেন লোকমান তা-ই করবে। কোনো প্রশ্ন করবে না। আচ্ছা, তিনি যদি লোকমানকে বলেন— লোকমান, তুমি রেললাইনের উপর বসে থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত নড়বে না। ট্রেন গায়ের উপর এসে পড়লেও নড়বে না। তাহলে সে কি শুনবে?

লোকমান!

জি?

পান খেতে ইচ্ছা করছে। পানের বাটা নিয়ে আসো। আর সবাইকে বলে আসো, আমার ফিরতে সামান্য দেরি হবে।

একলা থাকবেন?

হ্যাঁ, একাই থাকব। কোনো অসুবিধা নাই। টর্চটা আমার কাছে দিয়ে যাও। শোনো লোকমান, আমি হাঁটা ধরছি। উত্তর দিকে যাব। তুমি তাড়াতাড়ি এসে আমাকে ধরো।

কথা শেষ করার আগেই লোকমান প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করেছে। সিদ্দিকুর রহমান জানেন তিনি বেশিদূর যেতে পারবেন না, তার আগেই লোকমান উপস্থিত হবে। লোকমান একা আসবে না, সঙ্গে সুলেমানকে নিয়ে

আসবে। তারা দুই ভাই তাঁর পেছনে পেছনে এগোতে থাকবে। এরা দুইজন যেন তাঁর ছায়া। মানুষের একটা ছায়া পড়ে, তাঁর পড়ে দুই ছায়া।

সিদ্দিকুর রহমান হাঁটতে শুরু করলেন। রেললাইনের পাশেই বন। বনের ভেতর জমাটবাঁধা অন্ধকার। সেখানে জোনাকি পোকা জ্বলছে। একটা-দু'টা জোনাকি না— শত শত জোনাকি। একসঙ্গে এত জোনাকি তিনি অনেকদিন দেখেন নি। শেষ কবে দেখেছিলেন মনে করার চেষ্টা করলেন। তাও মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে, তিনি ঘন জঙ্গলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন। চারদিকে শত শত জোনাকি। কিছু জোনাকি তাঁর নাকে-মুখে এসে পড়তে শুরু করল। জোনাকির শরীর থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কবে ঘটেছে এই ঘটনা? কবে?

কেউ কি রেললাইনে বসে আছে? সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমানের হাতে টর্চ। টর্চের আলো ফেললেই ঘটনা কী বুঝা যায়। কিন্তু তাঁর টর্চের আলো ফেলতে ইচ্ছা করছে না। জিন ভূত না তো? অঞ্চলটা খারাপ। অনেকেই কী সব দেখেছে— রেললাইন ধরে হেঁটে যায়। শিস বাজায়।

সিদ্দিকুর রহমান আরো কিছুদূর গেলেন। যে বসেছিল সে উঠে দাঁড়িয়েছে। জিন হলে উঠে দাড়াত না। কুয়াশায়ে মিলিয়ে যেত।

কে?

ছায়ামূর্তি বলল, স্যার আমি।

এখানে কী করো?

ছায়ামূর্তি জবাব দিল না। মনে হয় তার কাছে জবাব নেই। সিদ্দিকুর রহমান এগিয়ে গেলেন। ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হলো। সে তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দিল।

ছায়ামূর্তির নাম আনিস। সিদ্দিকুর রহমানের দুই মেয়ের জায়গির মাস্টার। এই লোকের একা একা রেললাইনে বসে থাকার অভ্যাস আছে সিদ্দিকুর রহমান জানতেন না। তাকে নিরীহ গোবেচারা ধরনের মানুষ বলেই জানতেন।

এখানে কী করছো?

কিছু করছি না। বসে ছিলাম।

তুমি কি প্রায়ই এদিকে আসো?

আনিস জবাব দিল না। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, চলো আমার সঙ্গে। হাঁটি।

রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটাপথ। চাঁদের আলোয় রেললাইন চকচক করছে, সেই সঙ্গে পায়ে চলা পথও চকচক করছে। সিদ্দিকুর রহমান আগে

বিডিবাংলা ডট কম

আগে যাচ্ছেন। আনিস তাঁর পেছনে। আনিসের গায়ে ছাই রঙা চাদর। দূর থেকে চাদরটা সাদা দেখাচ্ছিল। এর কী কারণ হতে পারে? সিদ্দিকুর রহমানের মাথায় এই প্রশ্ন ঘুরছে।

আনিস!

জি স্যার।

বাংলা তারিখ কত?

কার্তিকের ছয় তারিখ। তেরশ' সাতান্ন।

সিদ্দিকুর রহমান হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আনিস পিছিয়ে পড়েছিল। তিনি হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার সঙ্গে কি সিগারেট আছে?

আনিস অপ্রস্তুত গলায় বলল, জি আছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, দাও একটা সিগারেট খাই।

আনিস সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। অতি সস্তার বক সিগারেট। সিদ্দিকুর রহমানের মতো মানুষের হাতে এই সিগারেট দেওয়া যায় না।

মাস্টার শোনো, আজ থেকে তিনশ' বছর আগে আমার পূর্বপুরুষ এই অঞ্চলে এসেছিলেন। তার নাম নওরোজ খাঁ। পাঠান বংশের মানুষ। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর স্ত্রী এবং পাঁচ বছর বয়সের ছোট্ট একটা মেয়ে। মেয়েটার নাম লীলাবতী। নওরোজ খাঁ ঘন জঙ্গলের ভিতর ঘর বানিয়ে স্ত্রী এবং মেয়েটাকে নিয়ে থাকতেন। মেয়েটা কালাজ্বরে মারা যায়। জঙ্গলের ভিতর কোথাও তার কবর আছে।

আনিস কিছু বলল না। তাঁর মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছে। সিদ্দিকুর রহমানের নামের শেষে খাঁ নাই কেন? প্রশ্নটা সে করল না। জায়গির মাস্টারের মুখে প্রশ্ন মানায় না। সিদ্দিকুর রহমান সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাশলেন। কাশির বেগ কমে এলে বললেন, আমার বড় মেয়ের নাম যে লীলাবতী এটা কি তুমি জানো?

জি না।

তার মা মেয়ের ওই নাম রেখেছিল। আমার কাছে গল্প শুনেই বোধহয় রেখেছে। নামটা সুন্দর না?

জি স্যার।

ডাক নাম লীলা। ভালো নাম লীলাবতী।

আনিস বলল, হিন্দু ধরনের নাম— লীলাবতী, কলাবতী।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, এটা ঠিক বলেছ। হিন্দুয়ানি নাম। আমার মাথায়ও এই প্রশ্ন এসেছে। নওরোজ খাঁ নামের এক পাঠান তার মেয়ের নাম লীলাবতী রাখবে কেন?

আনিস বলল, হয়তো এই মেয়ে তাঁর নিজের ছিল না। মেয়েটা হিন্দু ছিল। উনি তাকে চুরি করে নিয়ে এসেছেন। তিনশ' বছর আগে আইনকানুন কিছু তো ছিল না।

সিদ্দিকুর রহমান হাঁটা বন্ধ করে মাস্টারের দিকে তাকালেন। ছেলেটা গুছিয়ে কথা বলছে তো!

মাস্টার।

জি।

সন্ধ্যার সময় রেললাইনের উপর বসেছিলে কেন?

স্যার আপনাকে আরেক দিন বলব।

ঠিক আছে আরেক দিন শুনব।

আনিস বলল, আপনার সিগারেট খাওয়া দেখে সিগারেটের তৃষ্ণা হয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন একটা সিগারেট ধরাব।

ধরাও।

আর যদি বেয়াদবি না নেন তাহলে আরেকটা কাজ করব।

কী কাজ?

রেললাইনের উপরে বসে থাকব।

থাকো। বসে থাকো।

সিদ্দিকুর রহমান এগিয়ে যাচ্ছেন। একবার পেছনে ফিরলেন— আনিস মাস্টার যে রেললাইনে বসে আছে সেটা দেখা যাচ্ছে না। তবে তার ঠোঁটের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে।

আমার নাম আনিস। আনিসুর রহমান।

এই অঞ্চলে আমার অনেকগুলি নাম আছে— কুঁজা মাস্টার, গুঁজা মাস্টার। কুঁজা হয়ে হাঁটি এইজন্যে কুঁজা মাস্টার। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গণি সাহেব আমাকে ডাকেন ভোঁতা-মাস্টার। সবসময় মুখ ভোঁতা করে রাখি বলে এই নাম।

হ্যাঁ, আমি সবসময় মুখ ভোঁতা করে রাখি। মাঝে মাঝে মুখ ভোঁতা করে রেললাইনে বসে ভাবি— একটা ট্রেন এসে গায়ের উপর দিয়ে চলে গেলে কেমন হয়?

রেলগাড়ি ঝমাঝম
ভোঁতা মাস্টার আলুর দম।

না হয় নাই, ছড়াটা আরো লম্বা—

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
ভোঁতা মাস্টার শ্বশুরবাড়ি
রেলগাড়ি ঝমাঝম
ভোঁতা মাস্টার আলুর দম।

আলুর দম হওয়া খারাপ কিছু না। সব সমস্যার সমাধান। আমার সমস্যা ভালো লাগে না, এইজন্যেই আমি সমস্যার ভিতর থাকি। যে যার নিন্দে, তার দুয়ারে বসে কান্দে। যে যা পছন্দ করে না তাকে তার মধ্যে থাকতে হয়। যে-সব মানুষ আমি পছন্দ করি না— তারা থাকে আমার আশেপাশে। যেমন সিদ্দিকুর রহমান।

সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে আমি পছন্দ করি না। কেন করি না আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার না। একটা কারণ হতে পারে মানুষটা ক্ষমতাবান। জমি-জমা, অর্থ-বিত্ত, লোক-লস্কর বিরাট রাজত্ব। আর আমি বেতনবিহীন কলেজের হতদরিদ্র ভোঁতা মাস্টার। দস্তয়োভস্কির উপন্যাসের চরিত্র। আমার নুন নাই পান্তাও নাই। তবে নুন পান্তা যে কাঁচামরিচ দিয়ে ডলে খেতে হয় সেই কাঁচামরিচটা আছে।

রেললাইনের উপর বসে আমি প্রায়ই ভাবি— একজন মানুষ যার নাম সিদ্দিকুর রহমান, সে দস্তয়োভস্কির নামও শুনে নাই কিন্তু সে নিজে দস্তয়োভস্কির

এক চরিত্র এবং সে এরকম আরো চরিত্র পুষছে। আমি আনিসুর রহমান সেরকম একটি চরিত্র। ভোঁতা মাস্টার, কুঁজা মাস্টার, গুঁজা মাস্টার। নাম নেই মানুষ। নাম থাকে না পশুদের। তাহলে আমি কি পশু গোত্রের কেউ? কিংবা ক্রমে ক্রমে পশু হয়ে যাচ্ছি?

গত সন্ধ্যাবেলায় আমি রেললাইনের উপর বসেছিলাম। হঠাৎ ভূতের মতো পেছন থেকে উদয় হলেন সিদ্দিকুর রহমান। তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হলো। আমার কথাবার্তা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও ছিল না। উপায় কী? অতি ক্ষমতাধর সামন্ত প্রভু প্রশ্ন করলে তাঁর ক্রীতদাসদের জবাব দিতে হয়। হ্যাঁ আমি ক্রীতদাস। অবশ্যই ক্রীতদাস। তিনবেলা অন্নদান করে তিনি আমাকে কিনে নিয়েছেন। আমি তাঁর অন্নদাস।

সিদ্দিকুর রহমান প্রশ্ন করলেন, সন্ধ্যাবেলা রেললাইনের উপর বসে আছ কেন?

আমি অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, স্যার, আপনাকে আরেকদিন বলব।

এই লোক আর চাপাচাপি করল না। চাপাচাপি করলে কিছু একটা বানিয়ে বলে দিতাম। যদিও আমার বলার ইচ্ছা ছিল— আমি রেললাইনে বসে থাকলে তোর কী? রেললাইন তোর তালুকের উপর দিয়ে যায় নাই। সরকারি রেললাইন। ইচ্ছা হলে আমি বসে থাকব। ইচ্ছা হলে শুয়ে ঘুমাব। আমার উপর দিয়ে মালগাড়ি চলে যাবে।

হ্যাঁ, তুই তুই করেই বলতাম। সব মানুষ সমান। মেধায় বুদ্ধিতে একজন বড় একজন ছোট। অথচ আমরা মানুষ বিচার করার সময় তার মেধাবুদ্ধি দেখি না। আমরা দেখি মানুষটার টাকাপয়সা আছে কি-না। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই? এই অঞ্চলের জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের নাম আব্দুল নূর— নূরের চাকর। এই নূরের চাকরের সঙ্গে গত শনিবার আমার দেখা। আমি উনাকে দেখে মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি (এটা আমার স্বভাব— আমি সবসময় চেষ্টা করি সবাইকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে। বেশির ভাগ সময় সম্ভব হয় না।) উনি বললেন, মাস্টার সাহেব, আসসালামু আলায়কুম।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম।

উনি গলা তীক্ষ্ণ করে বললেন, একজন মুসলমানের সঙ্গে আরেকজন মুসলমানের যখন দেখা হয় তখন সালাম দিতে হয়। এটা ইসলাম ধর্মের শিক্ষা।

আমি বললাম, জি জি।

উনি বললেন, যে বয়োকনিষ্ঠ সে আগে সালাম দিবে এটাই ধর্মীয় বিধান। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু আপনি সালাম দেন না। এর

WWW.BDBANGLA.COM

কারণটা কী ? জুমার দিন আপনি জুমার নামাজ আদায় করতে আসেন না, এর কারণ কী ?

আমি বললাম, আমি আপনার মতো ভালো মুসলমান না, আমি খারাপ মুসলমান। এইজন্যেই যাই না।

পাঞ্জেগানা নামাজ পড়েন না ?

জি-না।

আল্লা-খোদা বিশ্বাস করেন ? না-কি তাও করেন না ?

আমি জবাব দিলাম না। জবাব দিতে পারতাম। বলতে পারতাম, জি-না আমি আল্লাহ খোদা, ভগবান, জেসাস ক্রাইস্ট, গড কিছুই বিশ্বাস করি না। আমাকে মালেকভাই বলেছিলেন, শুধু নিজেকে বিশ্বাস করবি আর কিছুই বিশ্বাস করবি না। আমি কুঁজা মাস্টার আরো কুঁজা হয়ে গেলাম। মওলানা আব্দুল নূর কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খড়খড়ে গলায় বললেন, চিন্তা করে জবাব দেন।

যে প্রশ্নগুলি এই মওলানা আমাকে করেছেন সেই প্রশ্ন তিনি কিন্তু সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে করবেন না। কারণ সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের হিসাব আলাদা। উনি প্রতিবছর গ্রামের একজন মানুষকে নিজ খরচে হজে পাঠান। মওলানা সাহেবকেও একদিন পাঠাবেন। আব্দুল নূর সেই অপেক্ষায় আছেন। মওলানা সাহেবের মাসিক একশত টাকা বেতনও তিনি দেন। সারা বৎসরের খোরাকির চাল দেন।

মওলানা আব্দুল নূর এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন আমার প্রশ্নের জবাব না শুনে তিনি যাবেন না। আমি বললাম, মওলানা সাহেব, আপনার বয়স সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের চেয়ে অনেক বেশি। ধর্মীয় নিয়মে পথেঘাটে দেখা হলে উনারই উচিত আপনাকে সালাম দেয়া। উনি তা করেন না। আগবাড়িয়ে সবসময় আপনি সালাম দেন। এর কারণ কী ? উনি তো প্রায়ই জুমার নামাজেও যান না। এই প্রসঙ্গে কি আপনি তাঁকে কিছু বলেছেন ?

একটু আগে মওলানা সাহেব আমার জবাবের অপেক্ষা করেছেন। এখন আমি তাঁর জবাবের অপেক্ষা করছি। ফলাফল কেউ কারো প্রশ্নের জবাব দিলাম না। দু'জনই মাথা নিচু করে দু'দিকে চলে গেলাম।

আমি অভাজন ব্যক্তি। আমার ফটফট করে কথা বলা উচিত না। আমি বলিও না। মুখ বুঁজে থাকি। মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ হয় তখন বলি। সমস্যা হলো আমার সারাক্ষণই মেজাজ খারাপ থাকে। তখন ইচ্ছা করে আশেপাশে যারা থাকে তাদের সবার মেজাজ খারাপ করে দেই। আমার মেজাজে কারো

কিছু যায় আসে না। কেউ খেয়ালও করে না। শুধু সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের দুই মেয়ে খেয়াল করে। তারা আমার ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে।

দুই মেয়ের একজনের নাম কইতরী, আরেকজন জইতরী। কইতর হলো কবুতর। কবুতর থেকে কইতরী। তাহলে জইতরীটা কী ? জইতর বলে কোনো পাখি কি আছে ? যে পাখির নাম থেকে এসেছে জইতরী ? না-কি নামের সঙ্গে মিল রেখে নাম ? সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোনো জবাব দিতে পারবেন না। গ্রামের মানুষদের চিন্তাভাবনা জমি-জমার বাইরে যায় না। তিনি তাঁর বড়মেয়ের নাম রেখেছেন 'লীলাবতী'। এই নামের অর্থ কি তিনি জানেন ? যে লীলা করে বেড়ায় সে-ই লীলাবতী। লীলা অর্থ কেলি, প্রমোদ। অর্থ ঠিকমতো জানলে সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের নাম লীলাবতী রাখতেন না।

লীলার কথা থাক। কইতরী জইতরীর কথা বলি। এই দুই কন্যাকে আমি প্রতি সন্ধ্যায় পড়াই। ওরা মাথা দুলিয়ে পড়ে, আমি তাদের সামনে মূর্তির মতো বসে থাকি। আমার বাম-হাতে থাকে একটা বেত। (বেতটা বাঁ-হাতে থাকার কথা না, ডান-হাতে থাকার কথা; কিন্তু আমি লেফটহ্যান্ডার। মালেক ভাইও লেফটহ্যান্ডার।) মেয়ে দুটি ভীত চোখে কখনো আমার দিকে তাকায় আবার কখনো বেতের দিকে তাকায়। কখন আমার হাতের বেত তাদের উপর নেমে আসবে তা তারা যেমন জানে না, আমিও জানি না। যে-কোনো কারণে আমার মেজাজ খারাপ হলে তার ফল ভোগ করে মেয়ে দুটি। তারা নিঃশব্দে কাঁদে। আমার ভালো লাগে। কাঁদুক। সবাই কাঁদুক।

মেয়ে দুটির বয়স কত— এগার বারো, না-কি আরো কম ? আমি জানি না, আমার জানতে ইচ্ছাও করে না। এদের গায়ে বেতের বাড়ি দেয়া নিতান্তই অনুচিত কাজ। আমি এই অনুচিত কাজটা করি। তাতে পরে যে আমার অনুশোচনা হয়, তা না। মেয়ে দুটি ভালো। তাদের উপর যে শারীরিক নির্যাতন হয় সেই খবর তারা গোপন করে রাখে, কাউকে বলে না।

আমিও ভালো। আমার উপর যে মানসিক নির্যাতন চলে আমিও সেটা গোপন করে রাখি। রাস্তায় কেউ যখন জিজ্ঞেস করে— কুঁজা মাস্টার! যান কই ? আমি ভদ্রভাবেই প্রশ্নের জবাব দেই। কখনো বলি না, কুঁজা না ডাকলে হয় না ? ডাকুক যার যা ইচ্ছা। আমি তো লোকালয়ে বাস করি না। আমি সভ্যসমাজের বাইরের এক ভূখণ্ডে বাস করি। যেখানে খবরের কাগজ আসে না। এইটুকু জানি, দেশের গভর্নর মোনায়েম খাঁ। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দিন। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। যা জেনে এই অঞ্চলে এসেছিলাম তার বাইরে কিছু জানি না।

আমার জানার উপায়ও নেই। আমি ভাটি অঞ্চলের এক গর্তে ঢুকে গেছি। এই গর্ত থেকে বের হবার কোনো উপায় আমার নেই। অথচ এই আমি একসময় আন্দোলন করেছি। আহারে, কী উত্তেজনার দিন! মধ্যরাতে দেওয়ালে চিকা মারা। চা খেতে খেতে গোপন মিটিং। বিপ্লব আনার মিটিং। বিপ্লব আনার রাস্তা করতে হবে। কারণ বিপ্লব খানাখন্দ দিয়ে আসে না, তাকে তোয়াজ করে আনতে হয়। তার জন্যে প্রশস্ত সড়ক দরকার।

সড়ক বানানোর কলাকৌশল জানতে একবার গেলাম মালেক ভাই-এর কাছে। রোগা একজন মানুষ। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢাকা। ছোট গোল একটা মুখ চাদরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে। খাড়া নাক। তীক্ষ্ণ চোখ। মালেক ভাই বললেন, আল্লাহ বিশ্বাস করো ?

আমি বললাম, জি করি।

তিনি বললেন, আল্লাহ যেসব মানুষকে সমান বানিয়েছেন এটা বিশ্বাস করো।

আমি বললাম, জি করি।

নাম কী ?

আনিস।

শোনো আনিস, আল্লাহ সব মানুষকে সমান বানান নাই। কাউকে রূপবান বানিয়েছেন, কাউকে অন্ধ করে পাঠিয়েছেন। কাউকে বানিয়েছেন রাজা, কাউকে ক্রীতদাস। বুঝতে পেরেছ ?

চেষ্টা করছি।

ভালোমতো চেষ্টা করো। যেদিন মাথা থেকে আল্লাহ খোদা ভগবান এইসব দূর করতে পারবে সেইদিন আমার কাছে আসবে। আমি তোমাকে পার্টির সদস্য করে নেব। তোমার মতো নির্বোধ পার্টির প্রয়োজন আছে।

এখন কি চলে যাব ?

হ্যাঁ, চলে যাবে। তোমার সঙ্গে খেজুরে আলাপ করার সময় আমার নাই।

আমি চলে আসার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, মালেক ভাই বললেন, তোমাকে একটা বই দিচ্ছি, বইয়ের একটা গল্পের নাম– 'White nights'. লেখকের নাম দস্তয়েভস্কি। পরেরবার যখন আসবে গল্পটা পড়ে আসবে।

পরেরবার যখন গেলাম তিনি বললেন, গল্পটা পড়েছ ?

আমি বললাম, জি।

চোখের পানি ফেলেছ ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, কতটুক পানি ফেলেছ ? চায়ের কাপে এক কাপ না আধা কাপ ?

মাপি নাই তো!

এখন থেকে সবকিছু মাপবে, দুঃখ মাপবে। আনন্দ মাপবে। বইটা ফেরত এনেছ ?

জি।

আরেকটা বই নিয়ে যাও। পড়ো। এই বই পড়ে চোখে পানি আসে না, তবে আসতেও পারে। একেকজন মানুষ একেকরকম।

আমাকে বই পড়া শিখিয়েছেন মালেক ভাই। চিন্তা করতে শিখিয়েছেন মালেক ভাই। কী উত্তেজনাময় দিনই না গিয়েছে। একদিন আমাদের আস্তানায় পুলিশ এসে উপস্থিত। আমরা আগেই খবর পেয়ে পালিয়ে গেলাম। ধরা পড়লেন মালেক ভাই। উনার পায়ে সমস্যা, উনি দৌড়াতে পারেন না।

এখন আমার জীবনে কোনো উত্তেজনা নেই। উত্তেজনাহীন জীবনে সুনিদ্রা হবার কথা। আমার রাতে ঘুমই হয় না। আমি রাত জেগে জেগে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট'-এর বাংলা অনুবাদ করি।

> It was towards evening on a sweltering day early in July that a young man left the cubicle sublet to him S-Lane, went out into the street and, with slow and somewhat irresolute steps, made for K-Lane.
>
> 'জুলাই মাসের এক বিকেলে...'

অনুবাদ আগায় না। আমার কাছে ইংরেজি ডিকশনারি নেই। অনেক শব্দের মানে আমি জানি না। Sweltering day অর্থ কী ? আমার এখন এমনই অবস্থা সামান্য একটা ডিকশনারিও আমি কিনতে পারছি না। অথচ একসময় বড় বড় স্বপ্ন দেখতাম। বিপ্লবের সূতিকাগার মহান রাশিয়ায় যাব। রাশিয়ান ভাষা শিখব। মূল রুশভাষা থেকে অনুবাদ করব দস্তয়েভস্কি। আমার সব স্বপ্ন আমার সঙ্গে গর্তে ঢুকে গেছে। কোনোদিন যদি গর্ত থেকে বের হই তাহলে কি স্বপ্নগুলি সঙ্গে নিয়ে বের হব, না-কি তারা গর্তেই থেকে যাবে ?

এখন গর্তের ভেতর আমি আর কলেজ লাইব্রেরি থেকে আনা দস্তয়েভস্কির উপন্যাস 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট'-এর মলিন একটা কপি। যে কপিটার আঠার, বিশ এবং বাইশ এই তিনটা পৃষ্ঠা পোকায় কাটা। আমি গর্তে বসে এই মহান উপন্যাসের অনুবাদ করি। ডিকশনারির অভাবে অনুবাদ আগায় না। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গনি সাহেবকে লাইব্রেরির জন্যে ডিকশনারি কিনতে বলেছিলাম।

বিডিবাংলা ডট কম

উনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, ফান্ড নাই। কোনো শব্দের অর্থ জানতে চাইলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। মেট্রিকে আমি ইংরেজিতে সিক্সটি ফোর পেয়েছিলাম। সেই সময় এইটাই ছিল হাইয়েস্ট।

সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে বললে তিনি নিশ্চয়ই ময়মনসিংহ থেকে ডিকশনারি আনিয়ে দেবেন। কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছা করে না। প্রায় মূর্খ মানুষদের সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না। আমার দল আলাদা। মূর্খদের সঙ্গে কথা বলার মানে সময় নষ্ট। মূর্খের কথা শুনবে আরেক মূর্খ। জ্ঞানীর কথা শুনবে জ্ঞানী। সিদ্দিকুর রহমানের কথা শুনবে সুলেমান-লোকমান। আমার কথা শোনার মানুষ আপাতত নেই। কোনো একদিন হয়তো হবে। না হলেও ক্ষতি নেই।

সিদ্দিকুর রহমান মানুষটাকে মূর্খ বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। মানুষটার মধ্যে কিছু রহস্যময়তা আছে। তিনি একা একা নদীর পাড়ে হাঁটেন। জঙ্গলে ঢুকে পড়েন। রহস্যময় মানুষ পুরোপুরি মূর্খ হয় না। এই লোকও নিশ্চয়ই মূর্খ না। তারপরেও তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কারণ তিনি অন্যের কথা শুনতে পছন্দ করেন না। নিজে কথা বলতে পছন্দ করেন।

মাঝে মাঝে রাতে খাবার সময় তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে খানা খেতে হবে। তখনই আমি বুঝি আমাকে তিনি কিছু শুনাতে চান। আমি জানি তিনি আমাকে যে গল্প শুনাতে চান সেই গল্পের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ তৈরি হবে না। তারপরেও অতি বিনয়ের সঙ্গে গল্প শুনতে হবে।

মাস্টার।

জি।

পানিতে মানুষের মতো কোনো সম্প্রদায় কি বাস করে?

আপনার প্রশ্নটা বুঝলাম না। পানিতে যাযাবর সম্প্রদায় বাস করে। নৌকায় নৌকায় ঘুরে।

আমি বেদের কথা বলছি না। পানির নিচে থাকে। মাঝে মাঝে তাদের দেখা যায়।

আপনি কি মৎস্যকন্যাদের কথা বলছেন? রূপকথার বইয়ের মৎস্যকন্যা?

না, মৎস্যকন্যা না। পানির নিচে বাস করে। মানুষের মতো, অথচ মানুষ না।

আপনার প্রশ্নটাই বুঝতে পারছি না।

তাহলে থাক। খানা খাও।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খানা খেতে বসি। এই লোক থাকুক পানির নিচের অদ্ভুত জিনিস নিয়ে। যে জিনিস অর্ধেক মানুষ অর্ধেক অন্যকিছু। আমার প্রয়োজন পূর্ণমানুষ। অর্ধেক মানুষ না।

সিদ্দিকুর রহমান নামের মানুষটা যে আমাকে পছন্দ করেন এটা আমি বুঝতে পারি। মানুষের ঘৃণা যেমন বুঝা যায়, ভালোবাসাও বুঝা যায়। মালেক ভাই আমাকে পছন্দ করতেন। তিনি কিছু না বললেও তাঁর পছন্দ বুঝতে পেরেছিলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুই তো বাঁ-হাতি, আমিও বাঁ-হাতি। ইন্টারেস্টিং তো।

আমি বললাম, ইন্টারেস্টিং কেন?

তিনি বললেন, যারা দোজখে যাবে তারা যে সেখানে বাঁ-হাত ব্যবহার করবে, এটা জানিস?

জানি না তো!

পড়াশোনা না করলে জানবি কীভাবে? পড়াশোনা কর।

মালেকভাই কেন আমাকে পছন্দ করতেন সেটা বের করতে পারি নি। আমি কেন তাঁকে পছন্দ করতাম সেটা বের করেছি। আমি তাঁর কথা শুনে চমৎকৃত হতাম। মানুষকে চমৎকৃত করার কৌশলটা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি।

এই কৌশল আমি সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের উপর মাঝে মাঝে প্রয়োগ করি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের মতো মানুষরা চমৎকৃত হতে পছন্দ করেন। তাঁর চারপাশে চমৎকৃত হবার মতো কিছু নাই। জলমহালের বন্দোবস্ত। ফসল কাটা। ফসল তোলা। জমি কেনা। বাজারের ঘরের বিক্রি-বাটা দেখা। পাটের মৌসুমে পাটের ব্যবসা। গুড়ের মৌসুমে গুড়। ধনী থেকে আরো ধনী হবার মতো বিষয়। চমৎকৃত হবার মতো কিছু না।

এই লোকের বিশাল বাড়ি। একটা না, কয়েকটা। একেকটার একেক নাম— শহরবাড়ি, বাংলা বাড়ি, মূল বাড়ি। আবার নদীর কাছে একটা বাড়ি আছে, নাম উত্তর বাড়ি।

এখন শুনছি জঙ্গল কিনবে। কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে খানা খাচ্ছি। উনি হঠাৎ বললেন, জলপাইগুড়ির জঙ্গল কখনো দেখেছ?

আমি বললাম, না।

উনি বললেন, আমি যৌবনে একবার গিয়েছিলাম। দুই রাত দুই দিন ছিলাম। গহীন জঙ্গল। বন্য বরাহ, হাতি, গণ্ডার, নীল গাই। নিজের চোখে দেখেছি। এরকম একটা জঙ্গল কিনতে পারলে আর কোনো আফসোস থাকত না।

আমি বললাম, জঙ্গল কিনতে চান ?

হুঁ। একা একা জঙ্গলে হাঁটব। গাছপালা, বন্য ফুল, পশুপাখি দেখব আর চমৎকৃত হব।

তাঁকে চমৎকৃত করার মতো অনেক কিছুই আমি করতে পারি। কিন্তু আমি করি না। মানুষকে চমকে বেড়ানো আমার কাজ না। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে চমকে দেবার মতো কথা আমি অনেক বলতে পারি। যেমন আমি বলতে পারি— আপনাদের এক পূর্বপুরুষ হামিদুর রহমান বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে 'খান বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। কেন পেয়েছিলেন আপনি কি জানেন ? আমি জানি। তিনি চারজন স্বদেশীকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। চারজনের মধ্যে তিনজনই ছিল মুসলমান। এরা পুলিশের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে তাঁর ঢাকায় টিকাটুলি এলাকার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। চারজন স্বদেশীর তিনজনের ফাঁসি হয়ে যায়। একজনের হয় কালাপানি। আর উনার হয় খান বাহাদুর উপাধি। রাজভক্তির পুরস্কার।

আমি ইতিহাসের ছাত্র। আমি ইতিহাস খুঁজে বেড়াই।

সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের বড় কন্যা লীলাবতী বিষয়েও কিছু কথা বলে আমি তাঁকে চমৎকৃত করতে পারি। লীলাবতী ছিল সপ্তম শতকের বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ পণ্ডিত ভাস্করাচার্যের একমাত্র কন্যা। ভাস্করাচার্য গণিত বিষয়ে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। একটির নাম 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' আর অন্যটির নাম 'লীলাবতী'। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর আদরের একমাত্র কন্যার নাম পৃথিবীতে স্থায়ী হয়ে যাক। কন্যার নামে অতি জটিল গণিত বইয়ের নাম আর কোনো গণিতজ্ঞ রাখেন নি।

কী সুন্দর গল্প! সিদ্দিকুর রহমান এই গল্প শুনলে বিশেষভাবে 'চমৎকৃত' হয়ে বলতেন— এই গল্প তোমাকে কে বলেছে ?

তার উত্তরে আমি বলতাম, বই বলেছে। আমি বইপড়া লোক। জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার দেখা লোক না। জন্তু-জানোয়ার দেখে 'চমৎকৃত' হওয়া যায়, কিছু জানা যায় না। ভাস্করাচার্য কেন অঙ্ক বই-এর নাম লীলাবতী রাখলেন সেই গল্পটা আরো ভালোমতো শুনতে চান ?

সিদ্দিকুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বলতেন, শুনতে চাই।

তখন আমি বলতাম, তাহলে আমার সঙ্গে চলুন। সন্ধ্যার পর যখন কুয়াশা ঘন হয়ে পড়বে তখন দু'জনে রেললাইনে পা তুলে বসব। দু'জনের হাতে থাকবে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেট টানতে টানতে গল্প করব। রাজি আছেন ? কী, কথা বলেন না কেন ? রাজি ?

কার্তিক মাসের সকাল।

সিদ্দিকুর রহমানের গায়ে ঘিয়া রঙের চাদর। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে। তিনি কুয়াশার ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিতে একধরনের মুগ্ধতা আছে। মুগ্ধতার কারণ এই বছর শিউলি গাছে ফুল ফুটেছে। হাজার হাজার ফুল। গত বছর এবং আগের বছর গাছে কোনো ফুল ফুটে নি। শিউলি গাছ মাঝেমধ্যে ফুল দেয়া বন্ধ করে এটা তাঁর জানা ছিল না। ফল গাছের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায়। সব আমগাছে প্রতিবছর মুকুল আসে না। ফুল গাছের ক্ষেত্রে এই ব্যাপার কখনো ঘটে না। ফুল ফুটানো তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক।

সিদ্দিকুর রহমান দাঁড়িয়ে আছেন শহরবাড়ির সামনে। এই বাংলো ধরনের বাড়ি তাঁর দাদা খান বাহাদুর হামিদুর রহমান বানিয়েছিলেন। বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'ফুলার কটেজ'। পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লে. গভর্নর ফুলার সাহেবের নামে বাড়ি। বাড়ির ডিজাইন করা হয়েছিল গভর্নর সাহেবের ইংল্যান্ডের বাড়ির ছবি দেখে। বাড়ির সামনে তিনি চেরিগাছও লাগিয়েছিলেন। গাছগুলি বাঁচে নাই।

হামিদুর রহমানের ধারণা ছিল বাড়ি দেখে ফুলার সাহেব মুগ্ধ হবেন। শুধু তাঁর এক রাত থাকার জন্যে কেউ এত আয়োজন করবে এটা নিশ্চয়ই তিনি ধারণা করে বসে ছিলেন না। ফুলার সাহেবের ময়মনসিংহের নেত্রকোনার অতি অভ্যন্ত অঞ্চলে আসতে চাওয়ার পেছনের কারণ পাখি শিকার। সাহেব নিরামিষাশী হলেও পাখি শিকারের প্রচণ্ড নেশা ছিল। রাজকার্যের বাইরে তিনি পাখি শিকারের জন্যে অনেক সময় বের করতে পারতেন।

খান বাহাদুর হামিদুর রহমান গভর্নর সাহেবের পাখি শিকারের জন্যে বিপুল আয়োজন করিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার কাছ থেকে নান্দিনা নামের একটা মাদি হাতি কিনে নেন। গভর্নর সাহেব হাতির পিঠে চড়ে শিকারে যাবেন। তার জৌলুসই আলাদা। জামালপুর থেকে কারিগর এনে দুটা পালকি বানানো হয়। যে-সব জায়গায় হাতি যাবে না সে-সব জায়গায় পালকি যাবে। মুন্সিগঞ্জ থেকে একটা বজরা কিনে আনেন। নদীতে বজরা বাঁধা

থাকবে। বজরায় পান ভোজনের ব্যবস্থা। বরফকলের বরফ, স্কচ হুইস্কি। সাহেবরা মদ্যপান ছাড়া কোনোরকম খেলাধুলাই করতে পারেন না। বাঙালির যেমন পান-সুপারি সাহেবদের সেরকম বরফ-মদ।

গভর্নর সাহেবের পছন্দের খানা তৈরির জন্যে কোলকাতার আলীপুর থেকে একজন ফিরিঙ্গি বাবুর্চি আনা হয়। বাবুর্চির নাম হর্নথন।

লেফটেনেন্ট গভর্নর ফুলার শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে পাখি শিকারে আসেন নি। তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে কঠিন হাতে দমন করতে গিয়ে কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেন। তাঁকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। লর্ড মিন্টো ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

গভর্নর সাহেবের পদত্যাগে ভারতবর্ষে যে মানুষটি সবচে' বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি সম্ভবত খান বাহাদুর হামিদুর রহমান। অনেকের ধারণা লাট সাহেব তাঁর বাড়িতে আসেন নি এই শোকে সেই বছরই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র সন্তান হাসানুর রহমানের বয়স তখন মাত্র দশ। অতি দ্রুত পরিবারটি ধ্বংসের মুখোমুখি এসে পড়ে। নানান পাওনাদার এসে জুটে। একজন এসে জোর করে হাতি নিয়ে চলে যায়। একজন নিয়ে যায় বজরা। জমিজমা নিয়েও দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনরা মামলা শুরু করে দেন।

বিস্ময়কর ঘটনা হলো বালক হাসানুর রহমানের পাশে সে সময় যে মানুষটি এসে দাঁড়ায় সে ফিরিঙ্গি বাবুর্চি হর্নথন। তার মুখে একটাই বুলি— I will kill all the bastards বন্দুকসে গোলি মারদুঙ্গা। হর্নথন এই বাড়িতেই মৃত্যু পর্যন্ত থেকে যান। গ্রামের মানুষরা তাকে ডাকত হন্টন সাহেব। হন্টনের আগে একটি বিশেষণও ব্যবহার করত— 'পাগলা'। পাগলা হন্টন। বাড়ির নামও লোকজন পাল্টে দিল। বাংলো বাড়ির নাম হয়ে গেল— 'শহরবাড়ি'। এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে অঞ্চলটাকে শহর মনে হয়। গ্রাম মনে হয় না। কাজেই বাড়ির নাম শহরবাড়ি।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে রোদ এসেছে। কুয়াশা ভেজা রোদ। সিদ্দিকুর রহমান চোখ বন্ধ করে রোদের দিকে মুখ ফিরালেন। পাগলা হন্টন শেষ বয়সে এই কাজটা করত— ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকত। সিদ্দিকুর রহমানের শৈশবের একটা বড় অংশ কেটেছে এই মানুষটার আশেপাশে। সে হড়বড় করে সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে যেত। বালক সিদ্দিকুর রহমান ইংরেজি কিছুই বুঝত না কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গল্প

শুনত। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে পাগলা হন্টন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান করত। কিছু কিছু গান সিদ্দিকুর রহমানের এখনো মনে আছে—

'I adore thee
I serve thee
Fall before thee'

সিদ্দিকুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। পাগলা হন্টন সাহেবের কথা মনে হলেই তাঁর মন খারাপ লাগে। এও এক রহস্য। তাঁর কত প্রিয়জনই তো মারা গেছেন। তাঁদের কথা এরকম হুটহাট করে মনে আসে না। আর মনে এলেও মন খারাপ হয় না। তিনি ডাকলেন, সুলেমান!

সুলেমান সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি।

আজ কী বার ?

বিষ্যুদবার।

আজ তো রমিলার স্নানের দিন।

জি।

নতুন সাবান আছে না ?

জি।

রমিলাকে সপ্তাহে একদিন স্নান করানো হয়। এই স্নান তিনি নতুন সাবান ছাড়া করেন না। খুবই আগ্রহ করে তিনি সাবানের মোড়ক খুলেন। কিছুক্ষণ গন্ধ নেন।

রমিলার ঘরের জানালা খোলা। জানালা দিয়ে রোদ এসে খাটে পড়েছে। তিনি সাবধানে রোদে হাত রাখলেন। তাঁর ভাবটা এরকম যেন এটা রোদ না— আগুন। আগুনে হাত রাখলে পুড়ে যাবে। তিনি আঙুল বন্ধ করছেন এবং ফাঁক করছেন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রোদ খাটের চাদরে পড়ছে এবং বন্ধ হচ্ছে। সুন্দর লাগছে দেখতে।

তিনি কিছুক্ষণ এই খেলা খেললেন। দূর থেকে কইতরী তাঁকে লক্ষ করছে। কইতরীর চোখে কৌতূহল এবং ভয়। তাঁর সামান্য মনখারাপ হলো। কইতরী তারই মেয়ে। অথচ মায়ের ভয়ে সে অস্থির। তিনি হাত ইশারায় মেয়েকে ডাকলেন। কইতরী ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসছে। মেয়েটা তো অনেক বড় হয়েছে। সুন্দরও হয়েছে। যতই দিন যাবে এই মেয়ে ততই সুন্দর হবে।

মাগো, তোমার বাপজান কই জানো ?

না।

খোঁজ নিয়া বাইর করতে পারবা ?

হুঁ।

তোমার বাপজানরে বলো তালা খুইল্যা আমারে যেন বাইর করে। আইজ আমার মাথা ঠিক আছে।

আইচ্ছা।

তোমার বয়স কত হইছে মা ?

এগার।

মাশাল্লাহ।

তাঁর খুব ইচ্ছা করছে মেয়েকে একটা প্রশ্ন করতে। লজ্জায় করতে পারছেন না। একটা বিশেষ সময় থেকে মেয়েরা যে শারীরিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়— তার দুই মেয়ে কি তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ? কোনো মা মেয়েদের এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পান না। তিনি পাচ্ছেন কারণ তিনি সাধারণ মা না। তিনি পাগল মা।

কইতরী এখনো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় মা'র সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে। ভালো লাগলেও তার চোখ থেকে ভয় যায় নি।

তোমার ভইন জইতরী কই ?

শহরবাড়িত।

তারেও ডাক দিয়া আনো। তোমরার দুই ভইনের মাথাত আমি তেল দিয়া দিব।

আচ্ছা।

তোমার ভাই মাসুদ কই ?

জানি না।

তারেও খবর দেও। অনেক দিন তারে দেখি না।

আচ্ছা খবর দিব।

কইতরী চলে যাচ্ছে, রমিলা মুগ্ধ হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। এত মুগ্ধ হয়ে ছেলেমেয়ের দিকে তাকানো ঠিক না। নজর লেগে যায়। বাপ-মায়ের নজর— কঠিন নজর। রমিলা মনে মনে বললেন, আল্লাগো মাফ করো। মাবুদগো আমার নজর যেন না লাগে।

তিনি নজর না লাগানোর জন্যে অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু মেয়ের উপর থেকে নজর সরাতে পারছেন না।

মেয়ে যে ফ্রকটা পরে আছে তার রঙ সুন্দর— হলুদ। হলুদ মেয়েদের রঙ। এই রঙ পুরুষের জন্যে নিষেধ। কেন নিষেধ কে জানে! ভালো মুনশি মাওলানা পেলে জিজ্ঞেস করে দেখতেন। যখন তাঁর মাথা ঠিক থাকে তখন অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে। কথা বলার মতো একজন কেউ যদি থাকত!

তিনি খাট থেকে নামলেন। তাঁর হাঁটতে ইচ্ছা করছে। ঘরের তালা না খোলা পর্যন্ত তিনি ঘরের ভেতরই কিছুক্ষণ হাঁটবেন বলে ঠিক করলেন। ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাওয়া এবং ফিরে আসা। তাঁর ঘরটা বেশ বড়। ঘরের একমাথা থেকে আরেক মাথায় যেতে হলে একশ' তিন কদম পা ফেলতে হয়। বেশির ভাগ সময়ই তিনি হাঁটেন চোখ বন্ধ করে। খাটটা ছাড়া এই ঘরে অন্যকোনো আসবাব নেই। কাজেই চোখ বন্ধ করে হাঁটতে অসুবিধা হয় না। বরং একটা সুবিধা হয়— চোখ বন্ধ করে হাঁটলে তিনি অনেক রকম গন্ধ পান। পশ্চিমের দেয়ালের কাছে গেলে কাঠ পচা গন্ধ এবং ন্যাপথিলিনের গন্ধ পান। যখন উত্তর দেয়াল ঘেঁসে হাঁটেন তখন পান আতরের গন্ধ। পূর্বদিকের জানালার কাছে এলেই নাকে আসে কাঁচা ঘাসের গন্ধ।

সিদ্দিকুর রহমান ঘরের তালা খুলতে খুলতে বললেন, ভালো আছ ?

রমিলা মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বললেন, হুঁ।

সিনান করবে ? গরম পানি দিতে বলব ? আজ বিষ্যুদবার।

সিনান সইন্ধ্যাকালে করব। আজ সিনান কইরা নয়া একটা শাড়ি পরব।

সিদ্দিকুর রহমান বিস্মিত হয়ে তাকালেন। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন— নয়া শাড়ি কেন ? জিজ্ঞেস করলেন না।

রমিলা স্বামীকে দেখেই মাথা নিচু করে ফেলেছিলেন। এখন মাথা আরো নিচু করে গুটিসুটি পাঁকিয়ে ফেললেন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, রান্না করতে মন চায় ? রান্নার জোগাড়যন্ত্র করে দিতে বলব ?

না। মেয়ে দু'টার মাথায় তেল দিয়ে দিব।

বসবে কোথায় ?

এক জায়গায় বসলেই হবে।

আমি কি থাকব আশেপাশে ?

দরকার নাই। আমার শরীর আজ ভালো।

বিশেষ কিছু কি খেতে ইচ্ছা করে ? ইচ্ছা করলে বলো ব্যবস্থা করি। তোমার যখন মাথা ঠিক থাকে না তখন তো খেতে পারো না। আজ আরাম করে খাও।

সইন্ধ্যাকালে খাব।

রমিলা হাঁটতে হাঁটতে বারান্দায় চলে এসেছেন। সিদ্দিকুর রহমান তাঁর পেছনে পেছনে আসছেন। রমিলাকে তালা খুলে বের করা ঠিক হয়েছে কি না বুঝতে পারছেন না। রমিলা সুস্থ মানুষের মতো আচরণ করছে বলে তাঁর কাছে মনে হচ্ছে না। বারান্দার শেষ মাথা পর্যন্ত সে এসেছে চোখ বন্ধ করে।

রমিলা!

জি!

তোমার শরীর কি আসলেই ঠিক আছে?

হুঁ।

রমিলা মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে স্বামীর দিকে সরাসরি তাকালেন। ফিসফিস করে বললেন, আপনাকে একটা কথা বলব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, বলো।

আইজ রাইতে একটা ঘটনা ঘটব।

কী ঘটনা?

সেইটা আপনেরে বলব না। ঘটনা ঘটনের পরে আপনের দিল খোশ হইব। এই জন্যেই আমি নয়া শাড়ি চাইছি।

নতুন শাড়ির ব্যবস্থা করতেছি। শোনো রমিলা, আমি তোমার আশেপাশেই আছি। মাথার মধ্যে উনিশ-বিশ কিছু যদি টের পাও আমারে ডাকবা।

আচ্ছা।

রমিলা খুব যত্ন করে দুই মেয়ের মাথায় তেল দিয়ে দিলেন। চুল টেনে ফিতা দিয়ে বেঁধে দিলেন। মেয়েদের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্যে কয়েকটা সিমাসা দিলেন। কঠিন সিমাসা। বুদ্ধি থাকলে ভাঙানো যাবে। বুদ্ধি না থাকলে না।

বলো তো মা, জিনিসটা কী?

'কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে
নাই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?'

জইতরী-কইতরী দু'জন একসঙ্গে বলল, পারব না।

আচ্ছা আরেকটা ধরি।

জইতরী বলল, প্রথমটা আগে ভাঙাও।

রমিলা বললেন, সবগুলা পরে একসঙ্গে ভাঙায়ে দিব। এখন আরেকটা শোনো—

'আকাশে উড়ে না পক্ষী উড়ে না জঙ্গলে
এই পক্ষী উড়ে শুধু শনি মঙ্গলে।'

পারব না।

তাহলে এটা ভাঙাও—

'মহাকবি কালিদাসের অতি আজব কথা
নয় লক্ষ তেঁতুল গাছের কয় লক্ষ পাতা?'

পারব না।

দেখ এইটা পার কি-না—

'তিন অক্ষরে নাম তার বৃহৎ বলে গণ্য
পেটটা তাহার কেটে দিলে হয়ে যায় অন্ন।'

কইতরী আনন্দিত গলায় বলল, এইটা পারব। এটা ভারত। ভারতের পেট কাটলে হয় ভাত।

হইছে। মা, তোমার খুব বুদ্ধি।

কইতরী বিড়বিড় করে বলল, মা, তুমি কি ভালো হয়ে গেছ?

রমিলা ছোট্ট করে শ্বাস ফেলে বললেন, এখন ভালো। মন্দ হইতে কতক্ষণ!

কইতরী বলল, শহরবাড়ি যাইবা?

না।

কইতরী বলল, তেঁতুল খাইবা? গাছ পাকনা তেঁতুল।

রমিলার তেঁতুল খেতে ইচ্ছা করছিল না, তারপরেও বললেন, আনো দেখি।

দুই মেয়েই দৌড়ে চলে গেল। লোকমানকে দেখা যাচ্ছে। সে অনেকক্ষণ থেকেই আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করছে। পরপুরুষের সামনে পর্দা করা উচিত। কিন্তু লোকমান তাকে মা ডাকে। পুত্রের সামনেও কি পর্দার বিধান আছে? রমিলা মাথায় শাড়ির আঁচল তুলতে তুলতে লোকমানকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। লোকমান প্রায় ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল।

কেমন আছ লোকমান?

আম্মা, ভালো আছি।

ঘরদোয়ার বড়ই অপরিষ্কার। ঝাড় পোছ দেও। কুটুম আসব।

কে আসব আম্মা?

রমিলা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যখন আসব তখন জানবা। এখন সামনে থাইকা যাও।

রমিলা চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ভোতা ধরনের চাপ ব্যথা। লক্ষণ মোটেই ভালো না। এই ব্যথা বাড়তে থাকবে। তারপর হঠাৎ করেই ব্যথা বোধ থাকবে না। শুরু হবে ভয়ঙ্কর সময়। যে সময়ের কোনো হিসেব তাঁর কাছে থাকবে না। রমিলার উচিত অতি দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। তাঁর মন খারাপ লাগছে, মেয়ে দুটি আগ্রহ করে তেঁতুল আনতে গিয়েছে। এই তেঁতুল তারা দিতে পারবে না। তিনি বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে মেয়েদের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

এই তো তাদেরকে দেখা যাচ্ছে। মেয়ে দুটাই তো সুন্দর হয়েছে। কইতরী একটু বেশি সুন্দর। শুধু যদি চুল কালো হতো! এই মেয়ের চুল লাল। মেয়েদের লাল চুল ভালো না।

লাল চুলের মেয়েদের দিকে জিন-পরীর নজর থাকে।

রমিলা হাত বাড়িয়ে তেঁতুল নিতে নিতে বললেন, তোমাদের বাপজানরে বলো আমারে যেন তালাবন্ধ করে। আমার মাথা নষ্ট হইতে শুরু করছে।

জইতরী-কইতরী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। রমিলা ক্লান্তগলায় বললেন, তোমরা সাজগোজ কইরা থাকবা। বাড়িতে কুটুম আসতেছে।

কইতরী বলল, কুটুম কে মা?

রমিলা বললেন, তোমাদের বড় ভইন। তার নাম লীলা। লীলাবতী।

তোমারে কে খবর দিছে মা?

কেউ খবর দেয় নাই। আমি আগে আগে কিছু কিছু জিনিস জানি। ক্যামনে জানি বলতে পারব না।

রমিলা তেঁতুল হাতে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে রওনা হলেন। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছে। আর দেরি করা ঠিক না।

লীলা ট্রেনের জানালায় মাথা রেখে বসে আছে। তার চোখে চশমা। চশমা নড়বড় করছে। মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় আলগা হয়ে নিচে পড়ে যাবে। খপ করে হাত বাড়িয়ে ধরার সময় পাওয়া যাবে না। কারণ তার দু'টা হাতই বন্ধ। সে মাথা রেখেছে হাতের উপর। ট্রেন ঝড়ের গতিতে চলছে। প্রচণ্ড বাতাস। বাতাসে লীলার চুল উড়ছে। অল্পস্বল্প বাতাসে চুল উড়ে যখন মুখের উপর পড়ে তখন তার খুব বিরক্তি লাগে। এখন বিরক্তি লাগছে না। বরং উল্টোটা হচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। ভালো লাগার সঙ্গে খানিকটা ভয় যুক্ত হয়েছে— মাথার উপরের জানালা খটখট করছে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ধুম করে যে-কোনো সময় হয়তো মাথার উপর পড়বে।

লীলার বয়স একুশ। তার মুখ লম্বাটে। গায়ের রঙ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তাকে খুব ফরসা লাগে। আবার কখনো মনে হয় শ্যামলা। সব মানুষের চেহারায় কিছু বিশেষত্ব থাকে। লীলার বিশেষত্ব হচ্ছে, তাকে দেখেই মনে হয় সে খুব কথা বলে। আসলে ব্যাপারটা উল্টা। লীলা খুবই কম কথা বলে। তবে অন্যরা যখন কথা বলে সে সারাক্ষণই মুখ টিপে হাসতে থাকে এবং এমন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে যে মনে হয় এ-ধরনের কথা

সে আগে কখনো শোনে নি, ভবিষ্যতে শোনার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। যা শোনার— এখনি শুনে নিতে হবে।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে লীলার ঘুম-ঘুম লাগছে। সে বেশ কষ্ট করে জেগে আছে। সামনের স্টপেজটাই নান্দাইল রোড। তাকে নামতে হবে নান্দাইল রোডে। ট্রেন সেখানে মাত্র দু'মিনিটের জন্যে থামবে। এই নিয়েও কিছু সমস্যা আছে, তাকে ট্রেনের যাত্রীরা বলেছে, মেইল ট্রেন নান্দাইল রোডে থামে না। যদি সত্যি সত্যি না থামে তাহলে বিস্ময়কর ব্যাপার হবে। সে টিকিট কেটেছে নান্দাইল রোডের। ট্রেন না থামলে টিকিট কেন দেয়া হবে?

লীলার সঙ্গে এমন কিছু মালপত্র নেই। একটা বড় সুটকেস, একটা হ্যান্ডব্যাগ। হ্যান্ডব্যাগ সে হাতে করে নামাবে। সুটকেস নামাবে মঞ্জুমামা। মঞ্জুমামা এখন উপরের বার্থে শুয়ে হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন। ট্রেনের গতি কমে এলে তাঁর ঘুম ভাঙাতে হবে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। টেনশনে তাঁর গলার স্বর চিকন হয়ে যাবে। এমনিতে তাঁর গলার স্বর ভারী, শুধু টেনশনের সময় গলা চিকন হয়ে যায়। লীলা ভেবেই পায় না একটা মানুষ সারাক্ষণ এত টেনশনে কী করে থাকে! তার চেয়েও আশ্চর্য কথা— এত টেনশন নিয়ে একটা মানুষ যখন-তখন কী করে ঘুমিয়ে পড়ে?

মঞ্জুমামা লীলার আপন মামা না। লীলার মায়ের খালাতো ভাই। নয়াপুরে তাঁর একটা ফার্মেসি, একটা টি স্টল এবং রেডিও সারাই-এর দোকান আছে। কোনো দোকান থেকেই তেমন কিছু আসে না। এই নিয়ে তাঁর মাথাব্যথাও নেই। ব্যবসাপাতির খোঁজখবর নিতে গেলে তাঁর টেনশন হয় বলেই তিনি কোনো খোঁজখবর করেন না। দিনের বেশিরভাগ সময় তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধু পরেশের চায়ের দোকানে বসে থাকেন। দোকানের পেছনে চৌকির উপর শীতল পাটি পাতা থাকে। ঘুম পেলে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। মঞ্জুমামার বয়স পঁয়তাল্লিশ। এখনো বিয়ে করেন নি, তবে বিয়ের কথা চলছে। পাত্রী নয়াপাড়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। মাঘ মাসের ছয় তারিখে বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। তার পরও স্থানীয় মানুষজনের ধারণা, এই বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবে না। আগেও কয়েকবার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় নি। মঞ্জুমামাকে লীলা নিয়ে এসেছে তার চড়নদার হিসেবে। সম্পূর্ণ নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছে, বয়স্ক একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকা দরকার। এই মানুষটাকে লীলার খুবই পছন্দ।

জানালার বাইরে বিপুল অন্ধকার। হঠাৎ-হঠাৎ দু'একটা বাতি জ্বলতে দেখা যায়। বাতিগুলিকে লীলার কাছে মনে হয় জিনের চোখ। বাতিগুলির দিকে

WWW.BDBANGLA.COM

তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগছে। বাতিগুলি স্থির না। চলন্ত ট্রেনের কারণে হঠাৎ গাছের আড়ালে পড়ে বাতি উধাও হয়ে যাচ্ছে, আবার হুট করে অন্ধকার থেকে বের হচ্ছে। আলোর রঙও একরকম না; কোনোটা গাঢ় লাল, কোনোটা হালকা হলুদ। কোনোটা আবার নীলাভ। সবগুলি বাতির রঙ এক হওয়া উচিত। সবই তো কেরোসিনের আলো। রঙের বেশ-কমটা কি দূরত্বের জন্যে হচ্ছে? পরীক্ষা করতে পারলে হতো। লীলা পরীক্ষাটা করতে পারছে না, কারণ সে চোখই মেলে রাখতে পারছে না।

লীলা নিশ্চিত, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। মজার কোনো স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে। মঞ্জুমামাও উপরের বার্থে ঘুমিয়ে থাকবেন। তারা নান্দাইল রোড স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাবে। একসময় মঞ্জুমামার ঘুম ভাঙবে। তিনি চিকন গলায় বলবেন— ধুনছে আমারে! তুলা ধুনা ধুনছে। ও লীলা, এখন করি কী? লীলা বলবে, চলুন মামা আমরা চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি। মঞ্জুমামা অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বলবেন, তোর মাথায় কি কিরা ঢুকছে? ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পড়লে তুই বাঁচবি? তোকে সঙ্গে নিয়ে বের হওয়াই ভুল হয়েছে। এইজন্যে শাস্ত্রে আছে 'পথে নারী বিবর্জিতা'।

কোন শাস্ত্রে আছে?

কোন শাস্ত্রে আছে জানি না। কথা বলিস না, চুপ করে থাক। ধুনছেরে আমারে, ধুনছে। হায় খোদা এ কী বিপদ!

ট্রেনের গতি কি কমে এসেছে? ঘটাং ঘটাং শব্দ এখন হচ্ছে না। তার বদলে শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। লীলা বুঝতে পারছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে কিছুটা চেতনা এখনো আছে। এক্ষুনি সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে। সে স্বপ্ন দেখছে, শুরুতে এই বোধটা থাকবে।

লীলা এখন দেখছে সে হাতির পিঠে বসে আছে। হাতিটা দুলতে দুলতে এগোচ্ছে। স্বপ্ন দেখা তাহলে শুরু হয়েছে। লীলা ইচ্ছা করলেই স্বপ্ন নষ্ট করে জেগে উঠতে পারে। স্বপ্ন নষ্ট করতে ইচ্ছা করছে না। হাতির পিঠে চড়তে ভালো লাগছে। আরে কী কাণ্ড, বাদ্য-বাজনা হচ্ছে! কারা যেন আবার পিচকিরি দিয়ে রঙ ছিটাচ্ছে। লাল-নীল রঙ চোখে-মুখে লাগছে। রঙ উঠবে তো? হাতির মাহুত লীলার দিকে তাকিয়ে বলল— তাড়াতাড়ি নামো, তুফান হচ্ছে। মাহুত শুদ্ধভাষায় কথা বলছে। গলার স্বর মঞ্জুমামার মতো। লীলা বলল, নামব কীভাবে? একটা সিঁড়ি লাগিয়ে দিন-না! মাহুত রাগী গলায় বলল— আরে বেটি তুফান হচ্ছে। এই বলেই ধাক্কা দিয়ে সে লীলাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। লীলার ঘুম ভেঙে গেল। সে অবাক হয়ে দেখে আসলেই তুফান হচ্ছে। ট্রেন থেমে আছে।

কামরায় কোনো বাতি নেই। যাত্রীরা জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ছোট একটা বাচ্চা কাঁদছে। একজন একটা টর্চলাইট জ্বালিয়েছে। টর্চলাইটের আলো ক্ষীণ। সেই ক্ষীণ আলোও আবার কিছুক্ষণ পরপর নিভে যাচ্ছে।

লীলা বলল, মামা, আমরা কোথায়?

মঞ্জু বিরক্ত গলায় বলল, আরে গাধা— ড্রাইভার জঙ্গলের মাঝখানে ট্রেন থামিয়ে দিয়েছে। আরে ব্যাটা, তুই কোনো স্টেশনে নিয়ে গাড়ি থামা। জংলার মধ্যে ট্রেন থামালি, এখন যদি ডাকাতি হয়?

ডাকাতি হবে কেন?

দেশ ভরতি হয়ে গেছে ডাকাতে। ডাকাতি হবে না? আজকাল ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হলে কী হয়? আশেপাশের চার-পাঁচ গ্রামের লোক চলে আসে। সাহায্য করার বদলে তারা করে লুটপাট। সুন্দরী মেয়ে থাকলে ধরে নিয়ে যায় পাটক্ষেতে।

লীলা বলল, মামা, শুধু-শুধু টেনশন করো না তো! কিছু হবে না।

মঞ্জু বিরক্ত গলায় বলল, কিছু হবে না তুই জানিস কীভাবে?

মিটিমিটি করে এতক্ষণ যে টর্চলাইট জ্বলছিল সেটিও নিভে গেল। কামরার ভেতর গাঢ় অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় যাত্রীদের ভীত মুখ দেখা যাচ্ছে। লীলার জানালার পাশে হুড়মুড় শব্দ হলো। লীলা চমকে উঠে বলল, মামা, কী হয়েছে?

মঞ্জু বলল, গাছ ভেঙে পড়েছে, আর কী হবে! ঝড়ের মধ্যে গাধা-ড্রাইভার জঙ্গলে ট্রেন দাঁড় করিয়েছে। দেখিস পুরো জঙ্গলই ট্রেনের উপর ভেঙে পড়বে। পুরো ট্রেন পাটিসাপটা হয়ে যাবে। ভাই, আপনাদের কারো সঙ্গে দেয়াশলাই আছে? দেয়াশলাই থাকলে জ্বালান তো!

দেয়াশলাই-এর কাঠি জ্বলেই নিভে গেল। ট্রেনের জানালা বন্ধ, তার পরও হু-হু করে বাতাস ঢুকছে। যাত্রীদের মধ্যে একজন (টর্চের মালিক) মঞ্জুমামাকে লক্ষ করে বলল, আপনেরা যাইবেন কই?

মঞ্জু বলল, তা দিয়ে আপনার কী? আমাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবো।

লীলা বলল, আমরা নয়াপাড়া যাব।

কোন নয়াপাড়া? নান্দাইল নয়াপাড়া?

হুঁ।

এইখান থাইক্যা খুব কাছে। উত্তরে হাঁটা দিলে দশ মিনিটের রাস্তা। শিয়ালজানি খাল পার হইলেই...

মঞ্জু বলল, এই যে বৃদ্ধ! চুপ করে থাকেন। বুদ্ধি দিবেন না। আপনার কথা শুনে ঝড়ের মধ্যে হাঁটা দেই আর ডাকাতের হাতে পড়ি!

একটা ভালো পরামর্শ দিলাম।

আপনাকে পরামর্শ দিতে হবে না। মরা ব্যাটারিওয়ালা টর্চ নিয়ে যে রওনা হয় আমি তার পরামর্শ নেই না।

নান্দাইল রোড ইস্টিশনে নামলে চার মাইল রাস্তা।

চার মাইল কেন, চল্লিশ মাইল হলেও নান্দাইল রোডেই নামব। আপনি চুপ করে বসে থাকেন।

জি আচ্ছা।

আপনার যদি খুব বেশি ইচ্ছা করে আপনি নিজে নেমে হাঁটা দেন।

ঝড় কমে এসেছে। এখন শুধু মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু ট্রেন নড়ছে না। মঞ্জু বলল, ব্যাপারটা কী?

লীলা বলল, মামা টেনশন কোরো না তো! সময় হলেই ট্রেন ছাড়বে।

মঞ্জু গলা নামিয়ে বলল, ড্রাইভার কাজটা ইচ্ছাকৃত করছে কি না কে জানে!

ইচ্ছাকৃত করবে কেন?

এদের যোগসাজস থাকে। বেকায়দা জায়গায় ট্রেন থামায়। আগে থেকে বোঝাপড়া থাকে। ডাকাত এসে সব সাফা করে দেয়।

মামা, তুমি জানালাটা খুলে দাও। এসো বৃষ্টি দেখি।

মঞ্জু বলল, বৃষ্টি দেখতে হবে না। যেভাবে বসে আছিস সেইভাবে বসে থাক। তুই রবি ঠাকুর না যে বৃষ্টি দেখতে হবে।

বাতাস আবারো বাড়তে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরপর দমকা হাওয়া। মঞ্জু হতাশ গলায় বলল— ধুনছে আমারে। ভালো বিপদে পড়লাম দেখি! ভাই, আপনাদের মধ্যে যাদের কাছে ছাতা আছে তাদের কেউ-একজন ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসেন না, ঘটনা কী।

আফনে নিজে যান।

আমি যাব কীভাবে? আমার সাথে মেয়েছেলে আছে দেখেন না? এইটা আপনাদের কীরকম বিবেচনা!

এমন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভারের কাছে কেউ খোঁজ নিতে যাবে বলে লীলা ভাবে নি। একজন সত্যি সত্যি রওনা হলো। সে খবর যা আনল তা ভয়াবহ—

লাইনের উপর বিরাট একটা গাছ পড়ে আছে। লাইনের ফিস প্লেট উঠে গেছে। ময়মনসিংহ থেকে রেসকিউ ট্রেন না আসা পর্যন্ত এই ট্রেন নড়বে না।

কামরার ভেতর গাঢ় অন্ধকার। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে— আলো ঝলমল করে উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে লীলা দু'হাতে কান চেপে ধরছে। বজ্রপাতের শব্দ তার সহ্য হয় না। প্রচণ্ড ভয় লাগে। লীলার মনে হলো, আল্লাহ ভালো ব্যবস্থা করেছেন— প্রথমে আলোর সংকেত পাঠাচ্ছেন, তারপর পাঠাচ্ছেন বজ্রের শব্দ। উল্টোটা হলে লীলার জন্যে খুব সমস্যা হতো। ঝড়বৃষ্টির সময় সারাক্ষণ দু'হাতে কান চেপে ধরে রাখতে হতো।

ভইন, আপনে নয়াপাড়া কার বাড়িতে যাইবেন?

প্রশ্নটা কে করেছে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। লীলার ধারণা হলো টর্চওয়ালা বুড়ো। লীলা বলল, সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের বাড়িতে যাব।

উনি আপনের কে হয়?

আমার বাবা। উনাকে চেনেন?

উনারে চিনব না আপনে কী কন? উনি অঞ্চলের বিশিষ্ট ভদ্রলোক। অতি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আপনেরে যেটা বললাম সেটা করেন— ঝড়বৃষ্টি থামলে উত্তরমুখী হাঁটা দেন। পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

আচ্ছা আমরা তা-ই করব।

মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল, হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিবি না লীলা। হুটহাট সিদ্ধান্ত আমার ভালো লাগে না। এই বুড়ো প্রথমবার বলেছে দশ মিনিটের রাস্তা, এখন বলছে পাঁচ মিনিট। এই বুড়ো খবরদার, তুমি আর মুখ নাড়বে না।

লীলা উত্তর দিল না। বেঞ্চে পা উঠিয়ে আরাম করে বসল। হুটহাট সিদ্ধান্ত অন্যের ভালো না লাগলেও তার ভালো লাগে। বাবাকে দেখতে আসার এই সিদ্ধান্তও হুট করে নেয়া। সিদ্দিকুর রহমান নামের মানুষটা ভয়ঙ্কর খারাপ— এই কথা জ্ঞান হবার পর থেকেই সে শুনে আসছে। এই মানুষটা তার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। অসহায় সেই মেয়ে মনের দুঃখে মরেই গেল। লোকটা কোনোদিন খোঁজ নিল না। সেই মেয়েটার ফুটফুটে একটা কন্যাসন্তান একা একা বড় হচ্ছে মামার বাড়িতে। তার খোঁজেও কোনোদিন এলো না। লোকটা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। দুঃখকষ্টে সেই স্ত্রীরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাকে চিকিৎসাও করাচ্ছে না। ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখছে। এমন একজন মানুষকে হঠাৎ দেখতে আসার পেছনে কোনো কারণ নেই। লীলা তাকে দেখে কী বলবে? 'বাবা' বলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে? এমন হাস্যকর কাজ সে কোনোদিনও করবে না। তবে

বিডিবাংলা ডট কম

কী করবে তাও জানে না। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। লীলা দু'হাতে কান চেপে বসে আছে। বজ্রপাতের প্রতীক্ষা।

সিদ্দিকুর রহমান খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর হাতে পাঁচ-ব্যাটারির একটা টর্চ। টর্চ জ্বালালে আলো বহুদূর পর্যন্ত যায়। মাঝে মাঝে তিনি জানালার ওপাশের জামগাছে আলো ফেলছেন। ঝড় যেভাবে বাড়ছে জামগাছের ডাল ভেঙে টিনের চালে পড়বে। তবে আতঙ্কিত হবার মতো কিছু না। গাছের ডাল জানান দিয়ে ভাঙবে— বেশ কিছু সময় ধরে মড়মড় শব্দ হবে। ঘর ছেড়ে বের হবার সময় পাওয়া যাবে। সিদ্দিকুর রহমান ভয় পাচ্ছেন না। একধরনের উত্তেজনা অনুভব করছেন। তিনি এতক্ষণ পা মেলে বসে ছিলেন, এইবার পা গুটিয়ে বসলেন। চাপা গলায় ডাকলেন, লোকমান!

ডেকেছেন একজনকে, কিন্তু দুই ভাই একসঙ্গে সাড়া দিল। দু'জনই চেঁচিয়ে বলল, জি। মনে হয় তারা ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, ঝড়ের গতি কেমন?

এইবার লোকমান জবাব দিল। ভীত গলায় বলল, গতিক ভালো না। টিনের বাড়িতে থাকা নিরাপদ না। চলেন পাকা দালানে যাই। শহরবাড়িতে গিয়া উঠি।

ভয় লাগতেছে?

লোকমান জবাব দিল না। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ভয়ের কিছু নাই। কপালে মৃত্যু থাকলে মৃত্যু হবে। পাকা দালানে থাকলেও হবে, আবার মাটির ভিতরে পঞ্চাশ হাত গর্ত খুঁড়ে বসে থাকলেও হবে। ঠিক না লোকমান?

জি ঠিক।

গোয়ালঘরের গরুগুলির দড়ি খুলে দাও।

জি আচ্ছা।

সুলেমানকে বলো হুক্কা ঠিক করে দিতে। ঝড়-তুফানের রাতে হুক্কা টানতে আরাম।

সিদ্দিকুর রহমান হুক্কার জন্যে অপেক্ষা করছেন। হুক্কা আসতে সময় লাগবে। হুক্কায় পানি ভরতে হবে। টিক্কায় আগুন দিতে হবে। অপেক্ষা করতে কোনো অসুবিধা নেই। চুপচাপ অপেক্ষা করার চেয়ে কারো সঙ্গে গল্প করতে করতে অপেক্ষা করা সহজ। তাঁর গল্প করার লোক নেই। তিনি যাদের সঙ্গে সব সময় ঘোরাফেরা করেন তারা 'হ্যাঁ'-'না'র বাইরে কোনো কথা বলে না। নিজের ছেলেমেয়েরাই বলে না। রমিলা সুস্থ থাকলে সে হয়তো কিছু গল্পটল্প করত।

সিদ্দিকুর রহমান ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করলেন, রমিলা যখন সুস্থ ছিল তার সঙ্গে গল্প করেছে কিনা। তেমন কিছু মনে পড়ছে না। হয়তো রমিলাও গল্প করত না।

লোকমান গোয়ালঘরের গরুগুলি ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছে, চাপা গলায় কেশে সে তার উপস্থিতি জানান দিয়েছে।

লোকমান!

জি।

ভিতরে আসো।

লোকমান ঘরে ঢুকল। সে ভিজে চুপসে গেছে। তার গা বেয়ে পানি পড়ছে। সে অল্প অল্প কাঁপছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, বৃষ্টির পানি কি বেশি ঠাণ্ডা?

জি, অত্যধিক ঠাণ্ডা।

এটা খারাপ লক্ষণ, ঝড় আরো বাড়বে। বড় ঝড়ের আগে বৃষ্টির পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়।

গোয়ালঘরের গরুগুলি ছেড়ে দিয়েছ?

জি।

গরুগুলি কী করল? ঘরেই আছে, না ছুটে বের হয়ে গেছে?

বাইর হইয়া গেছে।

এটাও খারাপ লক্ষণ। পশুপাখিরা গতিক সবচে' ভালো বোঝে। ঝড়ের সময় গরুর গলার দড়ি খোলার পরেও সে যদি নড়াচড়া না করে তাহলে বুঝতে হবে ঝড় তেমন জোরালো হবে না। আবার যদি দড়ি খোলামাত্র ছুটে বের হয়ে যায় তাহলে মহাবিপদ।

সুলেমান হুক্কা নিয়ে এসেছে। সিদ্দিকুর রহমান নল হাতে নিয়ে আস্তে টান দিলেন। তামাকটা ভালো। অতি সুঘ্রাণ।

লোকমান এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সিদ্দিকুর রহমান তাকে চলে যেতে না বলা পর্যন্ত সে যাবে না। তিনি কিছু বললেন না। একমনে তামাক টেনে যেতে লাগলেন। ঘরের টিনের চালে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। পেরেক উঠে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বাতাস বড় একটা ধাক্কা দেবে আর চাল উড়ে যাবে। খাটে বসে থেকে তিনি মাথার উপর ঝড়ের আকাশ দেখতে পাবেন।

লোকমান!

জি?

বোবাপ্রাণী ছাড়াও আরো এক কিসিমের মানুষ আছে যারা ঝড়-তুফানের গতিক বুঝতে পারে। তারা কারা বলো দেখি ?

জানি না।

পাগল মানুষ বুঝতে পারে। ঝড়-তুফান ভূমিকম্প এইসবের খবর পাগলের কাছেও আছে। তোমার চাচিআম্মারে যদি জিজ্ঞেস করো সে বলতে পারবে। পাগল হওয়ার কিছু উপকারিতাও আছে, ঠিক না লোকমান ?

লোকমান কিছু বলল না। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। তার বুক এখন ধড়ফড় করা শুরু করেছে। চাচাজি অনেকক্ষণ তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এই কাজটা তিনি যখনই করেন তখন বুঝতে হয় চাচাজি নাখোশ হয়েছেন। সিদ্দিকুর রহমান হুক্কায় লম্বা টান দিয়ে নল একপাশে রেখে খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন। তাঁর গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেল। ভারী হয়ে গেল। তিনি বললেন— আজকে ঝড়-তুফানের রাত। আমার বড় ছেলে মাসুদ বাড়িতে নাই। সে কোথায় গেছে তুমি জানো ?

জানি।

কোথায় গেছে ?

কুদ্দুস মিয়ার বাড়িতে।

সেখানে সে কী করে ?

মাসুদ ভাইজানের গানবাজনার শখ। ঐখানে গানবাজনা করেন।

তাহলে এই ঘটনা আজ প্রথম না। আগেও সে গিয়েছে। ঐ বাড়িতে রাত কাটিয়েছে।

জি।

তোমরা দুই ভাই এই ঘটনা জানতা, আমারে কিছু বলো নাই।

লোকমান জবাব দিল না। চুপ করে রইল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কুদ্দুস মিয়ার কি কোনো সেয়ানা মেয়ে আছে ?

জি আছে।

মেয়ের নাম কী ?

পরী। পরীবানু।

সিদ্দিকুর রহমান হুক্কার নলে কয়েকটা টান দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, এখন ঘটনা বোঝা গেল। আমার ছেলে গানবাজনার অজুহাতে সেয়ানা মেয়ের গায়ের গন্ধ শুঁকতে যায়। একটা বয়সের পরে সেয়ানা মেয়ের গায়ের গন্ধের জন্যে যুবক

ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা জগতের নিয়ম। তবে সব নিয়ম সব জায়গায় চলে না। লোকমান শোনো, তোমারে একটা কাজ দিতেছি— ঝড় কমলে কুদ্দুস মিয়ার বাড়িতে যাবে। তাকে আর তার মেয়ে পরীবানুকে নিয়ে আসবে।

জি আচ্ছা।

আর আমার পুত্রকেও ধরে নিয়ে আসবে। গানবাজনা কী শিখছে তার একটা পরীক্ষা হবে।

জি আচ্ছা।

এখন সামনে থেকে যাও।

লোকমান হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দ্রুত ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।

সিদ্দিকুর রহমান খাট থেকে নামলেন। আলমিরা খুলে রমিলার ঘরের চাবি বের করলেন। তিনি খানিকটা লজ্জা পাচ্ছেন। গোয়ালঘরের গরুগুলির কথা তার মনে হয়েছে। কিন্তু পাগলস্ত্রীর কথা মনে হয় নাই। যখন গরুর গলার দড়ি খোলা হয়েছে তখন রমিলার ঘরের চাবিও খোলা উচিত ছিল।

রমিলা ঘরের এক কোনায় জড়সড় হয়ে বসেছিল। তালা খুলে সিদ্দিকুর রহমান ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাথায় ঘোমটা দিল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কেমন আছ গো বউ ?

রমিলা নিচু গলায় বলল, ভালো আছি।

বিরাট ঝড়-তুফান শুরু হয়েছে। ভয় পাইছিলা ?

হুঁ।

ডাক দিলা না কেন ?

রমিলা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, চলো পাকা ঘরে যাই। টিনের এই ঘরের অবস্থা ভালো না। যে-কোনো সময় চাল উড়ে যাবে।

আমি এইখানেই থাকব।

এইখানে থাকবা ?

জি।

কেন ?

এই ঘর ছাইড়া কোনোখানে যাইতে আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগালাগির কিছু তো নাই বউ। ঝড়-তুফানের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হয়।

ঝড়-তুফান শেষ হয়েছে। আর হবে না।

আর হবে না ?

না।

সিদ্দিকুর রহমান কান পাতলেন। আসলেই তো তাই, শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শুধুই বৃষ্টির শব্দ। রমিলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। পাগল মানুষের হাসি-কান্না কোনো ব্যাপার নয়। পাগলমানুষ কারণ ছাড়াই হাসে। কারণ ছাড়াই কাঁদে। তবু সিদ্দিকুর রহমান অভ্যাসবশে জিজ্ঞেস করলেন, হাসো কেন বউ ?

রমিলা হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, বাড়িতে কুটুম আসতেছে। আমার মনে আনন্দ, এইজন্যে হাসতাছি।

কুটুমটা কে ?

সেটা আপনেরে বলব না।

রমিলা এখনো হাসছে। সিদ্দিকুর রহমান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন। রমিলা হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলল, কুটুম আসতেছে, তার জোগাড়যন্ত্র করেন। খাড়াইয়া আছেন ক্যান ?

সিদ্দিকুর রহমান রমিলাকে তালাবন্ধ করে চলে এলেন। রমিলা ঠিক আগের জায়গায় গুটিসুটি মেরে বসে গেল। এখন সে আর হাসছে না।

রাত চারটা বাজে। ফজরের আজানের বেশি দেরি নেই। এখন ঘুমোতে যাবার অর্থ হয় না। সিদ্দিকুর রহমান ঠিক করলেন, অজু করে বারান্দায় বসে ভোরের প্রতীক্ষা করবেন। ফজরের নামাজের পর তুফানে গ্রামের কী ক্ষয়ক্ষতি হলো তা দেখতে বের হবেন। ইতিমধ্যে মাসুদ চলে আসবে। তার বিষয়ে ব্যবস্থা কী নেয়া যায় সেটাও ভাবা দরকার।

সিদ্দিকুর রহমান বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। তাঁর পাশেই সুলেমান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুফান কি কমেছে ?

সুলেমান বলল, জি।

মাঝে মাঝে বড় রকমের ঝড়-তুফান হওয়া ভালো। বন্যার সময় কী হয় দ্যাখো— জমিতে পলি পড়ে, ফসল ভালো হয়। ঝড়-তুফানেরও সেরকম উপকার আছে।

সুলেমান কিছু বলল না। যেভাবে বসে ছিল সেইভাবেই বসে রইল। সিদ্দিকুর রহমান ভেবেছিলেন সুলেমান বলবে, ঝড়-তুফানের কী উপকার আছে ? তখন তিনি উপকার ব্যাখ্যা করবেন। সুলেমান কিছু জানতে চাইল না বলে তাঁরও বলা হলো না। অবিশ্যি ঝড়-তুফানের কী উপকার তিনি জানেন না। ভেবে বের করতে হতো। জটিল জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে তাঁর ভালো লাগে। নানান কাজ-কর্মে তিনি ব্যস্ত থাকেন। চিন্তার সময় পাওয়া যায় না। দিনের কিছুটা সময় যদি আলাদা করে রাখা যেত তাহলে ভালো হতো। এই সময় তিনি চিন্তা করবেন। আর কিছু করবেন না।

সুলেমান!

জি ?

চা চানাও, চা খাব।

জি আচ্ছা।

একটা পাতলা চাদর এনে আমার গায়ে দিয়ে দাও, শীত-শীত লাগছে।

জি আচ্ছা।

চা বানিয়ে আনার পর যদি দেখ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তাহলে আমাকে ডাকবে না।

জি আচ্ছা।

লোকমান কি মাসুদকে আনতে গেছে ?

জি।

পাখি কিচিরমিচির করতেছে, শুনতেছ ?

জি।

তুফান শেষ হয়েছে এইজন্যে এরা আনন্দ করতেছে। এ তার গায়ে ঠোকর মারতেছে। পশুপাখিরা মারামারি কামড়াকামড়ি করে আনন্দ প্রকাশ করে। পশুপাখির জগতের নিয়মকানুন বড়ই অদ্ভুত। সুলেমান শোনো, আমার গায়ে চাদর দেয়ার দরকার নাই। শীত-শীত ভাবটা ভালো লাগতেছে।

জি আচ্ছা।

সুলেমান চা বানিয়ে এনে দেখে, সিদ্দিকুর রহমান ঘুমোচ্ছেন। ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে। সে চায়ের কাপ পাশে রেখে আগের ভঙ্গিতেই বসেই পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান পড়ল। সুলেমান ভেবে পেল না সে এখন কী করবে। চাচাজিকে ডেকে তুলবে ? তিনি বলেছিলেন তাঁর ঘুম যেন ভাঙানো না হয়। সুলেমান খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল।

সিদ্দিকুর রহমানের ঘুম ভাঙল ফজরের আজানের কিছুক্ষণ পর। তিনি চোখ মেলে দেখলেন অসম্ভব রূপবতী অপরিচিত একটি তরুণী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তরুণীর মুখ হাসিহাসি। চোখে বিস্ময়। তাঁকে চোখ মেলতে দেখেই তরুণী তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে বলল— বাবা, আমি লীলা। লীলাবতী। আপনার কি শরীর খারাপ ?

সিদ্দিকুর রহমান জবাব দিলেন না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লীলাবতী অসঙ্কোচে তাঁর বুকের উপর হাত রাখল। সিদ্দিকুর রহমানের দুই চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করল। কতদিন পর নিজের মেয়েকে দেখছেন। কী সুন্দর মেয়ে! তাকে অবিকল দেখাচ্ছে কিশোরী আয়নার মতো। আবার সে আয়নাও না, অন্য কেউ। মেয়েকে কিছু বলা দরকার। কোনো কথা মনে আসছে না। আহারে! মেয়েটা খবর দিয়ে কেন এলো না! খবর দিয়ে এলে তিনি সুসং দুর্গাপুর থেকে ভাড়া করে হাতি আনতেন। স্টেশন থেকে মেয়ে আসত হাতিতে চড়ে। সঙ্গে থাকত বাদ্যবাজনা। আহারে! মেয়েটা কেন আগে খবর দিল না ?

আচ্ছা এটা কি সম্ভব যে পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্নে ঘটছে ? কেউ তাঁর কাছে আসে নি। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যেই ইচ্ছাপূরণ জাতীয় একটি স্বপ্ন দেখছেন। আগেও এরকম হয়েছে। দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছিলেন— স্বপ্নে দেখলেন, আয়না এসেছে। সে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, জ্বর কি বেশি ? তিনি বললেন, হুঁ, কপালে হাত দিয়ে দেখো। আয়না বলল, কপালে হাত দিতে পারব না। আমি হলুদ বেটেছি, হাতে হলুদ। তারপরেও আয়না কপালে হাত দিল। তিনি নাকে কাঁচা হলুদের গন্ধ পেলেন। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কপালে হলুদের গন্ধ কিন্তু চলে গেল না। সেই গন্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকল।

লীলা কি সত্যি এসেছে ? সত্যি কি মেয়েটা তার বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ? সে তার মায়ের মতো কপালে হাত রাখল না কেন ?

সিদ্দিকুর রহমান বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। তাদের ঘিরে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে কোনো রকম মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করা ঠিক না। তিনি অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ গলায় বললেন, পরিশ্রম করে এসেছ। ভিতরের বাড়িতে যাও, হাত-মুখ ধোও।

সব জায়গার আলাদা গন্ধ আছে। এই জায়গার গন্ধটা বুনো। লতাপাতার কষটা কড়া গন্ধ। তার পরেও লীলার কাছে মনে হলো, কেমন যেন আপন-আপন গন্ধ। যেন অনেক দিন আগে গভীর কোনো জঙ্গলে সে পথ হারিয়ে খুব ছোটাছুটি করেছিল। পথ হারানোর দুশ্চিন্তায় সেই গভীর বনের কিছুই লীলার মনে নেই, কিন্তু লতাপাতার গন্ধটা নাকে লেগে আছে। অনেক দিন পর আবার সেই বুনো ঘ্রাণ পাওয়া গেল। লীলা নিজের মনেই বলল— বাহ্, ভালো তো! নিজের মনে কারণে অকারণে 'বাহ্, ভালো তো' বলা লীলার অনেক দিনের অভ্যাস।

গন্ধটা কিসের কাউকে জিজ্ঞেস করলে হতো। লীলা তেমন কাউকে দেখছে না। টিন এবং কাঠের প্রকাণ্ড বাড়িটা প্রায় ফাঁকা। তবে এই ফাঁকাও অন্যরকম ফাঁকা। মনে হচ্ছে এ-বাড়ির লোকজন কাছেই কোথাও বেড়াতে গেছে। সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। তখন খুব হৈচৈ শুরু হবে। বাড়ির এত বড় উঠোন। এই উঠোনে ছ'সাতজন শিশু কাদা মেখে ছোটাছুটি না করলে কি মানায় ? কেউ পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদবে, কেউ হাসবে।

সবুজ গেঞ্জি পরা প্রচণ্ড বলশালী একজন লোককে দেখা গেল গভীর কৌতূহলে আড়চোখে লীলাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই লোকটা চট করে চোখ নামিয়ে ফেলল। মেঝের দিকে তাকিয়ে খাম্বার মতো হয়ে গেল। যেন সে ভয়ঙ্কর কোনো অপরাধ করেছে। এই অপরাধের শাস্তি হলো মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকা। লীলা বলল, আপনার নাম কী ? লোকটা মেঝে থেকে চোখ না তুলে বলল, সুলেমান!

এই বাড়ির আর লোকজন কোথায় ?

চাচাজি ছাড়া এইখানে আর কেউ থাকে না।

বাকিরা কোথায় থাকে ?

'শহরবাড়িত' থাকে।

শহরে থাকে ?

জি না। এইখানেই থাকে— 'শহরবাড়িত' থাকে।

বিডিবাংলা ডট কম

আপনার কথা বুঝতে পারছি না। 'শহরবাড়িত' জিনিসটা কী ?

সুলেমান আঙুল তুলে দেখাল। যে-জায়গাটা দেখাল সেখানে ঘন বাঁশের জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই। সুলেমান বলতে পারল না যে— শহরবাড়ি হলো শহরের মতো বাড়ি, সে-বাড়িতে সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের ছেলেমেয়েরা থাকে। বেশি কথা বলার অভ্যাস তার নেই। চাচাজির বড় মেয়েটির সামনে কী কারণে যেন তার খুব অসহায় লাগছে।

সুলেমানের সঙ্গে কথা বলে লীলা খুব মজা পাচ্ছে। লোকটা এখন পর্যন্ত একবারও চোখ তোলে নি। মেঝের দিকেই তাকিয়ে আছে। লোকটা আঙুল তুলে শহরবাড়ি কোনদিকে দেখিয়েছে। সেই আঙুল সঙ্গে সঙ্গে নামায় নি। অনেকক্ষণ তুলে রেখেছে। লীলা বলল, আপনি মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন কেন ? আমার সঙ্গে যখন কথা বলবেন আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন।

জি আচ্ছা।

আমার সঙ্গে যে-মানুষটা এসেছেন উনি সম্পর্কে আমার মামা হয়। উনি কোথায় ?

জানি না।

উনাকে খুঁজে বের করুন। উনার খুব ঘনঘন চা খাবার অভ্যাস। উনাকে চা বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। চাপাতা, চিনি, দুধ সব উনার সঙ্গে আছে। ভালো চা ছাড়া উনি খেতে পারেন না বলে এই অবস্থা। উনাকে চা বানিয়ে খাওয়াতে পারবেন না ?

জি পারব।

আপনি কিন্তু এখনো একবারও আমার দিকে তাকান নি। আমি কে— সেটা জানেন তো ? আমি আপনার চাচাজির মেয়ে। যেহেতু আমার বাবাকে আপনি চাচা ডাকছেন— এখন আমি সম্পর্কে হচ্ছি আপনার বোন। বোনের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায়।

সুলেমান এই প্রথম একটু নড়ল। চোখ তুলে এক ঝলক লীলাকে দেখেই চোখ নামিয়ে ফেলল। লীলা মনে মনে হাসল। সুলেমান নামের খাম্বা টাইপ মানুষটা যে লীলার এই কথায় অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাবে তা লীলা জানত। যেরকম ভাবা হয় ঘটনা সেরকম ঘটলে বেশ মজা লাগে।

এই বাড়িতে শুধু চাচাজি থাকে আর কেউ থাকে না— কথাটা মিথ্যা। কিছুক্ষণের মধ্যেই লীলা তার প্রমাণ পেল। দুটা বেণি দুলানো মেয়েকে দেখা গেল সারাক্ষণই আড়াল থেকে তাকে দেখছে। হাত ইশারা করে কাছে ডাকলেই

তারা সরে যাচ্ছে। এই মেয়ে দুটি কে ? বাড়ির শেষ মাথায় একটা ঘরে একজন মহিলাকে দেখা গেল। মহিলা লীলাকে দেখে ভয় পেলেন বলে মনে হলো। মাথায় কাপড় দিয়ে ঘরের এক কোনায় সরে গেলেন। মাথায় বড় করে ঘোমটা দেয়ায় তার কপাল ঢাকা পড়েছে। চোখও খানিকটা ঢাকা পড়েছে। তবু বোঝা যাচ্ছে তিনি খুবই কৌতূহল নিয়ে লীলাকে দেখছেন। লীলা বলল, স্লামালিকুম। মহিলা জবাব দিলেন না। মহিলাকে ভালোভাবে দেখতে হলে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। লীলা দরজার কাছে গিয়ে খুবই অবাক হলো। দরজার কড়ায় ভারী একটা তালা ঝুলছে। মহিলাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। লীলা আবারো জানালার কাছে ফিরে গেল। বিস্মিত গলায় বলল, এই যে শুনুন! আপনি কি একটু সামনে আসবেন ? আপনার সঙ্গে কথা বলব।

মহিলা আড়াল থেকে বললেন, আমি সামনে আসব না গো মা। আমার লজ্জা লাগে।

আপনাকে তালাবন্ধ করে রেখেছে কেন ?

আমার মাথার ঠিক নাই, এই জন্যে তালাবন্ধ কইরা রাখে। পাগল-মানুষ, কখন কী করি তার কি ঠিক আছে ?

লীলা বুঝতে পারছে এই মহিলা কে। তারপরেও সে বোকার মতো বলল, আপনি কে ?

আমি মাসুদের মা।

মাসুদটা কে ?

মহিলা জবাব দিলেন না। আড়াল থেকেই শব্দ করে হাসলেন। ভদ্রমহিলার অনেক বয়স। কিন্তু তিনি হাসলেন ঝনঝনে কিশোরীর মতো গলায়। লীলা বলল, আমার নাম লীলা।

আমি জানি, তুমি লীলাবতী।

কীভাবে জানেন ?

আমি তোমারে খোয়াবে দেখেছি। খোয়াবে তোমারে যত সুন্দর দেখেছি তুমি তার চেয়েও সুন্দর। তয় গায়ের রঙ সামান্য ময়লা। মা গো, গায়ের রঙ নিয়ে মনে কষ্ট রাখবা না।

লীলা বলল, আমার কোনো কষ্ট নাই।

মহিলা বললেন, গায়ের রঙ নিয়া কষ্ট সব মেয়ের আছে, তোমারও আছে। গায়ের রঙ ঠিক করনের উপায় আছে। তুমি জানতে চাইলে বলব।

লীলা বলল, আচ্ছা কী উপায় ?

মহিলা হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন— গায়ের রঙ নিয়া তোমার যদি কষ্ট না থাকত, রঙ ঠিক করনের উপায় জানতে চাইতা না।

আপনার বুদ্ধি ভালো।

পাগলের বুদ্ধি মা। পাগলের বুদ্ধির কোনো ভালো-মন্দ নাই। গায়ের রঙ ঠিক করনের উপায়টা বলব ?

বলুন।

জ্যৈষ্ঠমাসে কালো জামের রস সারা শইল্যে মাখবা। সেই রস শুকাইয়া যখন শইল্যে টান দিব তখন কুসুম কুসুম গরম পানিতে গোসল করবা।

একবার করলেই হবে ?

না। যতদিন কালোজাম পাওয়া যায় ততদিন করবা। ইনশাল্লাহ্ রঙ ফুটব।

আপনি সামনে আসুন, আড়াল থেকে কথা বলছেন আমার ভালো লাগছে না। সামনে এসে মুখের ঘোমটা সরান।

সামনে আসব না মা।

কেন আসবেন না ?

আমার লজ্জা করে।

আমি আপনার মেয়ে। মেয়ের সঙ্গে কিসের লজ্জা!

আমি পাগল-মানুষ। পাগল-মানুষ সবেরে লজ্জা করে। নিজের মেয়েরেও লজ্জা করে। তুমি তো আমার নিজের মেয়ে না।

আপনার সঙ্গে কি সবসময় আড়াল থেকে কথা বলতে হবে ?

জানি না। মা গো, তুমি এই বাড়িতে কয়দিন থাকবা ?

আমি বাবাকে দেখতে এসেছিলাম। দেখা হয়েছে, কাজেই কালপরশু চলে যাব।

আইচ্ছা। তোমারে আমার খুবই মনে ধরেছে। পাগল হওনের পর থাইক্যা কাউরে মনে ধরত না। এই প্রথম মনে ধরল। এখন যাও, নিজের মনে বেড়াও। বাড়ির পেছনে বাগান আছে, বাগান দেইখ্যা আসো।

বাগান আপনি করেছিলেন ?

না। তোমার পিতার বাগান।

গ্রামের বাড়ির বাগান ঝোপেঝাড়ে ভরতি থাকে। লীলা অবাক হয়ে দেখল বাগানটা ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে কেউ এসে ঝাঁট দিয়ে শুকনো পাতা সরিয়েছে। সবই দেশী ফুলের গাছ। নানান জাতের জবা ফুলের গাছ। কামিনী গাছ, কাঠগোলাপের গাছ, বেলি ফুলের গাছ। বাঁশের বেড়া দেয়া

অনেকখানি জায়গায় গোলাপের চাষ করা হয়েছে। গ্রামের মানুষজন শখ করে গোলাপবাগান করে না। এখানে করা হয়েছে। প্রচুর গোলাপ ফুটেছে। লীলা মুগ্ধ হয়ে গেল।

মাঝামাঝি জায়গায় বাঁধানো কুয়া। কুয়া শহর এবং শহরতলির জিনিস। গ্রামে পুকুর কাটা হয়, কুয়া কাটা হয় না। কুয়ার পাড় বাঁধানো। লীলা তার অভ্যাসমতো বলল, বাহ্ ভালো তো! বাগানের শেষপ্রান্তে বেদির মতো বানানো। হয়তো বসে বিশ্রাম করার জায়গা। এই জায়গাটা ঝোপঝাড়ে ভরতি। বাগান দেখাশোনার দায়িত্বে যে আছে সে নিশ্চয়ই এখানে আসে না। লীলা বেদিতে বসল। সঙ্গে এক কাপ চা থাকলে ভালো হতো। বেদিতে বসে নিরিবিলি চা খাওয়া যেত। তার সামান্য মাথা ধরেছে। যেভাবেই হোক মাথাধরাটা দূর করতে হবে। দূর করতে না পারলে মাথার এই যন্ত্রণা একসময় খুব বাড়বে। তার নিজের জগতটা এলোমেলো করে ফেলবে। বাগানের খোলা হাওয়ায় হয়তো উপকার হবে। লীলা বেদিতে পা তুলে বসল। তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। শুয়ে পড়লে ক্ষতি নেই, কেউ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না। বাড়ির পেছনের এই জায়গাটার তিন দিকেই জঙ্গল। একদিকে বাঁশঝাড়, বাকি দু'দিকে আম-কাঁঠালের বন। এত ঘন করে কেউ আম-কাঁঠালের গাছ লাগায় না। মনে হচ্ছে ইচ্ছা করেই বন তৈরি করা হয়েছে, যেন বাগানের দিকে কারো চোখ না যায়। লীলা শাড়ির আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথার উপরের আকাশ এখনো কালো হয়ে আছে। ঝড় কেটে গেছে, আকাশের মেঘ এখনো কাটে নি। শুয়ে শুয়ে মেঘলা আকাশ দেখতে ভালো লাগছে। গত রাতটা নানান ঝামেলায় কেটেছে। একফোঁটা ঘুম হয় নি। এখনো যে ঘুম পাচ্ছে তা না, ঝিমঝিম লাগছে। বেলা কত হয়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। তার হাতে ঘড়ি নেই। তবে বেলা বেশি হয় নি। এ বাড়িতে সে এসে পৌঁছেছে ফজরের আজানের পরপর। খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানিক সময় পার হয়েছে। এই একঘণ্টায় অনেক কিছু ঘটে গেল। বাবার সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। প্রথম দেখাটা কেমন হবে এ নিয়ে সে অনেককিছু ভেবেছিল। বাস্তবের সঙ্গে ভাবনা কিছুই মেলে নি। তার বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। সে বাবার কাছে ঝুঁকে এসে বলেছিল, বাবা আমি লীলা, লীলাবতী। আপনার কি শরীর খারাপ ? তিনি তার দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিস্ময় ছিল কি না লীলা বুঝতে পারল না। আধো-অন্ধকারে চোখের বিস্ময় ধরা পড়ে না। তবে তাঁর চোখ দিয়ে যে পানি পড়ছিল সেটা দেখা গেছে। চোখের জল অন্ধকারেও চিকচিক করে। হঠাৎ কোনোরকম কারণ ছাড়া সে বাবার জন্যে তীব্র মমতা বোধ করল। কোনোরকম কারণ ছাড়া— কথাটা ঠিক হলো না। বাবার চোখের জল

একটা কারণ হতে পারে। মানুষের চোখের জল তীব্র অ্যাসিডের মতো ক্ষমতাধর। কঠিন লোহার মতো হৃদয়ও এই অ্যাসিড গলিয়ে ফেলে। লীলা অসঙ্কোচে তার বাবার বুকের উপর হাত রাখল। মানুষটা একটু কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেলেন। মেয়ের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাবা-মানুষটা যেরকম হবেন বলে লীলা ভেবেছিল মানুষটা মোটেই সেরকম না। রোগা ছোটখাটো একজন মানুষ। মুখের চামড়া শক্ত। আবেগশূন্য মানুষ— যারা হাসেও না, কাঁদেও না— তাদের মুখের চামড়া শক্ত হয়ে যায়। তবে মানুষটার চোখ বড় বড়। আল্লাহ্ যেসব মানুষকে বিস্মিত হবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠান তাদের চোখ বড় বড় করে দেন। কে জানে লীলার বাবাকে তিনি হয়তো বিস্মিত হবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। লীলা তার বাবার একটি ব্যাপারে খুবই অবাক হয়েছে। আবেগকে অতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। যার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তিনি মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে সহজ গলায় লীলাকে বললেন, পরিশ্রম করে এসেছ— ভেতরের বাড়িতে যাও। হাত-মুখ ধোও। যেন লীলা এ-বাড়িতে প্রায়ই আসে। তার এই আসা নতুন কিছু না।

ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ হচ্ছে। লীলা চোখ মেলে দেখল তার মাথার উপর চিল উড়াউড়ি করছে। দুটা সোনালি রঙের চিল। চিল আকাশের অনেক উপরে উড়ে। এই দুজন নিচে নেমে এসেছে। চিলের গলার আওয়াজ এত কর্কশ হয় তাও লীলা জানত না। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। তখনি মনে হলো সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম বেশিক্ষণ হয় নি। হয়তো পাঁচ মিনিট কিংবা দশ মিনিট। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে সে দীর্ঘসময় বেদিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমাবার জন্যে জায়গাটা খুবই আরামের। লীলা বাড়ির দিকে রওনা হলো। মঞ্জু মামার খোঁজ নেয়া দরকার— বেচারা তার চা পেয়েছে কি না। কেউ কি আছে তার সঙ্গে? নাকি সে একা একাই ঘুরছে?

মঞ্জুর পা কেটেছে। তিনি শহরবাড়ি নামের পাকা দালানের বারান্দায় মোড়ায় বসে আছেন। তাঁর সামনে আরেকটা মোড়া। সেই মোড়ায় তাঁর কেটে যাওয়া পা রাখা আছে। নয়-দশ বছরের একটি মেয়ে কাটা পায়ের চিকিৎসা করছে। বেশ গুছিয়েই করছে। সে একটা কুপি জ্বালিয়েছে। কুপির আগুনে কাপড় পুড়িয়ে ছাই বানাচ্ছে। সেই ছাই পায়ের কাটা জায়গায় যত্ন করে লাগিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটার মুখ গোল। মায়া-মায়া চেহারা। মঞ্জু মেয়েটির আদর-যত্নে মোহিত হলে বললেন, নাম কী গো মা তোমার?

কইতরী।

কইতর থেকে কইতরী? বাহ সুন্দর নাম! তুমি কি সিদ্দিক সাহেবের কেউ হও?

মেয়ে হই।

বলো কী! তুমি সিদ্দিক সাহেবের মেয়ে? উনার মেয়ে হয়ে আমার পায়ের ময়লা পরিষ্কার করছ এটা কেমন কথা?

কিছু হবে না।

মঞ্জু খুশি খুশি গলায় বললেন, কিছু হবে না— এটা ঠিক। বিখ্যাত একটা কবিতা আছে—

বাদশা আলমগীর

কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলভী দিল্লির...।

কবিতাটা জানো?

জি না!

আমিও তো মাত্র দুই লাইন জানি— ধুনছে আমারে। তুলা ধুনা করছে।

মঞ্জু হতভম্ব হবার মতো মুখভঙ্গি করলেন।

কইতরী এই দৃশ্য দেখে এতই মজা পেল যে, হেসে কুটি কুটি হলো।

মঞ্জু বাচ্চা মেয়েটির হাসি দেখে আনন্দে অভিভূত হলেন। তার কাছে মনে হলো— ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে এ বাড়িতে আসা সার্থক হয়েছে। আরেকটি মেয়েকে দরজার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা যাচ্ছে।

মঞ্জু একবার বললেন, এই তুমি কে?

মেয়েটি কথা শুনে প্রায় উড়ে চলে গেল।

লীলা শহরবাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল। মাঝপথ থেকে ফিরে এলো। অবাক হয়ে মূল বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। শূন্য বাড়ি লোকজনে ভরতি হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে। সবার চোখে-মুখে সংশয়। বাড়ির খুঁটি ধরে তরুণী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে দেখেই মনে হচ্ছে সে খুব ভয় পাচ্ছে। লীলাকে ঢুকতে দেখে মেয়েটি চোখ তুলে লীলার দিকে তাকাল। লীলা সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলল, বাহ্, সুন্দর তো মেয়েটি!

সিদ্দিকুর রহমানের বাড়ির উঠানে বিচারসভা বসেছে। লোকমান কিছুক্ষণ আগে কুদ্দুস মিয়া এবং তার মেয়ে পরীবানুকে নিয়ে এসেছে। সিদ্দিকুর রহমানের বড়

ছেলে মাসুদ তাদের সঙ্গে এসেছে। আশপাশের কৌতূহলী কিছু লোকজন চলে এসেছে। মসজিদের ইমাম সাহেব এসেছেন। ফুটফুটে দু'টি মেয়ের একটিকে দেখা যাচ্ছে। সে খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে। এই মেয়েটির মনে হয় লজ্জা বেশি।

সিদ্দিকুর রহমান তাঁর আগের জায়গাতেই আছেন। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁকে সামান্য বিরক্ত মনে হচ্ছে। লীলা তার বাবার পাশে দাঁড়াল। সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন— যাও, ভেতরে যাও। এইখানে দাঁড়ানোর দরকার নাই।

লীলা দাঁড়িয়েই রইল, নড়ল না।

সিদ্দিকুর রহমান হাত-ইশারায় মাসুদকে ডাকলেন। মাসুদ সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো। ভয়ে তার শরীর কাঁপছে। ফর্সা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে তার বাবার দিকে তাকাচ্ছে না। সে তাকাচ্ছে লীলার দিকে। এই মেয়েটিকে সে চিনতে পারছে না। অপরিচিত একটি তরুণী মেয়ের সামনে তাকে কী শাস্তি দেয়া হবে কে জানে! তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কাঁদতে পারছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। লীলা ছেলেটাকে চেনে না, আগে কখনো দেখে নি। তারপরেও সে স্পষ্ট বুঝল, এই ছেলেটা সম্পর্কে তার ভাই। তাদের দুজনের মা ভিন্ন হলেও তারা ভাইবোন। ছেলেটার ভীতমুখ দেখে লীলার মায়া লাগছে। বেচারা এত ভয় পাচ্ছে কেন? ভয়ঙ্কর কোনো অপরাধ কি সে করেছে? নিতান্তই বালক চেহারার একজন ভয়ঙ্কর কী করতে পারে? এর বয়স কত হতে পারে ষোল সতেরো না-কি আঠারো?

সিদ্দিকুর রহমান ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি নাকি ইদানীং গান-বাজনা শিখছ?

এই প্রশ্ন করতে করতে তিনি আধশোয়া অবস্থা থেকে বসা অবস্থায় চলে এলেন। তাঁর গলার আওয়াজ শান্ত। যেন তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। পড়াশোনার খবর যেভাবে নিতে হয় সেভাবেই গান-বাজনার খবর নিচ্ছেন।

কথার জবাব দাও না কেন? গান-বাজনা নাকি শিখছ?

জি।

গান দু'একটা শিখেছ?

জি না।

তাহলে কি বাদ্য-বাজনায় আছ?

জি।

WWW.BDBANGLA.COM

কী শিখছ? তবলা? ছেলেপুলে বখাটে হয়ে গেলে প্রথম শিখে তবলা। তবলা শিখেছ?

জি।

কতটুকু শিখেছ?

মাসুদ জবাব দিল না। সিদ্দিকুর রহমান লোকমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, দৌড় দিয়া যাও, কুদ্দুসের বাড়ি থেকে তবলা আর বাঁয়া নিয়ে আসো। আমার পুত্র তবলা কেমন শিখেছে তার পরীক্ষা হবে। এত কষ্ট করে একটা বিদ্যা শিখেছে। দেখি সেই বিদ্যার কী অবস্থা!

লীলার হাসি পাচ্ছে। শুরুতে তার বাবার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল— ভয়ঙ্কর কোনো বিচার হবে। এখন সে-রকম মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পুরো বিচার ব্যবস্থার মধ্যে হালকা মজা আছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন আবার সত্যি সত্যি দৌড়ে তবলা আনতে গেছে। সবচে' ভালো হয় ছেলেটা যদি চমৎকার তবলা বাজিয়ে সবাইকে হতভম্ব করে দেয়। সেটা মনে হয় বেচারা পারবে না। কারণ সে থরথর করে কাঁপছে। এত ভয় পাচ্ছে কেন? লীলার ইচ্ছা করছে ছেলেটাকে সে বলে— এত ভয় পাচ্ছ কেন? উনি তোমার সঙ্গে মজা করছেন। তোমাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করার চেষ্টা করছেন। হাসি-তামাশা গায়ে না মাখলেই হয়।

সিদ্দিকুর রহমান ছেলের দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় ডাকলেন, মাসুদ!

মাসুদ ক্ষীণস্বরে বলল, জি?

তবলা এমন কঠিন বিদ্যা যে এটা শেখার জন্যে মানুষের বাড়িতে রাত কাটাতে হয় এটা জানতাম না। তুমি কি সারারাত তবলা বাজাও, নাকি তবলা শেখার পাশে পাশে কুদ্দুসের মেয়েটার সাথে তবলা বিষয়ে কথা বলো? কুদ্দুসের মেয়ে যেহেতু গান-বাজনার মধ্যে আছে সেও নিশ্চয়ই তবলা বিষয়ে জানে। এই মেয়ে, তুমি জানো না?

পরীবানু কিছু বলল না। খুঁটির আড়ালে চলে গেল।

তোমার নাম কী?

পরীবানু জবাব দিল না। পরীবানুর বাবা কুদ্দুস ভীত গলায় বলল, জনাব, আমার মেয়ের নাম পরীবানু।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, মেয়ে যেমন সুন্দর, নামও সুন্দর। এই মাসুদ, পরীবানু সুন্দর মেয়ে না?

মাসুদ পুরোপুরি পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর কিছু যে আসছে সে বুঝতে পারছে। কতটা ভয়ঙ্কর সে-সম্পর্কে তার ধারণা নেই।

সিদ্দিকুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মাসুদ যাও, পরীবানুর পায়ে কদমবুসি করে বলো— তুমি আমার মা। এটা বলতে দোষের কিছু নাই। মেয়েছেলে মায়ের জাত। বয়সে ছোট মেয়েকেও মা ডাকা যায়। যাও, দেরি করবা না। দেরি আমার ভালো লাগে না। পরীবানু এখন থেকে তোমার মা।

লীলার কাছে মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এখন আর হাসি-তামাশা রসিকতার পর্যায়ে নেই। বাড়াবাড়ি ভালো জিনিস না। সে কিছু বলতে যাবে তার আগেই মাসুদ পরীবানুর কাছে এসে বসে পড়ল। হাত দিয়ে পা স্পর্শ করল না, তবে মুখ বিড়বিড় করে বলল, আপনি আমার মা।

পরীবানু কাঁদছে। কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, তবে শরীর কাঁপা দেখে বোঝা যাচ্ছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, শাস্তি সামান্য বাকি আছে। আমার এই ছেলে লজ্জার মাথা খেয়েছে। তার এখন লাজলজ্জা নাই। যে-মেয়ের সঙ্গে ভাব ভালোবাসার চেষ্টা করেছে তারেই মা ডাকতেছে। সুলেমান, এখন আমার বেহায়া ছেলেরে কানে ধরে সারা গ্রামে একটা চক্কর দেবার ব্যবস্থা করো। ন্যাংটা করে চক্কর দেয়াবে। গায়ে যেন একটা সুতাও না থাকে। লজ্জা যখন নষ্ট হয়েছে পুরোপুরি নষ্ট হোক। দেরি করবা না, এরে ন্যাংটা করো। এইখানেই করো। মেয়েরা উপস্থিত আছে তাতে কোনো অসুবিধা নাই। মেয়েদের মধ্যে একজন এখন সম্পর্কে তার মা হয়, মা'র সামনে পুত্র নগ্ন হতে পারে। এতে লজ্জা নাই।

লীলা অবাক হয়ে দেখল, সত্যি সত্যি সুলেমান নামের লোকটা মাসুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে-ভঙ্গিতে এগোচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে নগ্ন করার কাজটা সে করবে। লীলা সুলেমানের দিকে এক পা এগিয়ে কঠিন গলায় বলল, সুলেমান শুনুন, খবরদার! যথেষ্ট হয়েছে।

সুলেমান থমকে দাঁড়াল। হতভম্ব হয়ে তাকাল। একবার লীলার দিকে আরেকবার সিদ্দিক সাহেবের দিকে। সিদ্দিক সাহেব এখন সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছেন। বাতাসের কারণে সিগারেট ধরানো যাচ্ছে না। দেয়াশলাই বারবার নিভে যাচ্ছে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আশেপাশে কী ঘটছে না-ঘটছে তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই।

মাসুদ মেঝেতে বসেছিল। লীলা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। লীলা হাত বাড়িয়ে বলল, আসো আমার সঙ্গে। মাসুদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। লীলা হাত ধরে তাকে নিয়ে বাগানের দিকে রওনা হলো। মাসুদ এখন কাঁদতে শুরু করেছে। শব্দ করেই কাঁদছে।

সিদ্দিক সাহেবের সিগারেট শেষ পর্যন্ত ধরেছে। তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন— এ আমার বড় মেয়ে। আমার বড় মেয়ের কথার উপরে আর কোনো কথা নাই। আজ থেকে তার কথাই খাঁবাড়ির শেষ কথা। তোমরা ভিড় করে থাকবে না। যাও, যে যার কাজে যাও।

অতি দ্রুত লোকজন সরে গেল। সিদ্দিকুর রহমান আবারো ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ করে বললেন— সুলেমান, আমার বড় মেয়েকে কেমন দেখলা ? বাপকা বেটি না ?

জি, বাপকা বেটি।

মাসুদরে আমি ন্যাংটা করে শাস্তি দিতাম না। এই শাস্তি দেয়া যায় না। তারপরেও এরকম একটা শাস্তির কথা কেন বললাম জানো ?

জি না।

আমার বড় মেয়ে কী করে সেটা দেখার জন্যে। যেরকম করবে ভেবেছিলাম সে-রকম করেছে। মাশাল্লাহ্! মেয়েটা হয়েছে অবিকল তার মা'র মতো। যেরকম চেহারা, সেরকম স্বভাবচরিত্র।

সিদ্দিকুর রহমানের চোখে দ্বিতীয়বার পানি এসেছে। তার বড় ভালো লাগছে।

সুলেমান!

জি ?

আবার জিজ্ঞেস করতেছি, ভেবেচিন্তে বলো। এই মেয়ে বাপকা বেটি না ?

জি, বাপকা বেটি।

একটা মজার কথা বলি শোনো— আমার দাদাজান একবার সন্ধ্যাকালে করলেন কী, লম্বা একটা বাঁশের মাথায় একটা হারিকেন ঝুলায়ে বাঁশটা বাড়ির উঠানে পুঁতে দিলেন। সবাই জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী ? দাদাজান বললেন, একটা ঘটনায় আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছে। এইজন্যে কাজটা করলাম। সবাই জানতে চাইল, ঘটনা কী ? দাদাজান বললেন— ঘটনা কী আমি বলব না। আমার মনের আনন্দটা সবাই দ্যাখ। আনন্দের পেছনে ঘটনা জানার দরকার নাই। দাদাজানের মতো আজ আমার মনেও আনন্দ হয়েছে। বাঁশের আগায় একটা হারিকেন আজকেও ঝুলাও।

সুলেমান বলল, জি আচ্ছা।

কেউ যদি জানতে চায় ঘটনা কী— কিছু বলব না। সব ঘটনা সবার জানার দরকার নাই। সব ঘটনা শুধু আল্লাহপাকই জানবেন। আর কেউ না।

জি আচ্ছা।

রাতে বড়খানার ব্যবস্থা করো। মাংস রান্নার জন্যে ফজলুরে খবর দিয়া আনো।

জি আচ্ছা। পশ্চিমের পুকুরে জাল ফেলব?

হুঁ, ফেলো। জাল টানার সময় আমার মেয়েরে নিয়া যাবে। সে দেখে মজা পেতে পারে।

জি আচ্ছা।

আজ দুপুরে আমি কিছু খাব না। উপবাসে যাব। রাতে বড় মেয়ের সাথে খানা খাব।

জি আচ্ছা। উনার থাকার ব্যবস্থা কোনখানে করব?

লীলা থাকবে পুরনো বাড়িতে। শহরবাড়িতে না। আমার ঘরের উত্তরের ঘরটা তারে দেও। ঘরের তালা খুলার ব্যবস্থা করো।

জি আচ্ছা।

রাত আটটা বাজে।

এশার নামাজ শেষ করে সিদ্দিকুর রহমান পুরনো বাড়ির বারান্দায় চাদর গায়ে বসে আছেন। তাঁর বসার জন্যে উঠানে পাটি পাতা হয়েছে। পাটির উপর সতরঞ্জি বিছানো। বাড়ির উঠানে মাংসের বিখ্যাত কারিগর ফজলু মিয়া মাটির বড় হাঁড়িতে খাসির মাংস বসিয়েছে। শুধুমাত্র পিয়াজের রসে মাংস দমে সিদ্ধ করা হচ্ছে। কাজটা জটিল। আগুনের আঁচ বেশি হতে পারবে না আবার কমও হতে পারবে না। হাঁড়ির মুখের ঢাকনা আটা দিয়ে আটকানো। ফজলুর দৃষ্টি আটার দিকে— ফুটো হয়ে বাষ্প বের হয়ে যাচ্ছে কি-না।

মাছ রান্না হচ্ছে ভেতর বাড়িতে। পশ্চিম পুকুর থেকে ছ'টা বড় মাছ ধরা হয়েছে। একটা কাতল, ওজন আঠারো সের। আরেকটা নানিদ মাছের ওজন সাত সের। এত বড় আকৃতির নানিদ মাছ সচরাচর পাওয়া যায় না। লীলার ভাগ্যে এত বড় নানিদ ধরা পড়েছে। এটা একটা সৌভাগ্যের লক্ষণ। কারো নাম করে পুকুরে জাল ফেললে কী মাছ ধরা পড়ে তা দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যায়। একবার ময়মনসিংহের ডিসি সাহেব এসেছিলেন, তাঁর নামে জাল ফেলার পর কয়েকটা গজার মাছ ছাড়া কিছু উঠে নি।

ভেতরবাড়ি থেকে লীলা বের হয়েছে। সে উঠানে নেমে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বাঁশবাগানের দিকে। বাঁশবাগানে লণ্ঠন ঝুলানো হয়েছে। সে

লণ্ঠন থেকে চোখ নামিয়ে তাকাল বাবার দিকে। সিদ্দিকুর রহমান জানতেন তাঁর মেয়ে এই কাজ করবে। চোখে যেন চোখ না পড়ে সে-জন্যেই তিনি আগে থেকেই অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। তবে মেয়ে কী করছে না করছে তা তিনি লক্ষ রাখছেন। মানুষ অন্যদিকে তাকিয়েও আশেপাশের কিছু দৃশ্য দেখতে পারে। লীলা ফজলু মিয়ার কাছে গেল। ফজলু মিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন আবার লীলা তাকাচ্ছে বাঁশবনের দিকে। লণ্ঠনের ব্যাপারটা মনে হয় মেয়ের মাথা থেকে যাচ্ছে না। মেয়ে এখন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। এখন মেয়ের দিকে তাকানো উচিত। লীলা বলল, বসি আপনার পাশে?

সিদ্দিকুর রহমান হাতের ইশারায় লীলার বসার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। এই মেয়ে কত সহজেই না তাঁর সঙ্গে কথা বলছে!

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তোমার থাকার ঘর পছন্দ হয়েছে?

লীলা কিছু বলল না। ঘর তার পছন্দ হয় নি। অন্ধকার ঘর, ছোট জানালা। বিশাল ঘরের প্রায় পুরোটা জুড়েই গাবদা এক খাট। শহরবাড়ি নামের বাংলোর ঘরগুলি অনেক সুন্দর। সেখানে থাকতে পারলে হতো। কিন্তু তাকে বলা হয়েছে এই ঘরে থাকতে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি যে ঘরে থাকবে সেই ঘরে তোমার মা থাকতেন।

লীলা বিস্মিত হয়ে বলল, সত্যি?

হ্যাঁ। তোমার মা চলে যাবার পর আমি এই ঘর তালাবন্ধ করে দেই। আজ তোমার জন্যে তালা খোলা হয়েছে।

এই গাবদা খাট মা'র পছন্দ ছিল?

হুঁ। এই খাটের একটা নাম আছে— ময়ূরখাট। আমার দাদা খান বাহাদুর হামিদুর রহমান সাহেব তাঁর স্ত্রীর জন্যে বানিয়েছিলেন। তবে তিনি এই খাট কখনো ব্যবহার করেন নাই।

কেন করেন নাই?

সেটা জানি না। মানুষ সব জানতে চায় কিন্তু জানতে পারে না। আমরা অল্পই জানি কিন্তু ভাব করি অনেক জানি।

লীলা বাবার কথায় সামান্য চমকালো। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি এখন নিজের কথা বলো। তোমার বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করছে।

কী জানতে চান?

পড়াশোনা কতদূর করেছ?

বিএ অনার্স পরীক্ষা দিয়েছি। সামনের মাসে রেজাল্ট হবে।

বলো কী! পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

ভালো হয়েছে।

পড়াশোনা কোথায় করেছ?

ঢাকায়। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি ইডেন কলেজ থেকে। তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি।

তুমি পড়াশোনায় কেমন?

ভালো। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে থার্ড হয়েছিলাম।

সিদ্দিক সাহেব তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে আনন্দের চেয়েও যেটা বেশি তার নাম বিস্ময়।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, হঠাৎ যে আমাকে দেখতে আসছ— এর পিছনে কি কোনো কারণ আছে?

কোনো কারণ নাই।

সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, সামান্য যে পশু সেও কারণ ছাড়া কিছু করে না। মানুষ তো কখনোই করে না। তবে সব কারণ মানুষ নিজে জানে না। অন্য একজন জানে।

অন্য একজনটা কে?

আল্লাহপাক। মা, তুমি কি নামাজ পড়ো?

মাঝে মাঝে পড়ি।

কোরআন মজিদ পড়তে পারো?

পারি।

তোমার নাম যে লীলাবতী রাখা হয়েছে, কেন রাখা হয়েছে সেই কারণ কি জানো?

জানি না, আমি শুধু জানি মা সবাইকে বলে রেখেছিল তাঁর যদি মেয়ে হয় তার নাম যেন লীলাবতী রাখা হয়।

ছেলে হলে কী নাম রাখা হবে বলে নাই?

না। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি— বাঁশগাছের মাথায় হারিকেন ঝুলছে কেন?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছে এটা জানানোর জন্যে বাঁশগাছের আগায় হারিকেন। আনন্দ পেলে মানুষ তার আনন্দের খবর

সবাইকে জানাতে চেষ্টা করে। মানুষ দুঃখ পেলে কিংবা কষ্ট পেলে তার খবর কিন্তু জানাতে চায় না। গোপন করে রাখে। মানুষ ছাড়া অন্যসব পশু-প্রাণীজগতের নিয়ম কিন্তু ভিন্ন। পশু বা পক্ষীজগতের নিয়ম হলো, দুঃখ-কষ্ট চিৎকার চেঁচামেচি করে সবাইকে জানাও। আনন্দের খবর গোপন রাখো।

লীলা হেসে ফেলল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, মা, তুমি হাসো কেন?

আপনার কথা শুনে হাসি।

আমার কথা শুনে কেন হাসলে?

লীলা বলল, কী জন্যে হেসেছি তার কারণ আমি জানি না। অন্য একজন হয়তো জানেন। কিন্তু তিনি তো কিছু বলেন না।

সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। লীলা তাকিয়ে আছে তার বাবার দিকে। কেউ চোখের পাতা ফেলছে না। মনে হয় একজন অন্যজনকে বোঝার চেষ্টা করছে।

বিডিবাংলা ডট কম

লীলাদের বাড়ি মঞ্জুর পছন্দ হয়েছে। এ বাড়িতে আজ তাঁর তৃতীয় দিবস। পছন্দের মাত্রা প্রতিদিনই বাড়ছে। লক্ষণ ভালো নয়। চক্রবৃদ্ধি হারে যদি পছন্দ বাড়তে থাকে তাহলে একসময় দেখা যাবে তিনি এখানেই স্থায়ী হয়েছেন। তিনি কোথাও স্থায়ী হতে চান না। শিকড় বসানো গাছের স্বভাব। তিনি গাছ না, মানুষ। মানুষের কোথাও শিকড় বসাতে নেই।

তবে এই বাড়ির প্রতিটি মানুষকে তাঁর মনে ধরেছে। সবচে' মনে ধরেছে লীলার দুই বোনকে। কইতরী এবং জইতরী। আদর করে এদেরকে এখন তিনি ডাকছেন 'কই' এবং 'জই'। কইতরী তাঁর সঙ্গে আছে ছায়ার মতো। জইতরী তাঁকে লক্ষ করে দূর থেকে। সে হয় দরজার আড়াল থেকে তাঁকে দেখবে কিংবা গাছের আড়াল থেকে দেখবে। কইতরীর মতো রূপবতী বালিকা তিনি তাঁর জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেন নি— এই ঘোষণা কয়েকবারই দেওয়া হয়েছে। কইতরীকে নিয়ে তিনি খানিকটা দুশ্চিন্তাও বোধ করেছেন। অতি বড় রূপসী ঘর পায় না— এই প্রবাদের কারণে। তাছাড়া মেয়েটির চুলও লাল। লাল চুলের মেয়েরা কোথাও স্থায়ী হতে পারে না। তাদের কলমিলতার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়।

'উঁচ কপালি চিড়ল দন্তী পিঙ্গল কেশ
ঘুরবে কন্যা নানান দেশ॥'

মঞ্জুর সেবার জন্যে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তাকেও তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। লোকটির নাম বদু। বয়স ত্রিশের মতো। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের ক্ষীণকায় একজন মানুষ। ছয় ফুটের মতো লম্বা। সে মনে হয় তার শারীরিক দৈর্ঘের কারণে লজ্জিত। তার চেষ্টা কুঁজো হয়ে, বাঁকা হয়ে লম্বা শরীর যতটা পারে কমিয়ে রাখা। বদুর দোষ হলো, সে সারাক্ষণ কথা বলে। আর তার গুণ হলো, সেইসব কথা শুনতে ভালো লাগে।

দুপুরবেলা বদু মঞ্জুর সারা শরীরে সরিষার ঝাঁঝানো তেল মাখিয়ে দলাই-মলাই করে। আরামে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে ঘুম পেয়ে যায়। তখন তাঁর মনে হয়, মানবজীবনের সার্থকতা এই দলাই-মলাইয়ে। সবচে' মজার কথাগুলি বদু এই সময় বলে।

বুঝছেন স্যার, আমার চাচাজি কিন্তুক হুঁ হুঁ হুঁ...।

হুঁ হুঁ হুঁ আবার কী ? পরিষ্কার করে বলো।

সবকিছু পরিষ্কার করে বলা যায় না স্যার। কিছু ভাবে বুঝতে হয়। ভাবে বুঝেন। নজর কইরা ভাব দেখেন।

কী ভাব দেখব ?

বাঁশের আগাত লণ্ঠন জ্বালাইছে, দেখেন নাই ? এখন বলেন দেখি ঘটনা!

বলতে পারছি না। কী ঘটনা ?

পাকা দালান থুইয়া টিনের ঘরে থাকে, বলেন দেখি কী ঘটনা ?

বলতে পারছি না কী ঘটনা ?

চাচাজির জিন-সাধনা আছে। এই হইল ঘটনা।

কী সাধনা ?

জিন-সাধনা। উনার দুই পালা জিন আছে। এরা দুই ভাই।

কী উল্টা-পাল্টা কথা বলো ?

শুনতে না চাইলে বলব না। জবান বন্ধ করলাম। তয় আমি ছিলাম তাঁর পাংখা বরদার। রাইতের পর রাইত আমি তাঁরে পাংখা দিয়া হাওয়া দিছি। তাঁর অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দেখা।

কী দেখেছ ?

সেটা তো বলব না।

কেন বলবে না ?

সব কিছু বলা ঠিক না। পাগলা হন্টন সাবের ভূত থাকে শহরবাড়িত। মাঝে মধ্যে সে গিয়া বড় স্যারের সাথে ইংরেজিতে গফসফ করে। সেই গফসফও আমি শুনেছি।

কী শুনেছ ?

সেটা তো আফনেরে বলব না। আমার অত শখ নাই। গোপন জিনিস আমি লাড়াচাড়া করি না।

বড় সাহেব সম্পর্কে যত কথাই তিনি শোনেন না কেন, মানুষটাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে। শুধু পছন্দ নয়, বেশ পছন্দ। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে, এমন বিনয় এবং ভদ্রতা তিনি খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছেন। শরীফ ঘরের মানুষদের মধ্যেই শুধু এই জিনিস দেখা যায়। লীলার বাবা যে অতি বড়ঘরের মানুষ এই বিষয়ে তিনি এখন একশ' ভাগ নিশ্চিত।

সিদ্দিকুর রহমান গতকাল দুপুরে মঞ্জুকে বলেছেন, আপনি আমার মেয়েটাকে কষ্ট করে নিয়ে এসেছেন। আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আমি আপনাকে সামান্য সম্মান করতে চাই।

মঞ্জু বিস্মিত গলায় বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। সম্মানের মধ্যেই তো আছি। নতুন করে আর কী সম্মান করবেন?

একটু বিশেষ সম্মান করতে চাই।

মঞ্জু অবাক হয়ে বলেছেন, আচ্ছা ঠিক আছে। করেন, কী করতে চান। আমি দেখতে চাই ব্যাপারটা কী? সম্মান পাওয়ার জন্যে নয়, ঘটনা কী জানার জন্যে।

মঞ্জু ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এখনো কিছু ঘটে নি। কবে ঘটবে বোঝা যাচ্ছে না। সিদ্দিকুর রহমান যে ব্যাপক কিছু করবেন এটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। যে-কোনো বড় কর্মকাণ্ডের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি লাগে। সমস্যা একটাই, লীলা হয়তো হুট করে বলে বসবে— একদিনের জন্যে বাবার দেশ দেখতে এসেছিলাম। দেখা হয়েছে। এখন চলো যাই। আমার শখ মিটে গেছে।

লীলাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব ব্যাপার। লীলা যদি বলে 'চলো যাই', তাঁকে যেতেই হবে। যে সব মেয়ের নাক খাড়া এবং যাদের চিবুক ঘামে তাদের নিয়ে এই সমস্যা। তাদের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। লীলার নাক খাড়া এবং তার চিবুক ঘামে। খুবই খারাপ লক্ষণ।

বড় সম্মান তাঁকে কী দেখানো হবে এটা নিয়ে তিনি একধরনের দুশ্চিন্তার মধ্যেই আছেন। কারো সঙ্গে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করবেন সেই সুযোগও হচ্ছে না। তিনি যে কামরায় থাকেন তার পাশের কামরাতেই আনিসুর রহমান বলে এক যুবক থাকে। জইতরী, কইতরী দুই বোনকে সন্ধ্যাবেলায় পড়ায়। জায়গির টাইপ ব্যাপার হবে। মঞ্জু কয়েকবারই তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্যে গিয়েছিলেন। সে প্রতিবারই মুখ শুকনো করে বলেছে, আমার শরীরটা ভালো না। পরে কথা বলি?

বিরাট অভদ্রতা। মঞ্জু তার অভদ্রতা ক্ষমা করেছেন। এই যুবক লীলাদের বাড়ির কেউ নয়। বাইরের মানুষ। বাইরের মানুষের অভদ্রতা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। ব্যাটা থাকুক তার মতো। তিনি থাকবেন তার মতো।

তিনি তাঁর মতোই আছেন।

তিনি শহরবাড়ি এবং মূল বাড়িতে এমনভাবে ঘুরছেন যেন এটা তাঁর নিজেরই বাড়িঘর। তাঁর চলাফেরা, আচার-আচরণে কোনোরকম দ্বিধা লক্ষ করা

যাচ্ছে না। মূল বাড়ির দক্ষিণের আমবাগানের একটা অংশ তিনি উপস্থিত থেকে পরিষ্কার করিয়েছেন। সেখানে চৌকি পাতা হয়েছে। ছায়াময় এই জায়গা তাঁর পছন্দ হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেছেন— দুপুরবেলায় এখানে তিনি ঘুমাবেন। জায়গাটার তিনি একটা নামও দিয়েছেন— ছায়াবীথি। তিনি ঠিক করেছেন কেউ নেত্রকোনা শহরে গেলে 'ছায়াবীথি' নামের একটা সাইনবোর্ড আনিয়ে বড় আমগাছটায় লাগিয়ে দেবেন।

তাঁর সবচে' পছন্দ হয়েছে বড় পুকুর। বাড়ির সামনে দুটো পুকুর। একটার নাম বড় পুকুর, আরেকটার নাম কাচা পুকুর। পুকুরভর্তি মাছ। সাধারণ ছিপ ফেলে বিঘত সাইজের কয়েকটা নলা ধরে তিনি উত্তেজিত। বড় মাছ ধরার জন্যে হুইল বড়শির ব্যবস্থা করতে বলেছেন। পিঁপড়ার ডিমের সন্ধানে বদু গেছে।

বদু আবার এইসব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী। তার কাছে শুনেছেন— সব পিঁপড়ার ডিম মাছ খায় না। হিন্দু পিঁপড়ার ডিম মাছে খায়।

পিঁপড়াদের মধ্যেও যে হিন্দু-মুসলমান আছে তিনি জানতেন না। বদু তাঁর অজ্ঞতায় বিস্মিত হয়ে বলেছে— পিঁপড়ার যে হিন্দু-মুসলমান আছে এইটা সবেই জানে। লাল পিঁপড়া হইল হিন্দু। আর কালা পিঁপড়া মুসলমান। মুসলমান পিঁপড়া কামড় দেয় না, হিন্দু পিঁপড়া দেয়।

মঞ্জু বড়ই বিস্মিত হয়েছেন। যতই দিন যাচ্ছে বদু নামের এই লম্বুটাকেও তাঁর ততই পছন্দ হচ্ছে। লম্বা মানুষের বুদ্ধি কম থাকে বলে তিনি শুনেছিলেন, এখন মনে হচ্ছে— এটা খুবই ভুল কথা।

বদুর কাছ থেকে অভদ্র শিরোমণি আনিসুর রহমান সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। বদি বলেছে— লোক খারাপ না, তয় মাথা সিক্সটি নাইন আছে।

বদুর মুখে ইংরেজি সিক্সটি নাইন শুনে তিনি মজা পেয়েছেন।

সিক্সটি নাইনটা কী বদু?

মাথাত গণ্ডগোল। বেশি বই পড়ার কারণে এইটা হইছে।

বেশি বই পড়ে না-কি?

দিন রাইত বই নিয়েই আছে।

কী বই পড়ে?

ইংরেজি মিংরেজি সব কিসিমই পড়ে। রাইত ঘুমায় না, লেখে।

কী লেখে?

জানি না কী লেখে। লেখে আর বারিন্দায় হাঁটে।

মঞ্জু লোকটির সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে কিছু আগ্রহ এখন অনুভব করছেন। যে লোক দিন-রাত বই পড়ে, রাত জেগে লেখে, তার অভদ্রতা ক্ষমা করা যায়।

তার যে আরেকটা নাম আছে এইটা জানেন ?

কী নাম ?

কুঁজা মাস্টার। কুঁজা হইয়া হাঁটে তো, এইজন্যে কুঁজা মাস্টার নাম। অনেকে আবার ডাকে গুঁজা মাস্টার।

কুঁজা মাস্টার নান্দাইল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কলেজের ইতিহাসের প্রভাষক আনিসুর রহমানের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ। মেজাজ বেশি খারাপ হলে তার কিছু শারীরিক সমস্যা হয়। জ্বর আসে, হাতের তালু জ্বালা করতে থাকে। একটা পর্যায়ে মাথা ঘুরতে থাকে।

তার জ্বর এসেছে, হাতের তালু জ্বালা করছে। মাথাঘোরা এখনো শুরু হয় নি। মনে হচ্ছে দুপুরের দিকে শুরু হবে। তার মেজাজ-খারাপের অনেকগুলি কারণ আছে। অনেক কারণের প্রধান কারণ হলো, গত চার মাসে কোনো বেতন হয় নি। কলেজের প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব আতাউল গনি সাহেবের কাছে গতকাল আনিস গিয়েছিল। ভদ্রলোক অমায়িক হাসি হেসে বলেছেন— এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? ইয়াংম্যান, লাইফের শুরুতে স্ট্রাগল করতে হবে না ? যারা বড় হয় সবাইকে স্ট্রাগল করতে হয়।

আনিস হতাশ গলায় বলল, এই মাসেও বেতন হবে না ? আতাউল গনি আবারো হাসতে হাসতে বললেন, এই মাসে একটা কিছু ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ করব। আপনার তো খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে না। বিরাট মানুষের বাড়িতে জায়গির থাকেন। শুনেছি ঐ বাড়িতে দশ পদের নিচে রান্না হলে বাবুর্চিকে কানে ধরে চক্কর দেওয়ানো হয়। সত্যি না-কি ?

রান্না অনেক পদ হয় এটা সত্যি, কানে ধরে চক্কর দেওয়ার বিষয় জানি না। আপনি কি আমাকে হাতখরচের কিছু দিতে পারেন ?

হাতখরচ পা-খরচ কোনো খরচই দেয়া যাবে না। কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরতে হবে। মিনিস্টার সাহেবের কলেজ। উনি আবার একটু বেকায়দায় পড়ে গেছেন বলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। খুবই সাময়িক সমস্যা। মিনিস্টার সাহেবকে জানানো হয়েছে। আপনি এত অস্থির কেন ? থাকা-খাওয়ার কোনো প্রবলেম তো আপনার হচ্ছে না ? প্রবলেম হলে বলেন। জায়গির চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় দিয়ে দেই।

থাকা-খাওয়ার কোনো সমস্যা আনিসের হচ্ছে না। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের পাকা দালানের দোতলার একটা ভালো ঘর তাকে দেয়া হয়েছে। ঘরের জানালাগুলি গ্রামের পাকা বাড়ির জানালার মতো খুপরি খুপরি না। বড় বড় জানালা। দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে হুহু করে বাতাস বয়। প্রচণ্ড গরমের সময়ও রাতে জানালা খুলে রাখলে রীতিমতো শীত লাগতে থাকে। খাওয়া-দাওয়ারও কোনোরকম অসুবিধা নেই। ঘরে এসে খাবার দিয়ে যায়। এত খাবার আনে যে পাঁচ-ছয়জন মানুষ খেতে পারে। কম করে খাবার দিতে অনেকবার বলা হয়েছে, কোনো লাভ হয় নি।

পরের বাড়িতে দিনের পর দিন থাকা-খাওয়ার যে অস্বস্তি আছে সেই অস্বস্তিও আনিস এখানে বোধ করে না। কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষক এই ধরনের ব্যবস্থায় থাকেন। গ্রামের দিকে এটা মোটামুটি চালু ব্যবস্থা। বিত্তবান মানুষরা কলেজের শিক্ষকদের বাড়িতে জায়গির রাখতে পছন্দ করেন। এতে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়ে।

থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে আনিসকে কিছুই করতে হয় না। সিদ্দিক সাহেবের মেয়ে দুটিকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণ বসতে হয়। দুই মেয়ের সামনে থাকে দুই হারিকেন। আনিসের বাঁ-হাতে থাকে চিকন তেল মাখানো বেত। (বেতে তেল মাখানোর কাজটা বদি খুব আগ্রহের সঙ্গে করে।) মেয়ে দুটি নিজের মনে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ে। আনিস তাকিয়ে থাকে। কিছুই বলে না। যেন তার কাজ বেত হাতে বসে থাকা। একসময় ভেতরবাড়ি থেকে তাদের খাওয়ার ডাক আসে। তারা আনিসের দিকে তাকিয়ে ভীত গলায় বলে, স্যার যাই ? আনিস উত্তর দেয় না। তারা কিছুক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে চলে যায়।

মাঝে মাঝে আনিসের মন খারাপ থাকে। তখন সে বলে, তের-এর ঘরের নামতা বলো। এই নামতা জইতরী কইতরী কারোরই মনে থাকে না। তারা একে অন্যের দিকে তাকায়। একসময় ভয়ে ভয়ে শুরু করে— তের এক্কে তের। তের দুগোনে ছাব্বিশ। তিন তেরং...

তিন তেরং কী ?

দুই বোন বলতে পারে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। আনিসের হাতের বেত ঝড়ের মতো নেমে আসে।

কলেজ থেকে ফেরার পর আনিসের কিছুই করার নেই। পত্রিকায় কর্মখালি দেখে দরখাস্ত তৈরি করা তার এখন প্রধান কাজ। সে বিচিত্র সব চাকরির জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। বন বিভাগের আমিনের পদেও দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে। কোনো হ্যাঁ-সূচক জবাব এখনো আসে নি, শুধু 'পাকিস্তান লাইটস' নামের একটা

কোম্পানি থেকে সাম্প্রতিক সময়ে তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি চেয়ে পাঠিয়েছে। নেত্রকোনা থেকে ছবি তুলে ছবি পাঠানো হয়েছে। আর তাদের কোনো খোঁজ নেই।

শেরে বাংলা কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব অবিশ্যি তাকে ডেকে বলেছেন— কর্মখালি দেখে অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই। সব পাতানো খেলা। কে চাকরি পাবে, কে পাবে না সব ঠিক করা থাকে। আই ওয়াশ হিসেবে কর্মখালি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার রেজাল্ট ভালো। অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট আর এমএ-তে সেকেন্ড ক্লাস থার্ড হওয়া খেলা কথা না। ভিতরে জিনিস থাকতে হয়। জিনিস মাথার মধ্যে নিয়ে বিনা-বেতনের কলেজে পচে মরবেন কেন? আমি শেরে বাংলাকে ধরে একটা ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ্ করে দেব। আমি হাজি মানুষ। মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছি না। ধৈর্য ধরুন। ধৈর্য। আসল জিনিস ধৈর্য। শেরে বাংলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমার বড়ভাই বিবাহ করেছেন চাখারে— সেইসূত্রে পরিচয়।

আনিস ধৈর্য ধরে আছে কারণ তার এখন অন্য কিছু ধরার নেই। সে বসে আছে পুকুরপাড়ে, নারিকেল গাছের ছায়ায়। সূর্য সরে যাওয়ায় ছায়াও সরে গেছে। আনিসের গায়ে রোদ চিড়বিড় করছে, তারপরেও সে সরে বসছে না। লাগুক রোদ। জ্বর তো গায়ে আছেই, সেই জ্বর আরো বাড়ুক। সবচে' ভালো হয় অচেতন হয়ে পড়ে থাকলে। জগতে কী ঘটছে বোঝার উপায় থাকবে না।

গত পরশু সে কলেজের শিক্ষক প্রণববাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল, কপর্দক মানে কী? আমরা যে বলি 'কপর্দকহীন অবস্থা'— তার অর্থটা কী? প্রণববাবু বললেন, কপর্দক হলো কড়ি। প্রাচীন আমলে মুদ্রার সর্বনিম্ন মান ছিল কড়ি। যার কাছে একটা কড়িও নাই সে-ই কপর্দকহীন।

গত এক মাস পাঁচদিন ধরে আনিস কপর্দকহীন। বাড়িতে চিঠি পাঠাতে দুই আনা লাগে, সেই দুই আনাও তার কাছে নেই। দোকান থেকে সিগারেট বাকিতে কেনা হচ্ছে। দোকানদার এখনো বাকিতে দিচ্ছে। আর কতদিন দেবে কে জানে! জ্বরটা ভালোমতো এলে ভালো হয়। সিগারেট খাবার ইচ্ছা মরে যায়।

খাম কেনার টাকার অভাবে দেশের বাড়িতে মা'কে চিঠি লেখা হচ্ছে না। মা চিন্তিত হয়ে চিঠির পর চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছেন— 'বাবা, তুমি পত্র দিতেছ না কেন? তোমার শরীর ভালো আছে তো? আমি অইত্যান্ত চিন্তিত। তুমি কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করিয়াছ?'

মা চিঠিপত্র বেশ গুছিয়ে লেখেন। শুধু কিছু-কিছু বানান লেখেন অন্যরকম করে। যেমন তিনি কখনো 'অত্যন্ত' লিখবেন না। লিখবেন 'অইত্যান্ত'।

আনিস কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখল। মনে হয় রোদে বসে থাকার কারণে জ্বর আরো বেড়েছে। খাম কেনার টাকা থাকলে মা'কে চিঠি লিখে জানানো যেত। সামান্য দু'চার টাকা যোগাড় করা সমস্যা না, কিন্তু সামান্য দু'চার টাকার জন্যে হাত পাতা সমস্যা।

মাকে চিঠিটা এখন লিখে রাখা যায়, তারপর যদি কলেজের বেতন হয় তাহলে খাম কিনে চিঠি পাঠানো হবে।

আনিস রোদে পুড়তে পুড়তে মাকে চিঠি লিখতে শুরু করল—

মা,

আমি অইত্যান্ত ভালো আছি। অইত্যান্ত সুখে আছি।

আমার গায়ের উপর সুখ ঝরে ঝরে পড়ছে।...

কদর্পক জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত মা'কে লেখা চিঠি আনিস পাঠাতে পারবে না, তবে মালেক ভাইকে লেখা পোস্টকার্ডটা পাঠাতে পারবে। পোস্টকার্ড কিনে চিঠি লেখা হয়েছে। জেলখানায় খামের চিঠি লেখা যায় না। পোস্ট কার্ডের চিঠি পাঠাতে হয়।

মালেক ভাই নিরাপত্তা আইনে বন্দি আছেন। প্রথমে ছিলেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে, এখন তাঁকে পাঠানো হয়েছে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। জেলারের কেয়ার অফে তাঁকে চিঠি দিলে চিঠি পৌছানোর কথা। চিঠি দেয়া যাচ্ছে না। কারণ পোস্টকার্ডটা স্থানীয় পোস্টাপিস থেকে পাঠানো ঠিক হবে না। আইবির লোকজন গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে চলে আসতে পারে। পোস্টকার্ডটা পোস্ট করতে হবে ময়মনসিংহ শহর থেকে। কে যাবে ময়মনসিংহ? যাওয়ার ভাড়া কোথায়?

মালেক ভাইয়ের চিঠিটা আনিস এমনভাবে লিখেছে যেন অতি ঘরোয়া চিঠি। 'কেমন আছেন, ভালো আছি' গোছের চিঠি। পুলিশ এই চিঠি পড়ে যেন কিছুই না বোঝে। যেন টের না পায় চিঠিটা লিখেছে মালেক ভাইয়ের দলেরই একজন। আনিস লিখেছে—

ভাইজান গো! আসসালাম। পর সমাচার আমি ভালো আছি। বাড়ির সকলেই ভালো আছে। ধলাগরুটির একটি বখনা বাছুর হইয়াছে। বাছুরটার রঙ কালো। কুড়িটা ডিম দিয়া রাজহাঁস বসাইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় মাত্র তিনটা ডিম ফুটিয়াছে। বাকি সবই নষ্ট।

আমি ভালো আছি। লেখাপড়া নিয়া আছি। সামনেই পরীক্ষা। পাশ করিব কি-না ইহা আল্লাহপাকই জানেন।

আপনি আমাকে প্রচুর পড়িতে বলিয়াছেন, আমি সেইমতো পড়াশোনার চেষ্টা নিয়েছি। অজপাড়াগাঁয়ে থাকি, বইপত্র জোগাড় হয় না। শুনিলে আশ্চর্য হইবেন, সামান্য একটা ডিকশনারিও পাওয়া দুষ্কর।

আপনি ভালো থাকিবেন। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিবেন। আপনাকে সালাম। মাননীয় জেলার সাহেবকেও সালাম।

ইতি—

আপনার অতি আদরের

আনিস

মাগরেবের নামাজ শেষ করে সিদ্দিকুর রহমান বাড়ির উঠোনে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর সামনে বড় একটা জলচৌকি। তিনি জলচৌকিতে পা রেখেছেন। কিছুক্ষণ আগে তিনি একটা দুঃসংবাদ পেয়েছেন। বড় ছেলে মাসুদ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। নান্দাইল রেলস্টেশনে তাকে ট্রেনে উঠতে দেখা গেছে। তার গায়ে ছিল হলুদ রঙের শার্ট। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে কোথায় যায়। উত্তরে সে বলেছে— আসামে যাই।

সিদ্দিকুর রহমান তেমন চিন্তিত বোধ করছেন না। ছেলে পালিয়ে গেছে— এটা তেমন কোনো দুঃসংবাদ না। তিনি চিন্তিত বোধ করেছেন দ্বিতীয় দুঃসংবাদটার জন্যে। দ্বিতীয় দুঃসংবাদ তিনি এখনো পান নি— তবে পাবেন। দুঃসংবাদ কখনো একা আসে না, সে সঙ্গে করে তার বড়ভাইকে নিয়ে আসে। প্রথম আসে ছোটভাই— ছোট দুঃসংবাদ। তারপর আসে বড়ভাই— বড় দুঃসংবাদ।

বড় দুঃসংবাদটা কী হতে পারে ? কারো মৃত্যু-সংবাদ ? সিদ্দিকুর রহমান সিগারেট ধরালেন। চাপা গলায় ডাকলেন, লোকমান!

ইজিচেয়ারের পেছন থেকে লোকমান জবাব দিল, জি। সে ইজিচেয়ারের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। তাকে দেখা যাচ্ছিল না। বাইরের কেউ উঠোনে পা দিলে তার কাছে মনে হবে, বিরাট উঠোনের মাঝখানে সিদ্দিকুর রহমান একা বসে আছেন।

লোকমান, আমার মেয়ে কই ?

শহরবাড়িত গেছেন। ডাক দিয়া আনব ?

না। মাসুদ যে পালায়ে গেছে কাউরে কিছু বলে গেছে ?

জি বলেছে। মাস্টার সাবরে বলে গেছে।

সে যে পালায়ে যাবে মাস্টার সাব জানত ?

জি।

মাস্টার সাব জানার পরেও আমাকে জানায় নাই কেন ?

লোকমান জবাব দিল না। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, যাও মাস্টারকে খবর দিয়া আনো। তাকে বলবা তার সঙ্গে চা খাব এইজন্যে ডেকেছি। কোনোরকম বেয়াদবি করবা না।

জি আচ্ছা।

সিদ্দিকুর রহমানের হাতের সিগারেট নিভে গেছে। তিনি নেভা সিগারেটই টান দিচ্ছেন। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। চারদিকের জঙ্গল আলো হতে শুরু করেছে। যদি পূর্ণিমা হয় তাহলে প্রবল জোছনা হবে। আজ কুয়াশা নেই। মেঘশূন্য আকাশে পূর্ণিমা দেখার মতো জিনিস। তিনি বেলিফুলের গন্ধও পাচ্ছেন। বাগানে বেলিফুলের গাছে নিশ্চয়ই অসংখ্য ফুল ফুটেছে। পূর্ণিমায় সব বেলিগাছে ফুল ফোটে। যেসব বেলিগাছ পূর্ণিমাতেও ফুল ফোটাতে পারে না তারা বন্ধ্যা গাছ। এইসব গাছ তুলে ফেলতে হয়। সিদ্দিকুর রহমানের ইচ্ছা করছে মেয়েকে নিয়ে বেলিফুলের বাগানে যেতে। যেসব গাছে ফুল ফোটে নি সেসব গাছ টেনে তুলে ফেলতে। তবে আগে নিশ্চিত হতে হবে আজ পূর্ণিমা কি না। মাস্টার বলতে পারবে। চাঁদ-তারার হিসাব তার কাছে খুব ভালো আছে। সমস্যা হচ্ছে, এই সময়ে বেলিফুল ফুটে না। বেলি বর্ষার ফুল। তাহলে গন্ধটা আসছে কোত্থেকে ? মনের ভুল ?

আনিসকে দেখে সিদ্দিক সাহেব চমকে উঠলেন। চোখ টকটকে লাল। ফরসা গালও লালচে হয়ে আছে। হাঁটার ভঙ্গিও অন্যরকম। মাতালের মতো হেলেদুলে হাঁটা। হাঁটার মধ্যে তাকানোর মধ্যে কেমন যেন ডোন্ট কেয়ার ভাব। এমনিতে সে মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে কুঁজা হয়ে হাঁটে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তার আলাদা নাম আছে— 'কুঁজা মাস্টার'।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আনিস, কেমন আছো ?

আনিস বলল, আমি অইত্যান্ত ভালো আছি। আপনি চা খেতে ডেকেছেন, চা খাব না। আমার ধারণা আপনি চা খেতেও ডাকেন নি। চা খাওয়াটা অজুহাত। আপনি আমাকে কিছু বলার জন্য ডেকেছেন।

সিদ্দিকুর রহমান বিস্মিত হলেন। মাস্টার এরকম ভঙ্গিতে কথা বলছে কেন ? তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসতে বসতে

বিডিবাংলা ডট কম

বললেন, কিছু বলার জন্য ডাকি নাই। একটা বিষয় জানার জন্যে ডেকেছি। আজ কি পূর্ণিমা?

জি, পূর্ণিমা। আশ্বিনা পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমায় ভূত দেখা যায় আর আষাঢ়ি পূর্ণিমায় সাধু মানুষ দেখা যায়। আষাঢ়ি পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেছিলেন।

গৃহত্যাগ কেন করেছিলেন?

সংসার থেকে সেই রাতেই তাঁর মন উঠে গিয়েছিল। মানুষ যখন হঠাৎ অসম্ভব সুন্দর কোনো জিনিস দেখে তখন বিচিত্র কারণে সবকিছু থেকে তার মন উঠে যায়।

আমি তো আমার দীর্ঘ জীবনে অনেক সুন্দর জিনিস দেখেছি। আমার তো মন উঠে নাই।

হয়তো উঠেছে, আপনি বুঝতে পারেন নাই। মানুষ অন্য মানুষের মন কিছু-কিছু বুঝতে পারে, নিজের মন কিছুই বুঝতে পারে না।

তুমি কথা তো খুব গুছিয়ে বলো।

জি, আমি কথা গুছিয়ে বলতে পারি। এটা কোনো বড় ব্যাপার না। যে লোক ট্রেনে স্বপ্নে পাওয়া বড়ি বিক্রি করে সেও খুব গুছিয়ে কথা বলে।

বড় ব্যাপার কোনটা?

বড় ব্যাপার হলো যে কথা বলছে সে জানে কি-না কী বলা হচ্ছে।

তুমি জানো?

জি আমি জানি।

খুবই ভালো কথা। এখন আমাকে আরেকটা জিনিস বলো, আমার ছেলে যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে এটা তুমি জানতে। জানার পরেও আমাকে বিষয়টা জানাও নি। আমাকে জানালে আমি আমার ছেলেকে আটকাতে পারতাম। জানাও নি কেন?

আনিস বলল, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার বুদ্ধি আমি তাকে দিয়েছিলাম। আমি বুদ্ধি দিয়েছি আবার আমি সেটা আপনাকে বলে দেব— তা তো ঠিক না। সাপ হয়ে দংশন করব, ওঝা হয়ে ঝাড়ব— তা তো হয় না।

সিদ্দিকুর রহমান অবাক হয়ে বললেন, পালিয়ে যাবার বুদ্ধি তুমি দিয়েছ?

জি।

কেন?

WWW.BDBANGLA.COM

আপনি তার জন্যে খুবই লজ্জাজনক শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। অপমানটা সে নিতে পারছিল না। আমাকে বলল ইঁদুর-মারা বিষ খাবে। আমার কাছে মনে হলো, বিষ খাওয়ার ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করার জন্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার বুদ্ধি দেয়াই ভালো।

যে বলে ইঁদুর-মারা বিষ খাবে সে কোনোদিন খায় না। বলে কয়ে বিষ খাওয়া হয় না।

কেউ-কেউ আবার বলে-কয়ে খায়। একেকজন মানুষ একেক রকম। ভরা-পূর্ণিমায় কেউ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যায়, আবার কেউ দরজা বন্ধ করে ঘুমায়।

মাসুদকে তুমি কবে ফিরে আসতে বলেছ?

আমি কিছু বলি নাই। তবে সে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। সে গৃহী ধরনের ছেলে। বাড়ি ছেড়ে বেশি দিন বাইরে থাকতে পারবে না।

তুমি কি কোনো ফুলের গন্ধ পাচ্ছ?

জি-না। আমার নাক বন্ধ।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ?

আনিস বলল, সামান্য খারাপ। মনে হয় জ্বর এসেছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, যাও শুয়ে থাকো।

আনিস চলে যাচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান ভুরু কুঁচকে আনিসের দিকে তাকিয়ে আছেন। আনিস কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেলেদুলে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে পায়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে সে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে। লোকমান বলল, হুক্কা আইন্যা দেই? সিদ্দিকুর রহমান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন, যদিও তাঁর তামাক খেতে ইচ্ছা করছে না। নির্জন উঠানে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না, আবার উঠে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

জোছনা প্রবল হয়েছে। বাড়ির পেছনের কামরাঙা গাছের ছায়া তাঁর গায়ে পড়েছে। কামরাঙা গাছের চিড়ল-বিড়ল পাতার ছায়া জোছনায় সুন্দরভাবে এসেছে। বাতাসে গাছ কাঁপছে, ছায়াও কাঁপছে। সিদ্দিকুর রহমান নিজের গায়ের ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৃশ্যটা তাঁর কাছে সুন্দর লাগছে, তবে মাস্টারের কথামতো এই সুন্দর দৃশ্য দেখে তাঁর মনে কোনো ভাব তৈরি হচ্ছে না।

লোকমান!

জি?

মাসুদ এক-দুই দিনের মধ্যে ফিরে আসবে। যেদিন ফিরে আসবে সেদিনই কানে ধরে তাকে ট্রেনে তুলে দিবে। আমার হুকুমের অপেক্ষা করবে না।

জি আচ্ছা।

লোকমান হুক্কার নল তাঁর হাতে তুলে দিল। তিনি নল টানছেন। ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ হচ্ছে। শব্দ শুনতে তাঁর ভালো লাগছে।

'কন্যার বাপ হুক্কা খায়
বুনকা বুনকা ধোঁয়া যায়।'

সুন্দর সিমাসা। কে তাকে বলেছিল ? রমিলা বলেছিল। একদিন তিনি বারান্দায় বসে হুক্কা টানছেন, হঠাৎ রমিলা ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল— 'কন্যার বাপে হুক্কা খায়, বুনকা বুনকা ধোঁয়া যায়।' কী কারণে জানি রমিলার সিমাসা তাঁর খুবই ভালো লাগল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রমিলাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন— ঘরের ভেতর থেকে কী বলা আরেকবার বলো। রমিলা ভয়ে অস্থির হয়ে বলল, আমার ভুল হইছে মাপ কইরা দেন। সিদ্দিক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ভুলের কী হইছে ? সুন্দর সিমাসা বলেছ, আমার পছন্দ হয়েছে। রমিলা তার পরেও বলল, আর কোনোদিন বলব না। আমারে ক্ষমা দেন। তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে যাও, ক্ষমা দিলাম।

অতি সুন্দর এই সিমাসাটা লীলাকে বললে কেমন হয় ? হুক্কায় টান দিয়ে বুনকা বুনকা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলবেন। লীলা নিশ্চয় মজা পাবে। মেয়েটা নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কী ভাবছে কে জানে! তাকে পাশে বসিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলে বোঝা যেত সে কী ভাবছে। কিন্তু তাকে ডেকে এনে আয়োজন করে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। যদি তার আসতে ইচ্ছা করে সে আসবে নিজের মতো। সে কবে চলে যাবে ? যেরকম হুট করে এসেছিল— সেরকম হুট করেই কি চলে যাবে ? যদি সে একবার ঠিক করে চলে যাবে তাহলে তাকে আটকানো যাবে না। তার মা'কেও আটকানো যায় নি। এই মেয়েটা পুরোপুরি তার মা'র স্বভাব পেয়েছে। মাতৃ-স্বভাবের মেয়ে জীবনে সুখী হয় না। পিতৃ-স্বভাবের মেয়ে সুখী হয়। এই নিয়েও একটা সিমাসা আছে। সিমাসাটা যেন কী ? সিদ্দিকুর রহমান ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে হুক্কা টানছেন, চোখ বন্ধ করে সিমাসা ভাবার চেষ্টা করছেন। কিছুটা মাথায় আসছে, কিছুটা আসছে না—

মা-স্বভাবী দেখন হাসি
কন্যা থাকেন ভঙ্গে
বাপ-স্বভাবী সুখ-কপালি
কন্যা থাকেন রঙ্গে।

এই তো মনে পড়েছে। কন্যা থাকেন রঙ্গে। রঙ্গে থাকা অনেক বড় ব্যাপার। তিনি মনে-প্রাণে চাচ্ছেন তাঁর কন্যা থাকবে রঙ্গে।

লীলা তার সৎমার খাওয়া দেখছে। রমিলা খুব গুছিয়ে ভাত খাচ্ছেন। পাটিতে বসেছেন— সামনে জলচৌকি, সেখানে ভাত-তরকারি। ঘোমটা দিয়ে বসেছেন। অসুস্থ মানুষের হুসহাস খাওয়া না, ফেলে ছড়িয়ে একাকার করাও না। যেন তিনি এ-বাড়ির নতুন বউ। নতুন বউ বলেই ঘোমটা টেনে লাজুক-লাজুক ভঙ্গিতে খেতে হচ্ছে।

রমিলার ঘরে আলো নেই। ঘরের বাইরে জানালার পাশে হারিকেন রাখা হয়েছে। তার আলো ভেতরে পড়েছে। সেই আলো কাঁটা বেছে ছোটমাছ খাবার জন্যে যথেষ্ট না। অসুস্থ মহিলার ভাত খাওয়া দেখে লীলার রাগ লাগছে। কষ্টও লাগছে। সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য এই মহিলার একজন কাউকে দরকার। সেরকম কেউ নেই। লীলার বাবা সুস্থ-সবল একজন মানুষ। তার পেছনে ছায়ার মতো দু'জন লোক আছে। যেন একজন মানুষের দুটা ছায়া। অথচ অসহায় এই মহিলাকে দেখার কেউ নেই। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরাও একবার এসে খোঁজ নেয় না। খুশির মা বলে একজন মহিলা প্রতিদিন একবার আসেন। মনে হচ্ছে এই মহিলার উপরই দায়িত্ব। খুশির মা খুবই কাজের মেয়ে, তার পরেও সে তো এ-বাড়িতে থাকে না। লীলা লক্ষ করেছে, তার সৎমায়ের খাবারের সময়েরও কোনো ঠিক নেই। আজ তিনি সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসেছেন। গতকাল দুপুরে তিনি কিছুই খান নি। এই ব্যাপারটা নিয়ে লীলা খুশির মা'র সঙ্গে কথা বলেছে। খুশির মা বলেছে— আম্মাজিগো, উনি যখন ভাত খাইতে চাইবেন তখন ভাত দিলে খাইবেন। না চাইলে ভাত দিলে উনি খুবই রাগ করেন।

লীলা বলল, খুবই রাগ করেন মানে কী ? রাগ করলে কী করেন— ভাতের থালা-বাটি উল্টে ফেলেন ?

সেইটা করলে তো ভালোই ছিল আম্মাজি। বেশি রাগলে পরনের কাপড় খুইল্যা দাঁত দিয়া ছিঁড়েন। বড়ই লইজ্জার বিষয়। এইজন্যেই তো উনার দেখভালের জন্যে বাইরের লোক রাখা হয় না। উনার নিজের ছেলেমেয়েরা উনারে দেখতে আসে না। লইজ্জা পায়।

কথাগুলি লীলার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো না। সব যুক্তি মন গ্রহণ করে না। এই যুক্তিও করছে না।

লীলাকে চমকে দিয়ে রমিলা হঠাৎ ক্ষীণ স্বরে বললেন, মাগো, কী দ্যাখো ?

লীলা বলল, আপনার খাওয়া দেখি।

রমিলা চাপা হাসি-মাখানো গলায় বললেন, খাওয়ার মধ্যে কী আছে গো মা ? খাওয়া তো রঙ্গিলা নাইচ না যে দেইখ্যা মজা পাইবা!

লীলা বলল, খাওয়া রঙ্গিলা নাচ না হলেও খাওয়া দেখার মধ্যে আনন্দ আছে। আপনার ছেলেমেয়েরা যখন খেতে বসত তখন আপনি পাশে বসে তাদের খাওয়া দেখতেন না ? দেখে আনন্দ পেতেন না ?

তুমি তো দূর থাইক্যা দেখতেছ। কাছে বইসা খাওয়া দ্যাখো।

আসছি। বাবার কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে আসছি।

চাবি চাইলে তোমার বাবা চাবি দিব না। এক কাজ করো, তোমার বাপের ঘরে যাও। সেই ঘরে কাঠের দুইটা বড় আলমারি আছে। কালা রঙের আলমারির তিন নম্বর ড্রয়ারে চাবি আছে।

আপনি জানেন কীভাবে ?

আমি অনেক কিছু জানি। কেউ আমারে কিছু না বললেও আমি জানি। মাসুদ চইল্যা গেছে— কেউ আমারে কিছু বলে নাই কিন্তু আমি জানি।

কেউ আপনাকে কিছু না বললেও তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে, সেখান থেকে আপনি শুনেছেন।

এইটা ঠিক বলছ মা। আমার কান খুবই পরিষ্কার। যাও চাবি দিয়া দরজা খুইল্যা আমার সাথে বসো। আমি খাওয়া বন করলাম। তুমি সামনে বসলে খাওয়া শুরু করব।

লীলা চাবি আনতে বাবার ঘরে ঢুকল। চাবি যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে। সে চাবি হাতে নিয়ে ঘুরল আর তখন সিদ্দিকুর রহমান বললেন, চাবি নিয়া কই যাও ? ঘটনাটা হঠাৎ ঘটায় চট করে লীলার মাথায় কোনো জবাব এলো না। সে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তালা খুলে তুমি তোমার সৎমারে আজাদ করতে চাও ?

তা না। উনি ভাত খাচ্ছেন, আমি সামনে বসে থাকব।

সামনে বসে থাকার দরকার নাই।

আমি উনাকে কথা দিয়ে এসেছি সামনে বসে খাওয়াব। উনি খাওয়া বন্ধ করে বসে আছেন।

যখন-তখন যে-কোনো মানুষরে কথা দিবা না। কথা অনেক দামি জিনিস।

লীলা শান্ত গলায় বলল, কথা দামি জিনিস বলেই তো আমি আমার কথা রাখব।

না।

একজন অসুস্থ মানুষকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। উনি আমার কথা বিশ্বাস করে খাওয়া বন্ধ করে বসে আছেন। আমি যদি এখন তাঁর কাছে না যাই তাহলে উনি খাবেন না।

না খেলে না খাবে। পাগল-মানুষ এক-দুই বেলা না খেলে কিছু হয় না।

আপনি এমন একটা ছোট কথা কী করে বললেন ?

সিদ্দিকুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে একটা ঘটনা শোনো— মরিয়ম নামের একটা মেয়েকে রেখেছিলাম যে তোমার সৎমায়ের দেখভাল করবে। ভাটি অঞ্চলের গরিব ঘরের মেয়ে। রমিলা একদিন কী করল শোনো— মরিয়মরে ভুলিয়ে-ভালায়ে দরজা খুলাল। তারপর হুট করে ঘর থেকে বের হয়ে বঁটি দিয়ে তারে কোপ দিল। আমি মরিয়মকে প্রথমে নেত্রকোনা, তারপর ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানেই সে মারা যায়। মামলা-মোকদ্দমা যেন না হয় সেজন্যে আমাকে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়েছে। মরিয়ম গরিব ঘরের মেয়ে বলে অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমি এত সাবধান। আমার কথা শোনো— যেখানে চাবি ছিল সেখানে রাখো।

লীলা বলল, উনি আমাকে কিছু করবেন না। উনি আমাকে পছন্দ করেন।

সিদ্দিকুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, মরিয়মকেও রমিলা খুব পছন্দ করত। তাকে রমিলা ডাকত— 'ময়না সোনা'। এই নিয়া তোমার সাথে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। দাও, ঘরের চাবি আমার হাতে দাও।

লীলা বাবার হাতে চাবি দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আমি আপনার এখানে দুদিন থাকব ভেবে এসেছিলাম, চারদিন থেকেছি। কাল সকালে চলে যাব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তোমাকে যদি চাবি দিয়ে দেই তাহলে কি আরো কয়েকদিন থাকবে ?

না।

আচ্ছা ঠিক আছে। কাল যেতে চাও, কাল যাবে।

আমি যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, মঞ্জুমামা, তিনি বাড়ি ফেরার জন্যে অস্থির হয়েছেন। আর আমার নিজেরও এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।

কাল সকালেই তুমি যাবে ?

জি।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। নিজের খুশি আমি প্রকাশ করতে পারি না। রাগ প্রকাশ করতে পারি। পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের মানুষ রাগ প্রকাশ করতে পারে, খুশি প্রকাশ করতে পারে না। আরেক ধরনের মানুষ খুশি প্রকাশ করতে পারে, রাগ প্রকাশ করতে পারে না।

লীলা বিস্মিত হয়ে বলল, এই কথাগুলি কি আপনি নিজে চিন্তা করে বললেন ?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, না, আমি এত সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারি না। এইগুলি মাস্টারের কথা। মাস্টারের সঙ্গে তোমার দেখা হয় নাই ?

না, দেখা হয় নি। উনার কথা শুনেছি। সবাই উনাকে 'কুঁজা মাস্টার' ডাকে।

হুঁ।

শুনেছি আপনি তাকে খুব পছন্দ করেন ?

হুঁ, করি।

কেন ?

জানি না। মানুষের পছন্দ-অপছন্দ হিসাব মেনে হয় না। পছন্দ-অপছন্দের কোনো ব্যায়াকরণ নাই।

এটাও কি কুঁজা মাস্টারের কথা ?

এটা আমার কথা। মা শোনো, যাও চাবি নিয়ে রমিলার ঘরে যাও। তার সামনে বসে তাকে খাওয়াও। আমি সোলেমানকে বলে দিচ্ছি, সে আশেপাশে থাকবে। তেমন কিছু ঘটলে সামলাবে।

লীলা তাকিয়ে আছে। সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের দিকে তাকিয়ে অভয়দানের ভঙ্গিতে হাসলেন।

লীলা তার সৎমায়ের সামনে বসে আছে। তার মনে ক্ষীণ অস্বস্তি। অস্বস্তির কারণ, তার কেন জানি মনে হচ্ছে— এই অসুস্থ মহিলা হঠাৎ এক নলা ভাত তার মুখের সামনে ধরে আদুরে গলায় বলবেন, মা খাওগো। লীলা এই মহিলার হাতের নলা কখনো মুখে নিতে পারবে না। অসুস্থ মানুষকে সে কিছু বুঝিয়েও বলতে পারবে না। অসুস্থ মানুষ যুক্তি মানে না। তারা একবার অপমানিত বোধ করলে সেই অপমানবোধ মনের গভীরে ঢুকে যায়। তাদের এলোমেলো জগৎ হঠাৎ করে আরো এলোমেলো হয়। তার ফল শুভ হয় না।

তোমার নামটা বড় সুন্দর, লীলা। নামটা কে রাখছে গো ?

মা রেখেছেন।

তোমারে খুব আদর করত ?

সব মা-ই তো ছেলেমেয়েদের আদর করে। এমন মা কি আছে যে ছেলেমেয়েদের অনাদর করে ?

আমি করি। আমি যেমন করি তারাও করে। এই যে আমার ছেলেটা বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালায়ে গেল, আমারে মুখের দেখাও দেখল না।

লীলা কী বলবে ভেবে পেল না। অসুস্থ রমিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তুমি কবে যাইবা গো মা ?

আমি কাল সকালে যাব।

রমিলা এই কথা শুনে হেসে ফেললেন। মুখে ভাতের নলা তুলতে যাচ্ছিলেন, সেই নলা নামিয়ে রেখে হেসে কুটি-কুটি হলেন। লীলা বলল, হাসেন কেন ?

তোমার কথা শুইন্যা হাসি।

আমার কথাটা কি খুব হাসির ?

হুঁ হাসির। তুমি কোনোদিন যাইবা না। এইখানেই থাকবা।

ভবিষ্যদ্বাণী করছেন ?

যেটা ঘটব সেইটা বললাম। মিলাইয়া দেইখো।

আচ্ছা মিলিয়ে দেখব।

খাওয়া শেষ হইছে গো মা, এখন হাত ধুব।

আসুন আপনার হাত ধুইয়ে দিই।

রমিলা লীলার এই কথায় আবারো হেসে কুটি-কুটি হলেন। এইবার আর লীলা জিজ্ঞেস করল না, কেন হাসেন। রমিলা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললেন, আমার খুব ইচ্ছা ছিল তোমার মুখে একটা ভাতের নলা তুইল্যা দেই। তুমি ঘিন্না পাইবা বইলা দিলাম না। তোমারে দেইখা মনে হয় তোমার ঘিন্না বেশি।

লীলা তাকিয়ে আছে। রমিলা খুব হাসছেন।

আনিসের জ্বর খুব বেড়েছে। সে প্রলাপ বকা শুরু করেছে। সে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। কী বলছে সে নিজে জানে না। একটা ব্যাপার তার খুব ভালো লাগছে— সে যা বলতে চাচ্ছে বলতে পারছে। কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ে চিন্তিত মুখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যাপারটাও তার খুব ভালো লাগছে। মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে নেই, তার সঙ্গে আরো অনেকে আছে। সিদ্দিক সাহেবও আছেন। কিন্তু অন্য কাউকেই আনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছে। আনিস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ভাববেন না যে আমি আপনাকে চিনি না। আপনাকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি। আপনি সিদ্দিক সাহেবের বড় মেয়ে লীলাবতী। আপনার নাম উল্টো করলে কী হয় জানেন— তীবলালী। আমার নাম উল্টো করলে মেয়েদের নাম হয়ে যায় সনিআ। আমার মা আপনাকে দেখলে কী বলত জানেন ? আপনাকে দেখলে বলত, 'অইত্যান্ত সুন্দরী কন্যা'। আমার মা অত্যন্ত বলতে পারে না। মাঝখানে একটা ই লাগিয়ে অইত্যান্ত।

লীলাবতী নামের মেয়েটা আনিসকে কী যেন বলল। আনিস তার কথা শুনতে পেল না। সে এখন কারো কথাই শুনতে পাচ্ছে না, শুধু নিজের কথাগুলি পরিষ্কার শুনছে।

বিডিবাংলা ডট কম

প্রায় আধঘণ্টার উপর ট্রেন থেমে আছে।

কেন থেমে আছে কেউ বলতে পারছে না। কতক্ষণ থেমে থাকবে তাও কেউ বলতে পারছে না। ব্যাপারটা নিয়ে কাউকে চিন্তিত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সবাই খুশি। জানালার পাশে একটা সিট নিয়ে লীলা বসেছে। বেঞ্চের সর্বশেষ সিট বলে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। লীলার পাশেই মঞ্জু। তার হাতে ফ্লাস্কভর্তি গরম পানি। চা বানানোর সরঞ্জাম। ভদ্রলোকের প্রধান শখ চলন্ত ট্রেন বা বাসে নিজের হাতে বানিয়ে চা খাওয়া। মঞ্জুর মেজাজ খারাপ। তাঁর আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। জায়গাটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার আগেই চলে যেতে হচ্ছে এটা কেমন কথা ? চলে আসার সময় কইতরী এমন কান্না শুরু করল যে তাঁর নিজের চোখেও পানি এসে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় ঘোষণা দিলেন— মা, কাঁদিস না। আমি লীলাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসব। তারপর যতদিন ইচ্ছা নিজের মতো থাকব। ভদ্রলোকের এককথা। আমি ভদ্রলোক।

লীলাদের উল্টোদিকের বেঞ্চে কাত হয়ে আনিসুর রহমান শুয়ে আছে। এই গরমেও তার গায়ে মোটা চাদর। শীত লাগছে— এই কথাটা সে কাউকে বলতেও পারছে না। আশেপাশে কেউ থাকলে সুটকেস খুলিয়ে সুটকেস থেকে সে আরেকটা চাদর বার করত। পায়ের তালুতে শীত বেশি লাগছে। একজোড়া মোজা পরলেও হতো। সে চোখ খোলা রাখতে পারছে না। চোখে রোদ লাগছে।

আনিসুর রহমান কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে যাচ্ছে মায়ের কাছে। ডাক্তার দেখিয়ে প্রথমে শরীর সারাবে। পরেরটা পরে দেখা যাবে। তার যাত্রাসঙ্গী হয়েছে বড় সাহেবের মেয়ে লীলা। এটা অস্বস্তিকর। পরিচিত কেউ না থাকলে ভালো হতো। পরিচিত কেউ থাকা মানেই কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা। অসুস্থ অবস্থায় কোনো কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা করে না। কথা শুনতেও ভালো লাগে না। তবে লীলা মেয়েটা ভালো। তার মধ্যে লোক দেখানো ব্যাপারটা নেই। 'শরীর কেমন ?' 'খারাপ লাগছে ?'— এই জাতীয় কোনো কথাই সে বলছে না। জানালা দিয়ে মুখ বের করে সে আছে নিজের মতো। মঞ্জু আনিসের কাছে এসে বলল, আমার কাছে বালিশ আছে, নিজের বালিশ বিছানার চাদর ছাড়া আমি বের হই না। আপনাকে দেব ?

আনিস বলল, না।

লাগলে বলবেন, লজ্জা করবেন না। আমার হলো 'উঠল বাই তো কটক যাই' সিস্টেম। ব্যাগ গোছানোই থাকে। ব্যাগে লুঙ্গি, মশারি, দড়ি, টর্চলাইট, হাতুড়ি সব পাবেন। মেডিসিন বক্স একটা আছে, সেখানে যাবতীয় এসেনসিয়াল ড্রাগ পাবেন। পেট খারাপ হয়েছে— ফ্লাজিল আছে। মাথা ধরার ওষুধ আছে, জ্বর কমানোর ওষুধ আছে। থার্মোমিটার আছে। প্রেশার মাপার যন্ত্র আছে।

আনিস বলল, ভালো তো!

মঞ্জু বলল, ভালো-মন্দ জানি না। আমি সবসময় তৈরি থাকতে পছন্দ করি। দেখি, আপনার জ্বর কত মেপে দেই।

আনিস বলল, দরকার নেই।

মঞ্জু বলল, অবশ্যই দরকার আছে। আপনার চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে। জ্বর একশ' দুইয়ের উপরে। জ্বর একশ' দুই ক্রস করলে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়।

প্লিজ, আমার কিছু লাগবে না।

শুনলাম আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'ফর গুড' চলে যাচ্ছেন ? চির বিদায়।

হুঁ।

কলেজের প্রফেসরের চাকরি তো ভালো চাকরি। ছাড়লেন কেন ? কারো সঙ্গে ক্ল্যাশ হয়েছিল ?

হুঁ।

কার সঙ্গে ?

আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। কিছু মনে করবেন না।

মঞ্জু কিছু মনে করল বলে মনে হলো না। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্লাস্ক নিয়ে। ফ্লাস্কের মুখ খুলছে না। মনে হয় প্যাঁচ কেটে গেছে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ কামরাভর্তি লোক ছিল, এখন প্রায় ফাঁকা। এই কামরায় যারা এসেছিল তারা লীলাকে উঠিয়ে দিতে এসেছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, সিট দখল করে বসে থাকবে যাতে বাইরের কেউ উঠতে না পারে। ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় নেমে যাবে।

আনিসের পায়ের কাছে দুই ভদ্রলোক বসেছেন। মনে হয় রাজনীতির লোক। ক্রমাগত বকবক করে যাচ্ছে—

যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে, উচিত শিক্ষা হয়েছে। এখন বুঝ কত ধানে কত চাল! ইস্কান্দর মীর্জা সাহেব উচিত কাজ করেছেন।

ইস্কান্দর মীর্জাটা কে ?

মেজর জেনারেল। কঠিন লোক। বাঙালির জন্যে দরকার কঠিন লোক।

রাজনীতির আলাপে উৎসাহিত হয়ে মঞ্জু তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো এবং অতি দ্রুত একমত হলো যে, পূর্ববাংলার গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ কঠিন চীজ। সে পানি ছাড়াই চিড়া ভিজাতে পারে। আলোচকদের গলা উঁচু থেকে উঁচু হচ্ছে। আনিস একবার শুধু বলল, একটু আস্তে কথা বলবেন ? কেউ তা শুনল না।

লীলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। কেন জানি তার খুব মজা লাগছে। নয়াপাড়া নামের জায়গাটায় সে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছে। জায়গাটার জন্যে কিছুটা হলেও তার মনখারাপ লাগা উচিত। তা লাগছে না। ভাবটা এরকম যে সে একটা জরুরি কাজে গিয়েছিল। কাজ শেষ হয়েছে, এখন ফিরে যাচ্ছে। মন খারাপ করা বা বিষণ্ন হবার মতো কিছুই ঘটে নি। যদিও লীলার সৎমা খুব কান্নাকাটি করলেন। মস্তিষ্কবিকৃত মানুষের কান্নাকাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার কিছু নেই। তারা কারণ ছাড়াই কাঁদে। রমিলা লীলার হাত ধরে বিস্মিত গলায় বললেন, চইল্যা যাবা ? লীলা বলল, আমি সারাজীবন এখানে থাকার জন্যে আসি নাই। আপনাদের দেখার শখ ছিল। দেখেছি, শখ মিটেছে। এখন চলে যাচ্ছি।

থাকলে কী হয় ?

থাকলে কিছু হয় না। কিন্তু আমি আরো পড়াশোনা করব। এখানে পড়াশোনা করব কোথায় ?

পড়াশোনা না করলে কী হয় ?

লীলা হেসে ফেলল। হাসি থামিয়ে বলল, আমার প্রসঙ্গে আপনি যে কথা বলেছিলেন তা কিন্তু হয় নি।

কী বলেছিলাম ?

আপনি বলেছিলেন আমি এইখানেই থাকব, কোথাও যাব না।

পাগল-মানুষের কথা।

লীলা বলল, আপনি ভালো থাকবেন। নিজের যত্ন নেবেন।

রমিলা তখন কাঁদতে শুরু করলেন। সৎমায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়া লীলার জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। একসময় সিদ্দিকুর রহমান এসে বললেন, মেয়ের হাত ছাড়ো। তাকে যেতে দাও। রমিলা তৎক্ষণাৎ লীলার হাত ছেড়ে একপাশে গুটিয়ে গেলেন। ভীতচোখে তাকাতে লাগলেন। সিদ্দিকুর রহমান

বললেন, যে যেতে চায় তাকে জাপটে ধরে রাখা যায় না। বুঝেছ? রমিলা ভীত গলায় ফিসফিস করে বললেন, বুঝেছি।

বিদায়মুহূর্তে সিদ্দিকুর রহমান মেয়েকে কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আগেই বাড়িতে একটা নাটক হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত। চুপচাপ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

নাটক তৈরি হয়েছে মাসুদকে নিয়ে। সে ভোরবেলায় এসে উপস্থিত। চোখ-মুখ শুকনা। মাথার চুল উঠে গেছে। দেখে মনে হয়েছে কয়েক দিন না খেয়ে আছে। গালের চামড়া দেবে আছে। চোখের নিচে কালি। সিদ্দিকুর রহমান কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আছ কেমন?

মাসুদ অস্পষ্ট স্বরে বলল, ভালো।

দেশ-বিদেশ ঘুরলা?

মাসুদ কিছু বলল না। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ফিরে আসলা কেন?

মাসুদ চুপ করে রইল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, জবান বন্ধ কেন? কথা বলো। কার টানে ফিরলা? আমার টানে ফিরো নাই এইটা আমি জানি। আমার জন্যে এত টান কারোর নাই। তুমি তোমার ভাইবোনের জন্যেও ফিরো নাই। ঘরবাড়ির টানেও ফিরো নাই। তুমি কি পরীবানুর টানে ফিরেছ? দেখা হয়েছে তার সাথে?

মাসুদ জবাব দিচ্ছে না। সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। সিদ্দিকুর রহমান আবারো বললেন, পরীবানুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? হ্যাঁ কিংবা না একটা কিছু বলো।

মাসুদ বলল, জি দেখা হয়েছে।

পরীবানু তোমাকে দেখে খুশি হয়েছে?

মাসুদ চুপ করে আছে। সিদ্দিকুর রহমান হুঙ্কায় লম্বা টান দিয়ে সুলেমানকে ডেকে সহজ গলায় বললেন, তোমাকে বলেছিলাম মাসুদ যে-ট্রেনে নামবে সেই ট্রেনেই তাকে কানে ধরে তুলে দিবে। এই কাজটা তুমি করো নাই। যা-ই হোক, সকাল দশটায় একটা ট্রেন আছে। ঐ ট্রেনে তুলে দাও।

সুলেমান হ্যাঁ-সূচক ঘাড় কাত করল। সিদ্দিকুর রহমান সহজ গলায় বললেন, কানে ধরে নিয়ে যাবে। ভুল হয় না যেন।

সুলেমান আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

লীলা বিচারপ্রক্রিয়া শুনল। কিছুই বলল না। সে এই বাড়িতে আর থাকছে না। চলে যাচ্ছে। বাড়ির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ রাখার আর অর্থ হয় না। পৃথিবীর সবকিছু তার নিজের নিয়মে চলে। এই বাড়ি চলবে বাড়ির নিয়মে। এই বাড়ির

নিয়ম যদি হয় কথায়-কথায় কানে ধরে ঘোরানো তাহলে তা-ই সই। লীলা যখন তার ব্যাগ গোছাচ্ছিল তখন মাসুদ এসে তার সামনে দাঁড়াল। লীলা বলল, কিছু বলবে? মাসুদ কথা বলে নি। লীলা একবার ভাবল কিছু উপদেশ দেয়। তেমন কোনো উপদেশ তার মাথায় আসে নি। লীলা বলল, তুমি কিছু বলতে চাইলে বলো। মাসুদ তখন বিড়বিড় করে বলল, আমাকে আপনার সঙ্গে নিবেন?

লীলা বলল, না।

মাসুদ বলল, আমি কী করব বলে দেন।

লীলা বলল, তুমি কী করবে সেটা তুমি চিন্তা করে বের করবে।

মাসুদ সামনে থেকে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যি তাকে কানে ধরে স্টেশনের দিকে নিয়ে গেল সুলেমান। সুলেমানের পেছনে আছে লাঠি হাতে লোকমান। তাদের পেছনে গ্রামের কিছু লোকজন, কিছু বাচ্চা-কাচ্চা। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বলে দিয়েছিলেন ছেলেকে যেন পরীবানুর বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ রাখা হয়। সেই কাজটা করা হলো। পরীবানু বাড়ি থেকে বের হয়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখে বাড়িতে ঢুকে গেল।

ট্রেন ছুটছে। আকাশ মেঘলা। বাইরের পৃথিবী অন্ধকার দেখাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। দূরের গাছপালাকে কুচকুচে কালো লাগছে।

বাবার কাছ থেকে বিদায়ের দৃশ্য কেমন হবে এটা নিয়ে লীলার মনে সামান্য দুশ্চিন্তা ছিল। তবে লীলা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে আবেগঘন কিছু হবে না। বাবা স্বাভাবিক সৌজন্যের কিছু কথাবার্তা বলবেন। লীলা ঠিক করেছে, সে বিদায় নেবার সময় তীক্ষ্ণ চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তার দেখার ইচ্ছা এই অতি কঠিন মানুষটার চোখে পানি আসে কি-না। পানি না এলেও চোখ কি ছলছল করবে?

সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, ফি আমানিল্লাহ। যাও। তুমি এসেছিলে, মনে তৃপ্তি পেয়েছি, এর বেশি আমার কিছু বলার নাই। তোমার দাদির একটা গয়না আমার কাছে আছে। আমার খুব শখ গয়নাটা তোমাকে দেই। গয়নাটা নিবে?

লীলা বলল, না।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তোমার মায়ের একটা খাতা আমার কাছে আছে। নানান সময়ে সে গুটুর গুটুর করে কী সব লিখত। এই বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় সে খাতাটা ফেলে গেছে। মনে হয় ইচ্ছা করেই ফেলে গেছে। তুমি চাইলে খাতাটা তোমাকে দিতে পারি।

ইচ্ছা করে ফেলে যাবে কেন ?

খাতায় আমার সম্পর্কে, আমার দাদিজান সম্পর্কে অনেক অন্দমন্দ কথা আছে। মনে হয় তোমার মা চেয়েছিল আমি লেখা পড়ে মনে কষ্ট পাই।

খাতাটা আমি নিব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, মা শোনো, তোমার পড়াশোনার খরচ, বিবাহের খরচ সব আমি দিতে চাই।

আপনাকে কিছু দিতে হবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে।

বাবা, আমি এখন রওনা দেই।

তোমার জন্যে পালকি আনতে লোক গেছে। পালকি আসুক, তারপরে যাবে।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে লীলা লক্ষ করল, তার বাবার চোখে পানি। তিনি চট করে মাথা সরিয়ে ফেললেন যেন লীলা চোখের পানি দেখতে না পায়।

মায়ের লেখা খাতা লীলা বেশ খানিকটা পড়ে ফেলেছে পালকিতে আসতে আসতে—

'আজ শুক্রবার। জুম্মাবার। আমার মনে কোনো শান্তি নাই। আমি আজ ফজরের নামাজ পড়িয়া আল্লাহপাককে বলিয়াছি— ও আল্লাহগো, ও দয়াময়, তুমি দয়া করো। তুমি ডাইনির হাত হইতে আমাকে উদ্ধার কর। মানুষ কী প্রকারে এমন হইতে পারে ?

আমি আমার দাদি শাশুড়িকে ডাইনি বলিতেছি ইহা অতীব অন্যায়। কিন্তু কত দুঃখে বলিতেছি তাহা কি কেউ বুঝিবে ? গত বুধবারের ঘটনা। বুধবারে এই অঞ্চলে বিরাট হাট বসে। উনি লোকজন নিয়া হাটে গিয়াছেন। বাড়ি প্রায় খালি। আমার দাদিশাশুড়ি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি উনার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই উনি বলিলেন, নাতবউ, তোমার বুনি দুইটা এত বড় কেন ? বিবাহের পূর্বেই কি কেউ হাতাপিতা করিয়াছে ? বিবাহের পূর্বে হাতাপিতা করলে বুনি বড় হয়।

আমি এতই অবাক হইলাম যে আমার জবান বন্ধ হইল। আমি চুপ করিয়া আছি, তখন ডাইনি বলিল, ব্লাউজ খোল, আমি তোমার বুনি দেখব।

আমি বলিলাম, আপনি যদি আমাকে কোনোদিন এই জাতীয় কথা বলেন তাহলে আমি খেজুরের কাঁটা দিয়া আপনার চোখ গালাইয়া দিব। আল্লাহর কসম।

এই হইল ঘটনা। এই ঘটনা আমি কাহাকে বলিব ? কে আমার কথা শুনিবে ? উনি তাঁহার দাদিজানের বিষয়ে অন্ধ। কেন অন্ধ তাহাও বুঝি না।

ও আল্লাহপাক, ও দয়াময়, তুমি এই খবিস ডাইনির হাত হইতে আমাকে উদ্ধার করো।'

লীলা ট্রেনের জানালা থেকে মাথা ভেতরে নিয়ে এলো। হঠাৎ তার খানিকটা মন খারাপ লাগছে। কেন লাগছে তা বুঝতে পারছে না। সে মঞ্জুমামার দিকে তাকাল। বেচারার আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। লীলা জোর করেই তাকে নিয়ে এসেছে। ট্রেনে উঠার সময় তাঁর বেশ মন খারাপ ছিল। এখন আর মন খারাপ নেই। মহাউৎসাহে তিনি রাজনীতির আলাপ জুড়েছেন।

শুনেন, পরিষ্কার হিসাব শুনেন— বাঙালি জাতি যুক্তভাবে কিছু করতে পারে না। বাঙালি বিযুক্ত জাতি। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইয়ের জাতি। এখানে যুক্তফ্রন্ট চলে ? চলে না। হক সাহেব বিরাট বোকামি করেছেন। আমাদের দরকার লাঠির শাসন। মিলিটারির শাসন। বাঙালি গরমের ভক্ত, নরমের যম। বুঝেছেন কিছু ?

লীলা চোখ বন্ধ করে আছে। চলন্ত ট্রেনে তার সবসময় ঘুম পায়। ছাড়া ছাড়া ঘুম না, গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যে বিচিত্র সব স্বপ্ন। মঞ্জুমামার রাজনীতির গল্প শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখল— এক থুড়থুড়ি বুড়ি তার পাশে বসে আছে। বুড়ি ফোকলা দাঁতে পান খাচ্ছে। পানের লাল রস গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বুড়ি বলল, এই মেয়ে তোর নাম লীলা না ? তুই আয়নার মেয়ে না ?

লীলা বলল, জি।

বুড়ি বলল, তোর মা কি জীবিত আছে না মারা গেছে ?

মা মারা গেছেন।

কস কী! আমি তো যাইতেছি তোর মার সাথে সাক্ষাতের জন্যে। মারা গেলে সাক্ষাৎ ক্যামনে হইব ?

আপনি কে ?

আমি তোর মায়ের দাদি শাশুড়ি। তুই তো আমারে কদমবুসিও করলি না। কদমবুসি কর।

আমি আপনাকে কদমবুসি করব না।

WWW.BDBANGLA.COM

অবশ্যই করবি। তোর বাপ করে, তুই করবি না এইটা কেমন কথা ?

বুড়ি কদমবুসি করানোর জন্যে লীলার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। তখনি লীলার ঘুম ভাঙল। হাত ধরে টানাটানি করছেন মঞ্জুমামা। তাঁর মুখ আতঙ্কগ্রস্ত। লীলা বলল, কী হয়েছে মামা ?

খুবই খারাপ অবস্থা। অবস্থা ফর্টি নাইন।

অবস্থা ফর্টি নাইন মানে কী ?

ঐ লোক তো মারা যাচ্ছে।

লীলা অবাক হয়ে বলল, কোন লোক মারা যাচ্ছে ?

আমাদের সঙ্গে যে যাচ্ছে। কলেজের টিচার।

আনিসুর রহমান সাহেব ? জ্বর বেড়েছে ?

জ্বর বাড়াবাড়ি না। উনি নিজেই এখন আগ্নেয়গিরি।

বলো কী!

বদনায় পানি ঢেলে এই জ্বর কমানো যাবে না। দমকলে খবর দিতে হবে। এরকম সিরিয়াস রোগী সঙ্গে আনাই ঠিক হয় নি। হুশ করে মারা যাবে। আমরা ডেডবডি নিয়ে পড়ব বিপদে। শরীরে হাত রাখলে হাত গরমে পুড়ে যাচ্ছে, আবার পায়ের তলা বরফের মতো ঠাণ্ডা। এটা খারাপ লক্ষণ।

লীলা উঠে এলো। আনিসের মাথার কাছে বসতে বসতে বলল, আপনার জ্বর নাকি খুব বেড়েছে ? আনিস জবাব দিল না। লীলা বলল, আপনি তো থরথর করে কাঁপছেন। শীত লাগছে ?

জি।

লীলা আনিসের কপালে হাত রাখল। আনিস চমকে উঠল। হিম-শীতল হাত। লীলা বলল, আপনি যখন ট্রেনে উঠেছেন তখনো কি আপনার এত জ্বর ছিল ?

জ্বর ছিল, এতটা ছিল কি-না জানি না।

আপনার মাথায় পানি ঢালা দরকার। ট্রেনের কামরায় পানি ঢালব কীভাবে বুঝতে পারছি না।

কিছু করতে হবে না। ধন্যবাদ।

লীলা বলল, আপনি তো আমাদের সঙ্গে ঢাকা যাচ্ছেন না, আপনি যাবেন আপনার মায়ের কাছে। ভৈরব স্টেশনে নামবেন। তাই না ?

হুঁ।

স্টেশন থেকে একা যাবেন ?

আনিস বিড়বিড় করে বলল, জানি না।

জানি না মানে কী ?

আনিস জবাব দিল না। তার শরীর কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে। মুখে ফেনা জমছে। মঞ্জু বলল— ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে উনার মৃগী বেরাম আছে। ভালো বিপদে পড়লাম দেখি!

লীলা বলল, বিপদ তো বটেই, কী করা যায় সেটা ভেবে বের করো।

আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।

লীলা বলল, সামনের স্টেশনে ট্রেন থামবে। সেখানে আমরা উনাকে নিয়ে নেমে পড়ব। সেখান থেকে রিটার্ন ট্রেন যদি পাওয়া যায় তাহলে ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাব। আর যদি ট্রেন না পাওয়া যায় তাহলে মহিষের গাড়ি কিংবা গরুর গাড়িতে বাড়ি ফিরব। আমরা তো মাত্র একটা স্টেশন পার হয়েছি। বেশিদূর তো যাই নাই।

মঞ্জু বিরক্ত মুখে বলল, লীলা, তোর তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

লীলা বলল, মামা, আমার মাথা খারাপ হয় নি। আমার চেয়ে ভালো বুদ্ধি যদি কিছু তোমার মাথায় আসে তুমি বলো, আমি শুনব। উনার জ্বর যেভাবে বাড়ছে উনি তো কিছুক্ষণের মধ্যে কোমায় চলে যাবেন।

কোমায় যাক কিংবা সেমিকোলনে যাক, আমরা কি তাকে নিয়ে ফেরত যাব না-কি! এই লোকের দরকার চিকিৎসা। তাকে কোনো একটা হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। বাড়িতে নিয়ে লাভ কী ? বাড়িতে কি হাসপাতাল আছে ?

হাসপাতাল না থাকলেও সেবাযত্ন আছে। বাজারে পাশ করা ডাক্তার আছে।

বাড়িতে ফেরত যাবি ?

হুঁ।

ঘটনা যদি তার আগেই ঘটে যায় তাহলে কী করবি ?

লীলা জবাব দিল না। সে আনিসের কপালে আবারো হাত রাখল। আনিস চমকে উঠল। তার কাছে মনে হচ্ছে, বরফের একটা খণ্ড তার মাথায় কেউ রেখেছে। বরফের ভেতর থেকে শুকনা বকুল ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ নাকে আসছে। বরফ যেমন ঠাণ্ডা, বকুল ফুলের গন্ধটাও ঠাণ্ডা। নাকের ভেতর দিয়ে গন্ধটা ঢুকছে, সবকিছু ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। আনিস বলল, পানি খাব। বলেই চোখ বন্ধ করে ফেলল। মেঘলা দিন, কামরার ভেতর তেমন আলো নেই, তবু সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না। চোখের ভেতর কড়া আলো ঢুকে যাচ্ছে। চোখ কড়কড় করছে।

কেউ-একজন চামচে করে তার ঠোঁটে পানি ধরছে। সেই কেউ-একজনটা কে? একটু আগে সে তাকে চিনতে পারছিল, এখন আর চিনতে পারছে না। তবে চেনা-চেনা লাগছে। ও আচ্ছা! মনে পড়ছে— যূথি। মা'র সঙ্গে রাগ করে সে কাঁচি দিয়ে খ্যাচ করে মাথার একগাদা চুল কেটে ফেলে, চুলের শোকে কেঁদে অস্থির। সে যূথিকে বলেছিল, এই যূথি, তুই তো তোর কাটা চুলগুলি ফেলেই দিবি— এক কাজ কর, আমাকে দিয়ে দে। যূথি বলল, তুমি চুল দিয়ে কী করবে? সে বলল, জমা করে রাখব। একটা কৌটায় ভরে সুটকেসে রেখে দেব। যূথি বলল, চুল রেখে কী হবে? আসল মানুষটাকে রেখে দাও। বলেই কী ভয়ঙ্কর লজ্জা যে পেল! পরের তিনদিন তার আর দেখা নাই। এত যার লজ্জা সে কীভাবে অবলীলায় বলল, চুল রেখে কী হবে? আসল মানুষটাকে রেখে দাও। যূথির বয়স তখন কত হবে, চোদ্দ-পনেরোর বেশি হবে না। এই বয়সে মেয়েদের আবেগও বেশি থাকে, লজ্জাও বেশি থাকে। বয়স যত বাড়তে থাকে লজ্জা-আবেগ দু'টাই কমতে থাকে।

আনিসের বুক শুকিয়ে আসছে। সে বিড়বিড় করে বলল, যূথি, পানি খাব।

যূথি চামচে করে ঠোঁটে পানি দিচ্ছে। এত ঠাণ্ডা পানি সে কোথায় পেয়েছে কে জানে! মনে হচ্ছে সমস্ত মুখ ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, যূথির সঙ্গে এইভাবে ট্রেনে দেখা হয়ে গেল! বেচারির ঘাড়ে এসে পড়ল রোগীর যত্ন। চামচে করে পানি খাওয়াতে হচ্ছে। আনিসের যখন টাইফয়েড হলো তখনো যূথি খুব সেবা করেছে। যূথি মেয়েটার জন্মই হয়েছে সেবা করার জন্যে। আনিসের হাত-পা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। সে ক্লান্ত গলায় বলল, যূথি, তোমার চুলগুলি আমি খুব যত্ন করে রেখেছি। একটা হরলিক্সের কৌটায় ভরে সুটকেসে রেখে দিয়েছি। যূথি বলল, শুধু রেখে দিলে তো হবে না। মাঝে মাঝে বের করে রোদে দিতে হবে। সাজি মাটি দিয়ে ধুতে হবে।

কথাগুলি কি সত্যি যূথি বলছে, না অন্য কেউ বলছে? যূথি খুব নরম করে কথা বলে, এমন কঠিন করে কাটা কাটা ধরনের কথা বলে না। কে কথা বলছে চোখ মেলে দেখতে পারলে হতো। চোখ মেলা যাচ্ছে না। আনিস বুঝতে পারছে সে গভীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে, কিন্তু সে ট্রেনে করে যাচ্ছে না। সে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে।

আরে এ তো দেখি আরেক ঘটনা। মালেকভাইকে দেখা যাচ্ছে। মালেক ভাইয়ের চোখে কালো চশমা। চাদর দিয়ে শরীর ঢাকা।

মালেক ভাই, ছাড়া পেলেন কবে?

আনিস!

জি মালেক ভাই।

মারা যাচ্ছ না-কি?

জি।

মৃত্যু খারাপ জিনিস না। মৃত্যু ভালো জিনিস।

জি।

সাহসী মানুষ মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করে।

জি।

আনিস, তুমি কি সাহসী?

জি-না।

বুঝলে আনিস, আমরা কেউই সাহসী না। পরিস্থিতি আমাদের সাহসী করে। পরিস্থিতি আমাদের ভীতু করে।

জি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ছেলেগুলি যে ফাঁসিতে ঝুলেছে তারা সবাই যে ভয়ঙ্কর সাহসী ছিল তা-না। পরিস্থিতি তাদের সাহসী করেছে।

জি।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে মুসলমান ছেলেরা পিছিয়ে গেল কেন আনিস?

আমি জানি না মালেক ভাই।

কেন জানবে না? অবশ্যই জানো। আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করেছি।

এখন আমার কিছু মনে পড়ছে না মালেক ভাই। আমার শরীর খুব খারাপ। আমার জ্বর এসেছে। আমার মাথা এলোমেলো।

তাহলে আমি বলি, তুমি শোনো।

মালেক ভাই, আজ বাদ থাক।

বাদ থাকবে কেন? তুমি চোখ বন্ধ করে শোনো। তোমার পাশে যে রূপবতী বসে আছে সে কে?

তার নাম যূথি।

যূথি বলছ কেন? তার নাম তো লীলাবতী।

ও হ্যাঁ, লীলাবতী। জ্বরের কারণে আমার মাথার ঠিক নাই। কী বলতে কী বলছি।

মেয়েটার সঙ্গে তোমার প্রেম হয়ে যায় নাই তো?

জি না।

গুড। ভেরি গুড। প্রেম হচ্ছে হৃদয়ের দুর্বলতা। আমরা সর্বক্ষেত্রে হৃদয়ের দুর্বলতা পরিহার করব।

জি।

এখন শোনো, মুসলমান ছেলেরা কেন স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে গেল।

আজ থাক মালেকভাই।

শোনো, মন দিয়ে শোনো— স্বদেশীরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বই থেকে প্রেরণা পেত। এই বইয়ের মূলমন্ত্র বন্দেমাতরম গান—

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
তুংহি দূর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী...

কোনো মুসলমান ছেলে কি এই গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নিতে পারে?

আপনি তো মুসলমান না! আপনি আল্লাহই বিশ্বাস করেন না।

আমার কথা আসছে কেন? আমি তো স্বদেশী আন্দোলন করছি না। আমি একজন কমিউনিস্ট। আমি সাম্যের কথা বলি— বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্য।

মালেক ভাই, আমার মাথাটা একটু তুলে ধরবেন! আমি বমি করব।

ঐ মেয়েটাকে বলো— কী যেন তার নাম?

লীলাবতী। পণ্ডিত ভাস্করাচার্যের একমাত্র কন্যা— লীলাবতী।

বিডিবাংলা ডট কম

মাগরিবের নামাজ শেষ করে সিদ্দিকুর রহমান মাঝউঠোনে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। মাগরিবের ওয়াক্তে ঘরে আলো দিতে হয়, আজ আলো দেয়া হয় নি। শুধু উঠোনে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের ভেতর আলো না জ্বালানোর একমাত্র কারণ রমিলা। লীলা চলে যাবার পর থেকে তার মাথা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে আছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই। সে কিছুক্ষণ পরপর সাপের মতো ফোঁসফোঁস করে কী যেন বলছে। দেয়ালে মাথা ঠুকে রক্ত বের করে ফেলেছে। সিদ্দিকুর রহমান সব খবর পেয়েছেন। কিন্তু এখনো কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তিনি যদি শুধু সামনে গিয়ে বলেন— রমিলা, কাপড় পরো। সে কাপড় পরবে। সিদ্দিকুর রহমানের চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। ক্লান্তি লাগছে।

তাঁর মনে হচ্ছে শরীরও খারাপ করেছে। মাথায় কোনো যন্ত্রণা নেই, কিন্তু মাথা দপদপ করছে। এটা কি বড় ধরনের রোগ-ব্যাধি শুরু হবার পূর্বলক্ষণ? তাঁর কোনো অসুখ-বিসুখ হয় না। কাজেই অসুখের পূর্বলক্ষণ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। রমিলার মাথা খারাপ হবার কিছুদিন পর এক গভীর রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে তিনি আল্লাহ্পাকের কাছে বলেছিলেন— ইয়া রহমানুর রহিম, তুমি আমাকে যে-কোনো রোগ-ব্যাধি দিতে চাইলে দিও, কিন্তু আমার মাথাটা যেন ঠিক থাকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন আমি সুস্থ মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমার যেন রমিলার মতো না হয়।

সিদ্দিকুর রহমানের ধারণা আল্লাহ্পাক তাঁর কথা শুনেছেন। সবরকম রোগ-ব্যাধি থেকে তাঁকে মুক্ত রেখেছেন। আজ যদি রমিলার মতো অবস্থা তাঁর হতো! একটা ঘরে তাঁকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাঁর গায়ে কোনো কাপড় নেই। লোকজন আসছে, তাঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখছে। তিনিও হাসিমুখে তাদের সঙ্গে গল্প করছেন। স্বাভাবিকভাবেই গল্প করছেন। যেসব পাগল সম্পূর্ণ নগ্ন থাকে তারা কথাবার্তা বলে খুবই স্বাভাবিকভাবে। এই ধরনের পাগলদের পাগলামি নগ্নতায় সীমাবদ্ধ।

চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। সুলেমান হারিকেন জ্বালিয়ে তাঁর ইজিচেয়ারের পেছনে এনে রাখল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন— সুলেমান, মাসুদকে কি তুমি ট্রেনে তুলে দিয়েছিলে?

সুলেমান বলল, জি।

টিকিট কেটে দিয়েছ, না-কি বিনা টিকিটে তুলে দিয়েছ?

বিনা টিকিটে।

এটা ভালো করেছ। সে কি কান্নাকাটি করছিল?

জি না।

চোখের পানি ফেলে নাই?

জি না।

এটা খারাপ না। শুনে আনন্দ পেলাম। কিছুটা তেজ তাহলে এখনো আছে। বিষধর সাপের বিষ আর পুরুষের তেজ— দু'টাই এক জিনিস। বিষধর সাপের বিষ শেষ হয়ে গেলে সাপের মৃত্যু হয়। পুরুষের তেজ শেষ হওয়া মানে পুরুষের মৃত্যু। বুঝেছ?

জি।

মেয়েদের তেজটা কী জানো?

জি না।

মেয়েদের তেজ তাদের চোখের পানিতে। যখন কোনো মেয়ের চোখের পানি শেষ হয়ে যায়— তখন সেই মেয়েরও মৃত্যু হয়। বুঝেছ?

জি।

তোমাকে কেন জানি চিন্তিত মনে হচ্ছে। সুলেমান, তুমি কি কোনো বিষয় নিয়া চিন্তিত?

সুলেমান জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। তাকে দেখে এখন সত্যি সত্যি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কোনো বিষয় নিয়া চিন্তা করার প্রয়োজন হলে সেটা আমারে বলো। আমি চিন্তা করব। চিন্তা করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌পাক সব মানুষকে দেন নাই। অল্পকিছু মানুষ চিন্তা করতে পারে। জগতের বেশিরভাগ মানুষ তোমার মতো কাজ করতে পারে। চিন্তা করতে পারে না।

সুলেমান এখনো মাথা নিচু করে আছে। তার দৃষ্টি উঠানে নিবদ্ধ। সিদ্দিকুর রহমান ঠিকই ধরেছেন। সে খুবই চিন্তিত এবং ভীত। ভয়ে তার গলা

শুকিয়ে গেছে। কারণ একটু আগে সে বড় ধরনের একটা মিথ্যা কথা বলেছে। তার ধারণা— মিথ্যা কথাটা ধরা পড়ে গেছে। এখনি সওয়াল-জবাব শুরু হবে। তার কঠিন শাস্তি হবে। সিদ্দিকুর রহমানের নিয়ম হলো, কঠিন শাস্তি দেবার আগে-আগে তিনি হালকা মেজাজে হাসিমুখে কথাবার্তা বলেন। অপরাধীর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশাও করেন। অপরাধীর ধারণা হয়ে যায় সে মাপ পেয়ে গেছে। সে যখন মোটামুটিভাবে নিশ্চিন্ত হতে শুরু করে তখনি শাস্তির হুকুম হয়। তার বেলাতেও কি এই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে! সেরকমই তো মনে হচ্ছে। সুলেমান গুটিয়ে গেল।

মিথ্যা কথা সে যা বলেছে তা হলো, মাসুদকে সে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে নি। উত্তরপাড়ার সুরুজ মিয়ার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। এই কাজটা যে সে নিজ থেকে করেছে তা-ও না। এত সাহস তার নেই। কাজটা সে করেছে লীলাবতীর কথামতো। লীলাবতী বলে গিয়েছিল— মাসুদ ফিরে এলে তার বাবা তাকে আবার ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিতে বলবেন। এই কাজটা তখন যেন না করা হয়। মাসুদকে যেন লুকিয়ে রাখা হয়। দু'একদিন পর তার বাবার রাগ খানিকটা পড়বে। ছেলের জন্যে মনখারাপ হবে। তখন যেন মাসুদকে নিয়ে আসা হয়। বুদ্ধিটা খুবই ভালো। সমস্যা একটাই— যার বুদ্ধি সে উপস্থিত নাই। বুদ্ধি দেয়া মানুষটা চলে গেছে। যন্ত্রণা এসে পড়েছে তার ঘাড়ে। অন্যের বুদ্ধিতে এত বড় যন্ত্রণা মাথায় নেয়া ঠিক হয় নাই।

সুলেমান!

জি চাচাজি?

আমার মেয়ে লীলাবতীকে যখন ট্রেনে তুলে দিলা তখন কি সে কাঁদতেছিল?

জি।

অল্প কেঁদেছে, না বেশি কেঁদেছে?

বেশি কেঁদেছে। ঘনঘন শাড়ি দিয়ে চোখ মুছেছে।

সিদ্দিকুর রহমান ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন— আমার এই মেয়ে যে পুরোপুরি তার মা'র মতো হয়েছে তা কিন্তু না। তার মা'কেও আমি ট্রেনে তুলে দিয়েছিলাম। সে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে নাই।

সুলেমান শঙ্কিত বোধ করছে। সে আবারো একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলেছে। লীলাবতী কোনো চোখের পানি ফেলে নাই। সহজ স্বাভাবিকভাবে

ট্রেনে উঠে বসেছে। বরং হাসিমুখে সবার দিকে তাকিয়েছে। তাহলে আগ বাড়িয়ে সুলেমান এই মিথ্যা কথাটা কেন বলল ?

বাড়ির ভেতর থেকে রমিলার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রমিলা চাপা গলায় কাঁদছেন। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট স্বরে দু'একটা কথাও বলছে। সিদ্দিকুর রহমানের হঠাৎ ইচ্ছা করল— রমিলা কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কী বলছে আড়াল থেকে সেটা শোনেন। খুবই অন্যায় ইচ্ছা। তাঁর মতো মানুষের এ ধরনের ইচ্ছা হওয়া উচিত না। কিন্তু ইচ্ছাটা তিনি চাপা দিতে পারছেন না। তিনি ইজিচেয়ার থেকে নামলেন। ইজিচেয়ারের পেছনে রাখা হারিকেনটা হাতে নিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো— হারিকেন-হাতে উঠে দাঁড়ানো মাত্র রমিলার কান্না থেমে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় তিনি খবর পেয়েছিলেন রমিলার গায়ে কোনো কাপড় নেই। এখন দেখা গেল রমিলা শাড়ি পরে জড়সড় হয়ে খাটে বসে আছে। নতুন বউদের মতো মাথায় ঘোমটা দিয়েছে।

সিদ্দিকুর রহমান ডাকলেন, রমিলা!

রমিলা জবাব দিল না। আরো যেন গুটিয়ে গেল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে ?

রমিলা বলল, জি।

একটু আগে কাঁদতেছিলা কেন ?

রমিলা বিড়বিড় করে বলল, আমি পাগল-মানুষ। আমার হাসন কান্দনের কোনো ঠিক নাই। ইচ্ছা হইলে হাসি। ইচ্ছা হইলে কান্দি।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, পাগল হওয়ার দেখি অনেক সুবিধা আছে। ইচ্ছামতো কাজকর্ম করা যায়। আমার অনেককিছু করতে ইচ্ছা হয়। করতে পারি না।

রমিলা সিদ্দিকুর রহমানকে বিস্মিত করে বলল, পাগলা হইয়া যান, তাইলে করতে পারবেন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, পাগল হলে নিজের ইচ্ছামতো হাসা এবং কাঁদা ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না। হাসি-কান্না এই দুটা কাজের মধ্যে পড়ে না। হাসি-কান্না কাজের ফল, কাজ না।

কথাগুলো বলে সিদ্দিকুর রহমান নিজের উপরই বিরক্ত হলেন। মস্তিষ্ক বিকৃত একজন মানুষের সঙ্গে এ-ধরনের জটিল কথাবার্তা চালানো অর্থহীন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, শুনেছি দুপুরে তুমি কিছু খাও নাই। খিদা লেগেছে ? এখন কিছু খাবে ?

খিদা হয়েছে। কিন্তু এখন খাব না।

কখন খাবে ?

আপনার মেয়ে লীলা আসতেছে। সে আসার পরে খাব। দু'জন একসঙ্গে খাব।

লীলা ঢাকায় চলে গেছে। আজ দুপুরে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসা হয়েছে। সে আসবে না।

রমিলা দৃঢ় গলায় বলল, সে ফিরত আসবে।

অসুস্থ মানুষের কাছে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করার কোনো অর্থ হয় না। সিদ্দিকুর রহমান এই নিয়ে কোনো কথা বললেন না, তবে তার মধ্যে সামান্য সংশয় তৈরি হলো। আগেও একবার রমিলা হঠাৎ করে বলেছিল লীলা আসবে। লীলা ঠিকই এসেছে। আজো সে-রকম কিছু ঘটবে না তো ? সিদ্দিকুর রহমান বললেন, লীলা কখন আসবে ?

রমিলা ফিসফিস করে বলল, এশার নামাজের ওয়াক্তে। ঘর-দুয়ার অন্ধকার করে রাখছেন কেন ? বাতি জ্বালান। কাঁঠালের বিচি দিয়া মুরগির সালুন রান্দার ব্যবস্থা করেন। লীলা এই সালুন বড় পছন্দ করে। আমার ইচ্ছা এই সালুনটা আমি রান্দি।

আগুনের কাছে তোমার যাওয়া নিষেধ।

তাইলে থাক। অন্য কাউকে দিয়া এই সালুন রান্দাইয়া রাখেন।

সিদ্দিকুর রহমান জবাব দিলেন না। তবে তিনি বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন, রমিলার কথায় তিনি প্রভাবিত হচ্ছেন। কাঁঠালের বিচি দিয়ে মুরগির সালুন রেঁধে রাখার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করছে।

এশার নামাজের আগে-আগে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। কার্তিক মাসে আষাঢ় মাসের বৃষ্টি। এই বৃষ্টির আলাদা নাম আছে। কাত্যাইয়ান না ? দমকা বাতাস ঝোড়ো হাওয়া। আকাশ ভেঙে নেমেছে বৃষ্টি। সিদ্দিকুর রহমান উঠানে বসে বৃষ্টি দেখছেন। তিনি সামান্য চিন্তিত। যে-বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তিত সেটা ভেবেও তাঁর মেজাজ খারাপ হচ্ছে। তিনি চিন্তিত লীলাবতীকে নিয়ে। কোনো বিস্ময়কর কারণে সত্যি সত্যি যদি তাঁর মেয়ে এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ফিরে আসে তাহলে

খুবই সমস্যায় পড়বে। পশ্চিম পাড়ায় ছোট খালের উপরে যে কাঠের পুলটা আছে সেটা নড়বড় করছে। পাশেও অত্যন্ত ছোট। পনের-বিশদিন আগে মহিষের একটা গাড়ি পুল থেকে খালে পড়ে গিয়েছিল। মানুষ মারা যায় নি, কিন্তু একটা মহিষ মারা গেছে। লোকমান বা সুলেমান এদের কোনো একজনকে টর্চ হাতে কাঠের পুলের কাছে পাঠিয়ে দিলে খারাপ হয় না। কিন্তু তিনি কী বলে লোকমানকে পাঠাবেন ? তাঁর মেয়ে লীলা, যে দুপুরের ট্রেনে ঢাকা চলে গিয়েছিল, সে ফেরত আসছে— এই খবর তিনি পেয়েছেন কোথায় ? তাঁর পাগল স্ত্রীর কাছে। ব্যাপারটা হাস্যকর না ?

সিদ্দিকুর রহমান এশার নামাজের ওয়াক্ত পর্যন্ত বারন্দায় বসে রইলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে সুলেমান এবং লোকমান এই দুই ভাইকে ডেকে বলেন যে, তারা যে মিথ্যাচার করেছে তা তিনি জানেন। মাসুদকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাও জানেন। তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। যে একবার বিশ্বাস ভঙ্গ করে সে বারবারই করে। রমিলা বলেছিল লীলা এশার নামাজের ওয়াক্তে ফিরে আসবে। এশার নামাজ অনেকক্ষণ হলো শেষ। লীলা ফিরে আসে নি। একজন পাগলমানুষের কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হয় নি। মানুষের সমস্যা হলো, একবার কারো কোনো কথায় বিশ্বাস করে ফেললে বারবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে তিনি ঘুমুতে গেলেন রাত এগারটায়। ততক্ষণে ঝড় থেমে গেছে, কিন্তু বৃষ্টি আগের মতোই মুষলধারে পড়ছে। সিদ্দিকুর রহমানের মন সামান্য খারাপ। তিনি মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন— লীলা ফিরে আসছে। তিনি কাঁঠালের বিচি দিয়ে মুরগির সালুনের ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। শেষ মুহূর্তে সালুন রান্না হয় নি।

মধ্যরাতে হৈচৈ-এর শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙল। বারান্দায় এসে দেখেন বারান্দায় পাশাপাশি তিনটা হারিকেন জ্বলছে। বৃষ্টির পানিতে কাকভেজা হয়ে চারজন লোক বারান্দায় উঁচু হয়ে বসে শীতে কাঁপছে। সিদ্দিকুর রহমানকে দেখে তারা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তোমরা কারা ? তাদের একজন ভীত গলায় বলল, তারা গাড়োয়ান। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কে এসেছে গরুর গাড়িতে ?

গাড়োয়ান ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বলল, আপনার মেয়ে আসছে।

সিদ্দিকুর রহমান স্বাভাবিক গলায় বললেন, ও আচ্ছা ঠিক আছে।

এতক্ষণ সুলেমান বা লোকমান এদের কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। এখন সুলেমানকে দেখা গেল। ছাতা-হাতে আসছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কোথায় গিয়েছিলা ?

ডাক্তার সাবরে খবর দিতে গেছিলাম।

ডাক্তার কী জন্য ?

লীলা বইনজি প্রফেসার সাবরে নিয়া ফিরত আসছে। প্রফেসর সাবের শইল খুব খারাপ।

লীলা কখন আসছে ?

একঘণ্টার উপরে হইব।

আমারে ডাক দেও নাই কেন ?

আপনে ঘুমাইতে ছিলেন। বইনজি আপনের ঘুম ভাঙাইতে নিষেধ করেছেন।

লীলা কোথায় ?

পাকা বাড়িতে গেছেন। সিনান করবেন।

তার খাওয়াদাওয়া হয়েছে ?

জি না।

সিদ্দিকুর রহমান গাড়োয়ান চারজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা শীতে কাঁপতেছে। গামছা দেও, এরা শইল মুছুক। এরার খাওয়ার ব্যবস্থা করো। প্রত্যেকেরে ভাড়ার উপরে পাঁচ টাকা করে বখশিস দেও। কষ্ট করে আমার মেয়েরে এনেছে।

সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের খোঁজ করলেন না। হারিকেন হাতে রমিলার ঘরে ঢুকলেন। সন্ধ্যাবেলা রমিলা যে-ভঙ্গিতে যেভাবে খাটে বসেছিল, এখনো সেইভাবেই বসে আছে। মাথার ঘোমটাও আগের মতোই দেয়া আছে। সিদ্দিকুর রহমান ডাকলেন, রমিলা!

রমিলা ক্ষীণ স্বরে বলল, জি।

লীলা ফিরে এসেছে, খবর পেয়েছো ?

জি।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

না।

সে যে ফিরত আসতেছে এটা তুমি কীভাবে বললা ?

জানি না।

সিদ্দিকুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কাঁঠালের বিচি জোগাড় করে রেখেছি। যাও, মুরগির সালুন রাঁধো।

রমিলা ঘোমটা সরিয়ে সিদ্দিকুর রহমানের দিকে তাকিয়ে হাসল। সিদ্দিকুর রহমান রমিলার ঘরের দরজা খুলে দিলেন।

এখনো ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সিদ্দিকুর রহমান ভেতরের উঠোনে বসে আছেন। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে রমিলা তোলা উনুনে রান্না বসিয়েছে। দৃশ্যটা দেখতে সিদ্দিকুর রহমানের খুব ভালো লাগছে।

সুলেমান বসেছে তাঁর পায়ের কাছে। পায়ের আঙুলে রসুন দিয়ে গরম করা সরিষার তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, সুলেমান শোনো, তোমরা দুই ভাই যে অপরাধ করেছ সেটা ক্ষমা করলাম। শেষবারের মতো করলাম। মাসুদকে বলবা সকালে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

সুলেমান মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, জি আচ্ছা।

ডাক্তার কি আসছে?

জি আসছে। প্রফেসর সাবরে দেইখা গেছে।

ডাক্তার কী বলল?

বলেছেন অবস্থা ভালো না। রোগী টিকব না।

দুঃসংবাদে সিদ্দিকুর রহমান বিচলিত হলেন না। সারা শরীরে আরামদায়ক আলস্য নিয়ে তিনি বসে আছেন। বৃষ্টির শব্দ শুনছেন। তাঁর বড় ভালো লাগছে।

সুলেমান।

জি।

জগৎ যে রহস্যময় এটা জানো?

সুলেমান জবাব দিল না। জগতের রহস্য নিয়ে বিচলিত হবার মানসিকতা তার নেই। তার কাজ বড় সাহেবের হুকুম তামিল করা। সারাজীবন এই কাজটাই সে করবে। একটু আগে বিরাট একটা ফাড়া কেটেছে। ফাড়া কাটার আনন্দেই সে আনন্দিত।

সুলেমান শোনো, জগৎ বড়ই রহস্যময়। কেন জানো?

জি না।

কারণ খুব সোজা। যিনি জগৎ তৈরি করেছেন তিনি রহস্য পছন্দ করেন। তিনি নিজেও রহস্যময়। এখন বুঝেছ?

জি।

যেসব মানুষের ভেতর রহস্য আছে তিনি তাদেরও পছন্দ করেন। যার ভেতর রহস্য নাই, তাকে তিনি পছন্দ করেন না। তার প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করেন না।

সুলেমান প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, তামুক খাইবেন? হুক্কা আনি?

আনো।

সুলেমান হুক্কা আনতে যাচ্ছে না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বড় সাহেবকে একা রেখে সে যেতে পারে না। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লোকমান গেল কোথায়? তার তো এখানে থাকার কথা।

যাত্রা ভঙ্গ করে ফিরে আসার সময় মঞ্জু যতটা বিরক্ত হয়েছিলেন এখন ততটাই আনন্দ পাচ্ছেন। বদু তার গায়ে তেল মালিশ করছে। আরামে তার ঘুম চলে এসেছে। তেল মাখানো পর্ব শেষ হলে বৃষ্টির পানিতে গোসল করবেন জানিয়েছেন। বৃষ্টি-স্নানের দুজন সঙ্গীও তার জুটেছে। জইতরী ও কইতরী দুই বোন। জইতরী আগে আড়ালে আড়ালে থাকত, আজ সে প্রকাশ্য হয়েছে এবং মহাআনন্দে হড়হড় করে কথা বলে যাচ্ছে। এই মেয়ের কথার স্রোতে কইতরী টিকতে পারছে না। জইতরী মেয়েটা কথাও বলছে গুছিয়ে এবং বেশ রহস্য করে—

কইতরী আপনারে ভালো পায়। আমি পাই না।

তুমি পাও না কেন?

আপনারে বলব না।

কেন বলবে না?

বললে ভাববেন আমি মন্দ মেয়ে।

তুমি কি ভালো মেয়ে?

হুঁ।

কীভাবে জানো তুমি ভালো মেয়ে?

যে ভালো সে নিজে জানে সে ভালো। যে মন্দ সে নিজে জানে না সে মন্দ।

এই বাড়িতে মন্দ কে?

আপনেরে বলব না।

এই বাড়িতে মন্দ কতজন আছে?

একজন।

সে কে?

একবার তো বলেছি আপনেরে বলব না।

কইতরী এবং জইতরী এই দুই বোনের ভেতর ভালো কে ?

আমি ভালো।

সুন্দর কে ?

আমি।

সবই তুমি ?

হুঁ।

তোমার আরেক বোন লীলা, সে তো তোমার চেয়েও সুন্দর।

হুঁ।

সে তোমার চেয়ে ভালো ?

হুঁ। কিন্তুক সে আলাদা।

সে আলাদা কেন ?

আপনেরে বলব না।

তোমরা দুই বোন যে বৃষ্টিতে আমার সঙ্গে ভিজবে তোমাদের বাবা বকবে না ?

না।

বকবে না কেন ?

বাপজানের মন এখন ভালো। উনার মন ভালো থাকলে কাউকে বকেন না।

মন ভালো কেন ?

বড়বুবু ফিরা আসছে— এইজন্য মন ভালো।

বড়বুবু ফিরে আসায় তোমরা খুশি হয়েছ ?

হুঁ। আইজ রাইতে আমরা বড়বুবুর সঙ্গে ঘুমাব।

লীলা মাঝখানে আর তোমরা দুই বোন দুই পাশে ?

হুঁ।

আজ রাতে তোমাদের খুবই মজা হবে ?

হুঁ।

বৃষ্টির পানিতে তিনি যখন দুই কন্যাকে নিয়ে নামলেন তখন জইতরী ঘোষণা করল— আমি আপনেরে ভালো পাই।

মঞ্জু বললেন, কেন ?

জইতরী বলল, জানি না কী জন্যে। কিন্তু আমি আপনেরে ভালো পাই।

শুনে খুশি হলাম।

আমার একটা নিয়ম আছে।

কী নিয়ম ?

আমি একবার যখন কাউকে ভালো পাই তারে সারা জীবনই ভালো পাই।

এই নিয়ম কি তুমি নিজে বানিয়েছ ?

হুঁ।

জইতরী এসে মঞ্জুর হাত ধরল। তার দেখাদেখি কইতরীও হাত ধরল। বৃষ্টির পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। দুই বোনই শীতে কাঁপছে, তারপরও তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মঞ্জুর মনে হলো, এই দুই কন্যাকে রেখে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হবে। লীলা চলে যেতে চাইলে চলে যাবে, তিনি থাকবেন।

রমিলা লীলাকে নিয়ে খেতে বসেছেন। বেশ আয়োজন করেই খেতে বসা হয়েছে। পাটির উপর বড় জলচৌকি বসানো হয়েছে। মা-মেয়ে বসেছে জলচৌকির দু'পাশে।

রমিলা মাথা নিচু করে খাচ্ছেন। তাঁর মাথায় বিরাট ঘোমটা। ঘোমটার ভেতর দিয়ে আড়চোখে মেয়েকে দেখছেন। যতবারই দেখছেন ততবারই লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলছেন।

মাগো, তুমি যে ফিরত আসবা আমি জানতাম।

লীলা বলল, এখন আপনার কথা আমার বিশ্বাস হয়।

তোমার কার সাথে বিবাহ হবে সেইটাও আমি জানি। বলব ?

না। আমার ভবিষ্যৎ জানতে ইচ্ছা করে না।

রমিলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমারো জানতে ইচ্ছা করে না।

রমিলা খাওয়া বন্ধ করে লীলার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। লীলা বলল, কী দেখেন ?

রমিলা বললেন, তোমার খাওয়া দেখি গো মা। তোমার খাওয়া সুন্দর। খাওয়া নিয়া একটা সিমাসা শুনবা ?

লীলার কোনো সিমাসা শুনতে ইচ্ছা করছে না। তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। তারপরেও সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

WWW.BDBANGLA.COM

রমিলা বললেন—

'পাঁচ আঙুলের নারী যখন
চাইর আঙুলে খায়
সেই নারী স্বামীর কাছে
আদর সোহাগ পায়।'

লীলা বলল, আমি কি চার আঙুলে খাই ?

রমিলা বললেন, হুঁ। তুমি তোমার স্বামীর কাছে আদর সোহাগ পাইবা। বিরাট আদর।

লীলা বলল, স্বামীর আদর পাওয়া তো ভালোই।

রমিলা বললেন, অবশ্যই ভালো। যে মেয়ে স্বামীর আদর বেশি পায় সে বাপের আদর কম পায়। আবার যে মেয়ে বাপের আদর বেশি পায় তার ভাগ্যে স্বামীর আদর নাই।

আমি বাবার আদর পাব না ?

তুমি দুইটাই পাইবা।

কীভাবে জানেন ?

তোমার থুতনিতে লাল তিল। এই নিয়াও একটা সিমাসা আছে। বলব ?

বলুন।

থুতনিতে লাল তিল
কালো তিল কানে
পিতার কোলে থাকবে নারী
সর্ব লোকে মানে।

তোমার থুতনিতে লাল তিল, আবার কানের লতিতেও কালো তিল।

লীলার খাওয়া শেষ হয়েছে। সে হাত ধুতে ধুতে বলল, আমার ধারণা আমাকে দেখে দেখে এইসব সিমাসা আপনি বানাচ্ছেন। এই ধরনের সিমাসা আসলে নাই।

রমিলা হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কথা সত্য বলেছ। এমন সিমাসা নাই। তোমার বেজায় বুদ্ধি। তয় তোমার বাপের মতো না।

আপনার ধারণা বাবার অনেক বুদ্ধি ?

অবশ্যই। তোমার বাপ সবেরে পুতুলের মতো চালায়। কেউ বুঝতে পারে না।

আমার মা'কে কিন্তু বাবা পুতুলের মতো চালাতে পারে নাই।

তোমার মায়ের দিকে তোমার বাবার ভালোবাসা ছিল অনেক বেশি। যার দিকে ভালোবাসা বেশি থাকে তার উপরে বুদ্ধি কাজ করে না। এই বিষয়ে একটা সিমাসা আছে, শুনবা ?

আপনার বানানো সিমাসা আমি আর শুনব না।

রমিলা আবারো হাসি শুরু করেছেন। হাসতে হাসতে আবারো তার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি হাসির ফাঁকে ফাঁকে বললেন, তুমি তোমার বাপরে বলো আমারে যেন আটকায়ে রাখে। মাথা জানি কেমুন করতেছে— হাসিটা বেশি হইছে। হি হি হি। একদিনে বেশি হাসছি— হি হি হি। এখন কান্দন শুরু হইব— হি হি হি।

সিদ্দিকুর রহমান আনিসের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে একটা অতি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আনিসকে তিনি বাড়িতে রেখে দেবেন না-কি ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে পাঠাবেন ? সতীশ ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। ডাক্তারের ধারণা রোগীর সময় শেষ। আত্মীয়স্বজনকে খবর দেয়া দরকার।

রোগীকে দেখেও সেরকমই মনে হচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। সারাক্ষণ হা করে আছে। বুক উঠানামা করছে।

হাসপাতালে পাঠানো সমস্যা না। গরুর গাড়ি তৈরি আছে। এখান থেকে গরুর গাড়িতে নান্দাইল রোড স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে ময়মনসিংহ। মাঝখানে গৌরীপুরে ট্রেন বদল। ঝামেলা আছে। রোগীর যে অবস্থা পথেও কিছু ঘটে যেতে পারে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, রোগীকে ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কেমন হয় ?

সতীশ ডাক্তার বলল, নিতে পারেন কিন্তু লাভ হবে না।

যেখানে জীবন-মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে লাভ-লোকসানের বিচার করা কি উচিত ?

সতীশ ডাক্তার চুপ করে গেল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তৈরি হয়ে নাও। তুমি সঙ্গে যাবে।

সতীশ ডাক্তার হড়বড় করে বলল, আমি তো যেতে পারব না। আমার বিরাট ঝামেলা আছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ। বিরাট ঝামেলা তো থাকবেই। ঝামেলামুক্ত জীবনযাপন করে শুধু পশু। তুমি তো পশু না।

সতীশ ডাক্তার বলল, আমার সাথে আর কে যাবে?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি যাব। এই রোগী ভরসা করে অন্য কারো হাতে ছাড়তে পারব না।

সতীশ ডাক্তার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সিদ্দিকুর রহমান সহজ গলায় বললেন, এই মাস্টারের প্রতি আমার বিরাট মমতা তৈরি হয়েছে, সেই কারণে তাকে নিয়া নিজেই রওনা হয়েছি তা না। এত মমতা মানুষের প্রতি আমার নাই। কী জন্যে তাকে নিয়া যাচ্ছি শুনতে চাও?

সতীশ ডাক্তার হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমার মেয়ে লীলা তাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছে। এই ভরসায় এসেছে যে আমি মাস্টারের জন্যে যা করার করব। রোগীকে আমার কাছে নিয়ে আসার পরেই দেখলাম, আমার মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরাফিরা করতেছে। খাওয়া-দাওয়া করেছে। সে তার মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। যে মেয়ে আমার প্রতি এতটা ভরসা করেছে, তার সেই ভরসা কি আমি ছোট করতে পারি?

কিছু না বুঝেই সতীশ মাস্টার বলল, না।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, চলো তাহলে রওনা দেই। তোমাকে আধাঘন্টা সময় দিলাম। বাড়িতে যাও, তৈয়ার হয়ে আসো।

বিডিবাংলা ডট কম

লীলাবতীর হাতের লেখা গোটা-গোটা। প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট। একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িয়ে নেই। মনে হতে পারে, সে প্রতিটি অক্ষর আলাদা করে লেখে এবং লিখতে সময় লাগে। আসলে তা না। সে অত্যন্ত দ্রুত লেখে। কিছুদিন পর-পর হঠাৎ করে তার লিখতে ইচ্ছা করে। লেখার ইচ্ছাটা যেমন হঠাৎ আসে সেরকম হঠাৎই চলে যায়। খাতা-কলম নিয়ে বসার পেছনে লীলার মায়ের বেশ বড় ভূমিকা আছে। মা'র মৃত্যুর অনেক পরে ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে গিয়ে লীলা তার মা'র লেখা কিছু কাগজপত্র পেয়েছে। ছোট ছোট টুকরো কাগজ। মজার মজার সব লেখা। কোনোটা চার-পাঁচ লাইন, কোনোটা আবার দেড়-দুই পাতা। কিছু লেখার শুরু আছে, শেষ নেই। সাংকেতিক ভাষায় লেখা কিছু কাগজও আছে। সেখানে সংকেত উদ্ধার কীভাবে করতে হবে তাও লেখা। যেমন এক জায়গায় লেখা—

> ইহা সাংকেতিক পত্র। পড়িবার নিয়ম— যে অক্ষর পাঠ করিবেন তাহার আগের অক্ষর ধরিতে হইবে।

উদাহরণ,

> 'খড়িয'— ইহার অর্থ করিম। 'খ' হইবে 'ক', 'ড়' হইবে 'র', 'য' হইবে 'ম'।

লীলা প্রতিটি লেখা পড়ে খুবই মজা পেয়েছে। লেখাগুলি সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে পড়ে। কিছু কিছু সাংকেতিক চিঠির অর্থ সে উদ্ধার করতে পারে নি। যেমন একটা লেখা এরকম—

> 'মত ৪০ নত ২৭ যত ১১
> পিতা ৯৩২ মাতা ০৭ ভগ্নি ১২
> অতঃপর ০০১২০৩৪০০৯৯২১
> পক্ষী ৫ স্বর্গ ৩ আকাশ
> ১১-৩১-৫১-৯১-১৮
> ...'

সাংকেতিক লেখার অর্থ উদ্ধারের কোনো সূত্রও মহিলা রেখে যান নি। লীলার ধারণা কোনো একদিন সাংকেতিক লেখার অর্থ তাঁর মেয়ে উদ্ধার করবে এমন আশা নিয়েই সংকেতগুলি তৈরি করা। সে যেমন আগ্রহ করে মা'র লেখা পড়েছে, একদিন তার মেয়েও সেরকম আগ্রহ করে লীলার লেখা পড়বে। যখন লীলা লিখতে বসে তখন এই ব্যাপারটা তার মাথায় থাকে। এমন কিছু লেখা যাবে না যা পড়ে তার মেয়ে মন-খারাপ করে। একবার লেখা শুরু হয়ে যাবার পর আর মেয়ের কথা লীলার মনে থাকে না।

মেঘলা সকাল। জানালা দিয়ে সামান্য আলো আসছে। পর্দা সরিয়ে দিলে কিছু আলো পাওয়া যেত। লীলা পর্দা সরায় নি। আধো আলো আধো অন্ধকারেই তার লিখতে ভালো লাগে। সে লিখছে—

গতকাল রাতে আমার খুব ভালো ঘুম হয়েছে। অথচ ভালো ঘুম হবার কথা ছিল না। আমার ঢাকায় যাবার কথা ছিল। আমি ঢাকায় না গিয়ে আবারো বাবার বাড়িতে ফিরে এসেছি। সঙ্গে করে এক রোগীকে নিয়ে এসেছি। ভদ্রলোক স্থানীয় এক কলেজের শিক্ষক। তাঁর নাম আনিস। ভদ্রলোক কুঁজো হয়ে হাঁটেন বলে তাঁর নাম 'কুঁজা মাস্টার'। এই নামেই সবাই তাঁকে ডাকে।

বাড়িতে তাঁকে ফিরিয়ে আনা ঠিক হয় নি। কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাঁর শরীর এখন ভয়ঙ্কর খারাপ। জ্বর একশ' চার-একশ' পাঁচের মধ্যে। মাথায় পানি ঢাললে জ্বর কিছু কমে। পানি ঢালা বন্ধ করলেই হুট করে বেড়ে যায়। রাতেই ডাক্তার ডেকে আনা হয়েছে। ডাক্তার রোগী দেখে বলেছেন, অবস্থা ভালো না। আজ রাতেই ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ডাক্তাররা এ ধরনের কথা বললে আতঙ্কগ্রস্ত হতে হয়। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ডাক্তারের ভয়ঙ্কর কথা শোনার পরও কেউ আতঙ্কগ্রস্ত হলো না। পরে আসল রহস্য জানলাম। এই ডাক্তার (সতীশ পাল) নাকি নিদান ডাক্তার। রোগীর অবস্থার সামান্য উনিশ-বিশ দেখলেই তিনি নিদান ডাকেন। অর্থাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, রোগী টিকবে না। যাদের সম্পর্কে তিনি এ-ধরনের কথা বলেছেন তারা কেউই না-কি মারা যায় নি। বরং যাদের সম্পর্কে নিদান ডাকা হয় নি তাদের কেউ-কেউ চলে গেছে। নিদান ডাক্তার সতীশবাবু যে-রোগী সম্পর্কে বলেন রোগী টিকবে না সেই রোগীর আত্মীয়স্বজনরা না-কি খুবই খুশি হন। হাস্যকর সব কাণ্ড! তবে সবার কথাবার্তায় আমি মজা পেয়েছি। ডাক্তার সাহেবের একটা ব্যাপার আমার ভালো লেগেছে— তিনি রোগীকে রেখে চলে যান নি। রোগীকে সঙ্গে নিয়ে ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে গেছেন। সবচে' যেটা অদ্ভুত, আমার বাবাও সঙ্গে গেছেন। এই বিষয়ে পরে লিখব।

খুব ক্লান্ত ছিলাম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। ভেবে রেখেছিলাম গরম পানি দিয়ে গোসল করেই সরাসরি বিছানায় চলে যাব, তখন শুনলাম আমার মা আমার জন্যে রান্না করেছেন। কাজেই খিদে না থাকলেও খেতে বসতে হবে। আমি খুব সহজেই লিখলাম 'আমার মা', আসলে লেখা উচিত 'আমার সৎমা'। সৎমা শুনতে ভালো লাগে না, লিখতেও ভালো লাগে না। এরচে' সরাসরি মা লেখাই ভালো। এই মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, বেশির ভাগ সময় তিনি আমার সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন। আমাদের দু'জনের যখন কথাবার্তা হয় তখন বাইরে থেকে শুনে কারোর বোঝার সাধ্য নেই যে তিনি অসুস্থ। এই মহিলার কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে বলেও আমার মনে হয়। মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের কিছু কথা বলেন। সেগুলি ফলে যায়। কাকতালীয় হতে পারে। আবার নাও হতে পারে।

আমার এই মা গতরাতে কাঁঠালের বিচি দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করেছেন। কাঁঠালের বিচি তরকারি হিসেবে আমার খুব অপছন্দ। মানুষ কাঁঠাল যখন খায় তখন কাঁঠালের বিচিটা মুখে থাকে। মুখ থেকে বের করে। যে-জিনিসটা একজনের মুখ থেকে এসেছে সেটা খেতে আমার ঘেন্না করে। আমি খেতে বসলাম। মা নিজেই ভাত বেড়ে দিলেন। তরকারির বাটিতে চামচ ডুবিয়ে তিনি থমকে গেলেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, মা, তুমি কাঁঠালের বিচি খাও না। তাই না ? আমি বললাম, আপনি কী করে বুঝলেন ?

তিনি তাঁর জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, আমি মাংস আর ঝোল দিয়ে খাব। তিনি বললেন, না। তুমি একটু বসো, আমি ডিমের সালুন রান্না করে দিব। আমার সময় লাগবে না।

এই মহিলাকে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। আজ দেখি তিনি স্বাধীন মানুষের মতো চলাফেরা করছেন। তবে তাঁকে যে দূর থেকে লক্ষ করা হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারছি। বাবা লক্ষ করছেন। সুলেমান নামের বডিগার্ড ধরনের একজন কর্মচারী, সেও লক্ষ করছে।

রান্না করার সময় তিনি সহজ-স্বাভাবিক মানুষের মতো টুকটাক গল্প করতে লাগলেন। কী সুন্দর গল্প বলার ভঙ্গি! হাত নাড়ছেন, শরীর দোলাচ্ছেন।

বুঝছো মা, আমার একটা ছোট ভইন ছিল। তার নাম চঞ্চলি। চঞ্চল ছিল, এইজন্যে নাম চঞ্চলি। আমরা দুই ভইন পুষকুনির পাড়ে গিয়েছি, তখন হঠাৎ আমার পা পিছল খাইল। আমি পড়ে গেলাম পানিতে। সাঁতার জানি না। ডুইবা যাইতেছি, তখন চঞ্চলি আমারে বাঁচানোর জন্যে লাফ দিয়া পানিতে পড়ল। আমি ঠিকই পানি থেকে উঠলাম, চঞ্চলি উঠল না। তবে তারে আমি প্রায়ই দেখি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কোথায় দেখেন ?

আমার আশেপাশে দেখি। আমার বিছানায় বসে আমার সাথে গফসফ করে। হাসে। একবার সারা রাইত আমার সাথে শুইয়া আছিল।

এখন কি উনি আশেপাশে আছেন ?

না এখন নাই। কেউ ধারেকাছে থাকলে আসে না। লজ্জা পায়।

আমি বললাম, মা, আপনি যা দেখেন সেটা চোখের ভুল। মৃত মানুষের ফিরে আসার ক্ষমতা থাকে না।

উনি আমার এই কথাটা খুব শান্ত ভঙ্গিতে শুনলেন। তারপর বললেন, হইতে পারে, আমি পাগল-মানুষ। পাগল-মানুষের তো কোনো দিশা থাকে না।

আমি আপনার চিকিৎসা করাতে চাই। ভালো চিকিৎসা। ঢাকায় নিয়ে আপনাকে বড় বড় ডাক্তার দেখাব। প্রয়োজনে দেশের বাইরে নিয়ে যাব। আপনার আপত্তি আছে ?

আছে। আপত্তি আছে গো মা।

আপত্তি কেন ?

ভালো হয়ে গেলে চঞ্চলিরে আর দেখব না।

উনাকে হয়তো দেখবেন না। কিন্তু তার বদলে ভালো ভালো অনেক কিছু দেখবেন।

ভয়ঙ্কর খারাপ জিনিস দেখেছি গো মা। ভালো কিছু আমার দেখতে ইচ্ছা করে না।

ভয়ঙ্কর খারাপ কী দেখেছেন ?

বলব। তোমারে একদিন বলব। কোনো-একজনরে বলতে ইচ্ছা করে।

এখনি বলুন, পরে আপনার মনে থাকবে না।

মনে থাকবে।

ডিমের তরকারি দিয়ে ভাত খেলাম। তিনি পাশে বসে খাওয়ালেন এবং সারাক্ষণই পিঠে হাত দিয়ে রাখলেন। এত মমতায় তিনি কি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েকে কোনোদিন খাইয়েছেন ? এই সুযোগ তাঁর পাওয়ার কথা না।

লীলা!

জি ?

মাগো, খেয়ে মজা পাইতেছ ?

পাচ্ছি।

চালতা দিয়ে ছোট মাছের তরকারি আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি। তোমারে রাইন্ধা খাওয়াব। ইনশাল্লাহ্।

আচ্ছা।

আমার আরেকটা শখ আছে মা। পাগল-মাইনষের শখ। শখটা তুমি পূরণ করবা ?

অবশ্যই করব। আপনি বলুন কী শখ ?

একটা রাইত আমার সঙ্গে থাকবা। দু'জনে বিছানায় শুইয়া সারারাত গফসফ করব।

অবশ্যই। আপনি যদি বলেন আমি আজই আপনার সঙ্গে ঘুমুতে পারি।

ভয় লাগবে না ?

ভয় লাগবে কেন ?

আমি পাগল-মানুষ। ঘুমের মধ্যে আমি যদি তোমার গলা চাইপ্যা ধরি ?

না, আমার ভয় লাগবে না।

মহিলা খিলখিল করে হাসতে শুরু করলেন। হাসি আর থামেই না।

এই মহিলা প্রায়ই 'সিমাসা' বলেন। সিমাসা হলো ধাঁধা। যেমন—

ভোলা মিয়ার শয়তানি
বাইরে লোহা ভিতরে পানি।

এর অর্থ হলো নারিকেল। আমার মা হলেন সিমাসা রানি। তিনি অসংখ্য সিমাসা জানেন। আবার সিমাসা মুখে মুখে তৈরিও করতে পারেন।

যাই হোক, রাতে আমি আমার নিজের ঘরে ঘুমুতে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে ফিরে আসার পর আমার কোনো কথা হয় নি। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি, তিনি আমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন আমি নিজেই তাঁর কাছে যাব। আমি যাই নি। তিনিও আমাকে ডাকেন নি। হয়তো আমাকে ডাকতে তাঁর অহঙ্কারে বেধেছে। এখন সমস্ত অহঙ্কার একপাশে ফেলে নিজেই এসেছেন। আমি বললাম, বাবা, কিছু বলবেন ? তিনি বললেন, না। তিনি আমার ঘরে রাখা চেয়ারে বসলেন। আমি বললাম, বাবা আপনি খেয়েছেন ? তিনি না-সূচক মাথা নাড়লেন। আমি বললাম, আমি তো জানি না যে আপনি এখনো খান নি। তিনি বললেন, জানলে কী করতে ?

জানলে আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতাম।

তিনি বললেন, আমার একা একা খাওয়ার অভ্যাস।

আমি বললাম, আমি যে-কয়দিন আপনার সঙ্গে থাকব আপনি আমার সঙ্গে খাবেন। বাবা কিছু বললেন না কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি খুশি হয়েছেন। খুশির ভাবটা চাপতে চেষ্টা করছেন। চাপতে পারছেন না। আমি বললাম, রাত অনেক হয়েছে, খেতে চলুন। বলেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি ঘুমাও। আমি বললাম, আপনার খাওয়া হোক, তারপর ঘুমাব। আপনি যখন খাবেন আমি সামনে বসে থাকব।

বাবার খাবার সময় আমি পাশে বসে রইলাম এবং একটা কাণ্ড করে তাঁকে পুরোপুরি হকচকিয়ে দিলাম। খাবার সময় মা যেভাবে আমার পিঠে হাত রেখেছিলেন আমি ঠিক তা-ই করলাম। বাবার পিঠে হাত রাখলাম। আমি ভেবেছিলাম তিনি খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকাবেন। তিনি তা করলেন না। যেভাবে খাচ্ছিলেন সেইভাবেই খেয়ে গেলেন। খাওয়া শেষ করে মুখে পান দিলেন। সুলেমান এসে তাঁর হাতে হুক্কা ধরিয়ে দিল। তিনি হুক্কার নলে টান দিচ্ছেন। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। হুক্কার শব্দটা যে এত মজার তা আগে লক্ষ করি নি। শব্দটার মধ্যে ঘুমপাড়ানি ভাব আছে। আমার মনে হচ্ছে, বিশাল খাটটার একপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ভালো লাগত।

লীলা!

জি ?

ঘুম পাচ্ছে মা ?

জি।

তাহলে ঘুমাও। আরাম করে ঘুমাও। এই খাটে তোমার মা ঘুমাত।

বাবার এই কথা আগেও একবার শুনেছি। সেবার বিস্মিত হয়েছিলাম। আজ হঠাৎ বলে ফেললাম, শুধু মা ঘুমান নি। মা'র পরে আরো একজন ঘুমিয়েছেন। কথাটা বলেই আমার মনে হলো আমি কাজটা ঠিক করি নি। এই কথাটা না বললেও চলত। আমি লক্ষ করলাম বাবার হুক্কা টানা বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর মুখের চামড়া একটু যেন শক্ত হয়ে গেল। তিনি হুক্কার নল একপাশে রেখে শরীর ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। বড় করে নিঃশ্বাস টেনে কথা বলা শুরু করলেন— লীলা শোনো। তোমার মা'র মৃত্যুর অনেক দিন পরে আমি বিবাহ করি। তোমার মা এবং আমি যে-খাটে ঘুমাতাম, সেই খাটটা খুলে রেখে দেয়া হয়েছিল। তুমি আসার পর খাটটা জোড়া লাগানো হয়েছে। তুমি বিষয়টা লক্ষ করো নাই। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মানুষদের সমস্যা কী জানো মা ? তাদের প্রধান সমস্যা...

এই পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। হুক্কার নলটা টানতে শুরু করলেন। আবারো ঘুম-পাড়ানি গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। আমি বললাম, আপনি আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। তিনি বললেন, যাও, ঘুমাতে যাও। তিনি এখন আর মায়ের খাটে আমাকে ঘুমুতে বললেন না। প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পাল্টাবার জন্যেই হয়তো বললেন, আনিস ছেলেটাকে নিয়ে চিন্তিত আছি। ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তুমি ভালো করেছ না মন্দ করেছ বুঝতে পারছি না। নিতান্তই পল্লীগ্রাম, চিকিৎসার সুব্যবস্থাও নাই।

আমি বললাম, উনাকে নিয়ে ঢাকা পর্যন্ত যাবার অবস্থা ছিল না।

মা যেমন আমার পিঠে হাত রেখে আমাকে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন, বাবা এখন তা-ই করলেন, এমন একটা কথা বললেন যে আমি নিজে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। তিনি হঠাৎ হুক্কা টানা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন— শান্ত গলায় বললেন, এই ছেলেটাকে কি তোমার পছন্দ ?

আমি জবাব দিলাম না। বাবা বললেন, অনেক সময় মানুষ তার নিজের পছন্দের কথা নিজে বুঝতে পারে না। বোকাদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে না। বোকারা খুব ভালোমতো জানে কোনটা তার পছন্দ, কোনটা তার পছন্দ না। মাসুদের কথা ধরো। সে ভালোমতো জানে পরীবানু নামের মেয়েটাকে তার পছন্দ। এই মেয়েটার জন্যে যা-কিছু মানুষের পক্ষে করা সম্ভব তা সে করবে। মাসুদ যদি তোমার মতো অতি বুদ্ধিমান কেউ হতো তাহলে সে তার পছন্দের ব্যাপারটা ধরতে পারত না। তার মাথার মধ্যে নানান হিসাব-নিকাশ খেলা করত।

আপনার ধারণা আমার খুব বুদ্ধি ?

হ্যাঁ, আমার তা-ই ধারণা।

আমি বললাম, অসুস্থ মানুষটাকে দেখে আমার খুব মায়া লেগেছে। পছন্দ বলতে এইটুকুই। আপনি যে-অর্থে পছন্দের কথা বলছেন— সেই অর্থে না।

বাবা বললেন, না হলেই ভালো।

না হলেই ভালো কেন ?

অপদার্থ ধরনের ছেলে। অপদার্থ মানুষরা তাদের আশেপাশের মানুষকেও অপদার্থ বানিয়ে ফেলে। তাছাড়া তার মাথাও কিঞ্চিৎ খারাপ বলে আমার ধারণা।

আপনার এরকম ধারণার পেছনে কারণ কী ?

চোখের চাউনি দেখে মনে হয়েছে। পাগলদের চোখের চাউনি সাধারণ মানুষের মতো না। পাগলদের দৃষ্টি আমার মতো ভালো কেউ জানে না। এই প্রসঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই। যাও, ঘুমাতে যাও। আমার মনটা আজ কিঞ্চিৎ খারাপ। কিঞ্চিৎ না, একটু বেশিই খারাপ। মন-খারাপ নিয়ে আমি কথা বলতে পারি না।

মন-খারাপ কেন ?

বাবা চাপা গলায় বললেন, সুলেমান আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছে। এটা জানতে পেরেছি বলেই মন-খারাপ। এরা আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে— কথা গোপন করবে, এটা আমি কল্পনাও করি নি।

আমি বললাম, কী কথা গোপন করেছে ?

বাবা শান্ত গলায় বললেন, মাসুদ পরীবানু মেয়েটিকে গোপনে বিবাহ করেছে। মৌলানা ডেকে বিবাহ। এই ঘটনা সুলেমান-লোকমান দু'জনই জানে। কিন্তু কেউ আমাকে কিছু বলে নাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি কি নিশ্চিত মাসুদ বিয়ে করেছে ?

হুঁ। ব্যাপারটা সবাই জানে। শুধু আমি জানি না। আনিস মাস্টারও জানে।

আপনি এখন কী করবেন ?

আমার কী করা উচিত ?

পরীবানুকে বাড়িতে নিয়ে আসা উচিত।

কথাটা চিন্তা-ভাবনা করে বলেছ ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। বাবা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তিনি কী দেখার চেষ্টা করছেন ? আমার চোখে উন্মাদের দৃষ্টি আছে কি না ?

তুমি বলতে চাচ্ছ পরীবানু মেয়েটিকে এই বাড়িতে নিয়ে আসা উচিত ?

জি।

আর মাসুদের ব্যাপারে কী করণীয় ? আচ্ছা থাক, এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। তুমি ঘুমাও। ফি আমানিল্লাহ্। দরজার খিল লাগায়ে শুয়ে পড়ো। একা ভয় পাবে না তো ?

জি না।

রমিলা মাঝেমধ্যে খুব চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ তার চিৎকার শুনলে ভয় পেতে পার।

আমি ভয় পাব না।

বাবা খাট থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তোমার উপর দায়িত্ব দিলাম এই বাড়িতে পরীবানুকে আনার। পরীবানুর দায়িত্ব তোমার। মাসুদের দায়িত্ব আমার।

বাবা চলে গেলেন। তখনো আমি জানি না যে আনিস সাহেবকে নিয়ে বাবা নিজেই ময়মনসিংহ রওনা হয়েছেন। এটা আমি জানলাম পরদিন সকালে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এখন আমি আমার ভাই মাসুদ সম্পর্কে কিছু বলি। প্রথমে চেহারার বর্ণনা— সুপুরুষ। স্বাস্থ্য ভালো। চোখ বড় বড় (আমার বাবার চোখও বড় বড়, এটা মনে হয় আমাদের পারিবারিক বিশেষত্ব। সবার চোখ বড় বড়)। মাথার চুল কোঁকড়ানো।

স্বভাব— কথা কম বলে। কারো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। তাকে দেখলেই মনে হয় কোনো ভয়ে সে অস্থির হয়ে আছে। কথা বলার সময় সে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাবে। ভীতু প্রকৃতির ছেলে, তবে গলার স্বর ভারী এবং গম্ভীর। সে গান-বাজনা কেমন শিখেছে জানি না, তবে সে শিস বাজিয়ে পাখিদের শিসের নকল করতে পারে। তার শিস বাজানোর সুন্দর একটা ঘটনা বলি। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে শহরবাড়ি যাচ্ছি। একটা বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ। হঠাৎ মাসুদ বলল, বুবু, একটা মজা দেখবে ?

আমি বললাম, কী মজা ?

মাসুদ হাত মুখের কাছে ধরে শিস দিতে লাগল। বুলবুলি পাখি যেরকম শিস দেয় সেরকম শিস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বুলবুলি পাখি শিস দিতে লাগল। তারপর আরো কয়েকটা। আমি অবাক। মাসুদ বলল, বুবু, আমি ঘুঘু পাখির ডাক ডাকতে পারি। আমি যখন ঘুঘুর ডাক ডাকি, তখন বনের ঘুঘুও ডাকে।

বাবা বাড়িতে নেই, ময়মনসিংহ গিয়েছেন— এই খবর পেয়েই মনে হয় মাসুদ বাড়িতে উপস্থিত। এমনভাবে সে হাঁটাহাঁটি করছে যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। মুখভর্তি পান। পান চিবিয়ে বেশ কায়দা করে পানের পিক ফেলছে। আমি বললাম, মাসুদ, তুমি না-কি বিয়ে করেছ ?

মাসুদ পানের পিক ফেলে বলল, করতেও পারি।

আমি বললাম, করতেও পারি আবার কী ? হয় বলো করেছি অথবা বলো করি নাই।

মাসুদ বলল, আমি অধিক কথা বলি না।

আমি বললাম, বাবা খুব রাগ করেছেন।

মাসুদ বলল, আমি এইসব কেয়ার করি না।

সে যে সত্যিই কেয়ার করে না এটা বুঝাবার জন্যেই বোধহয় ছিপ নিয়ে মাছ মারতে গেল। সেই মাছ মারার আয়োজনও বড়। একজন গেল তার মাথায় ছাতি ধরার জন্যে। একজন গেল হারমোনিকা বাদক। একজন ঢোল নিয়ে গেল।

ঘটনা কী হচ্ছে দেখতে গেলাম। দেখি মচ্ছব বসে গেছে। মাসুদের মাথার উপর চাঁদোয়া টানানো হয়েছে। কনসার্ট হচ্ছে, হারমোনিকা বাজছে, বাঁশি বাজছে, ঢোল-তবলা বাজছে। দলে মঞ্জুমামাও উপস্থিত। তাঁর হাতে খঞ্জনি। তিনি মহানন্দে মাথা দুলিয়ে খঞ্জনি বাজাচ্ছেন।

মাসুদ ভালোই বাড়াবাড়ি করল, দুপুরে খাসি কিনে আনতে লোক পাঠাল। তার না-কি খিচুড়ি এবং খাসির মাংস খেতে ইচ্ছা করছে। এই মাংস সে নিজেই রাঁধবে।

রাঁধুক। তার যা ইচ্ছা সে করুক। আমাদের সবার জগৎ আলাদা। মাসুদের জগৎ মাসুদের। আমারটা আমার।

বিডিবাংলা ডট কম

মাসুদ একটা কাঠবাদাম গাছের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাঠবাদাম গাছের পাতা বড় বড়— ছায়াময়। সে তার মাথা ছায়ায় রেখে শরীর রোদে মেলে দিয়েছে। শীতকালের রোদের চিড়বিড়ানি সমস্যা থাকলেও রোদ আরামদায়ক। আরামে মাসুদের ঘুম এসে যাচ্ছে। সে ঠিক করেছে কিছুক্ষণ ঘুমাবে। দুপুরে চাপ খাওয়া হয়েছে, এখন দরকার ঘুম। অজগর সাপের মতো ঘুম। অজগর সাপ আস্ত ছাগল গিলে একনাগাড়ে সাতদিন ঘুমায়। সেও এখন অজগর।

ঘুমের আগে আগে নানান চিন্তা করতে তার ভালো লাগে। বেশির ভাগ চিন্তাই থাকে পরীবানুকে নিয়ে। যেমন সে তার নতুন কেনা হারকিউলিস সাইকেলে করে ধর্মপাশা যাচ্ছে। সাইকেলের পেছনে বসেছে পরীবানু। সাইকেল যাচ্ছে শাঁ শাঁ করে। পরীবানু আতঙ্কে চিৎকার করছে— আস্তে চালাও, আস্তে। সে পরীবানুর কোনো কথাই শুনছে না। সাইকেলের গতি আরো বাড়াচ্ছে। একসময় সাইকেল থেকে মোটর গাড়ির মতো ভটভট শব্দ হতেও শুরু করেছে। সাইকেল হয়ে গেল মোটরসাইকেল।

চিন্তার মধ্যে যাত্রাদলের দৃশ্যও থাকে। যাত্রাদলের নাম নিউ অপেরা পার্টি। যাত্রাদলের অধিকারী এবং প্রধান অভিনেতা সে নিজে। পরী করে সামান্য সখির পার্ট। পরীর জীবনের প্রধান ইচ্ছা যাত্রাদলের মূল অভিনেতা মাসুদ সাহেবের সাথে একটা পার্ট করা। লজ্জায় সে তার মনের গোপন কথা কাউকে বলতে পারে না। শুধু চোখের পানি ফেলে। একদিন এই দৃশ্য সে দেখে ফেলল। মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, কাঁদো কেন ? তোমার অন্তরে কিসের যাতনা ?

মেয়েটা গানের সুরে বলল—

'আমার কথা আমি জানি না
জানে বনের পাখি
আমার কষ্ট হয় না পষ্ট
আমারে দেয় ফাঁকি।'

মাসুদের আজকের চিন্তায় পরীবানু নেই। আজকের চিন্তায় আছে মাসুদের বাবা সিদ্দিকুর রহমান সাহেব। চিন্তাটা চলে যাচ্ছে খারাপ দিকে। বাবাকে নিয়ে

খারাপ চিন্তা করা ঠিক না। কিন্তু মাসুদ চিন্তাটাকে আটকাতে পারছে না। মাসুদ কল্পনায় দেখছে, তার বাবা ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে। কুঁজা মাস্টারকে হাসপাতালে ভর্তি করে তিনি হাসপাতালের বাইরে এসে সিগারেট ধরালেন। সতীশ ডাক্তারকে পাঠালেন জর্দা দিয়ে পান নিয়ে আসতে। সতীশ ডাক্তার পান আনতে গেল। সিদ্দিকুর রহমান সিগারেটে টান দিলেন, এই সময় তাঁর শুরু হলো বুকে ব্যথা। তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তাকে ধরাধরি করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেখার দায়িত্ব এখন থেকে আমার একমাত্র পুত্র মাসুদের। তাকে খবর দিয়ে আনো। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাকে কিছু উপদেশ দিব। আমার সময় শেষ। বলতে বলতেই মৃত্যু। চারদিকে বিরাট হৈচৈ, কান্নাকাটি।

বাবার মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করতে অস্বস্তি লাগায় মাসুদ তার চিন্তাটাকে সামান্য ঘুরিয়ে দিল। নতুন চিন্তায় তিনি মারা গেলেন না তবে তাঁর পক্ষাঘাত হলো। সমস্ত শরীর অবশ। কথাও পরিষ্কার বলতে পারেন না। কিছু কথা বোঝা যায়, কিছু যায় না। তাঁকে খাটিয়াতে করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন— এখন থেকে যাবতীয় কাজ-কর্ম দেখবে আমার একমাত্র পুত্র মাসুদুর রহমান। আমি যেহেতু বেশিদিন বাঁচব না, সেই কারণে ধুমধাম করে পুত্রের বিবাহ দিতে চাই। স্যাকরা খবর দিয়ে আনো। আমি আমার পুত্রবধূ পরীবানুকে গয়না দিয়ে মুড়ে দিব। দাড়িপাল্লায় ওজন করে সোনা দিব। দাড়িপাল্লার একদিকে থাকবে পরীবানু আরেক দিকে সোনা।

মাসুদ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাল। ঘুম থেকে উঠে খোঁজ নিল তার বাবা ফিরেছেন কি-না। জানা গেল তিনি ফিরেন নাই। মাসুদ তখন বাজারের দোকান থেকে তার সাইকেল বের করল। এই সাইকেল সে গত বছর গোপনে কিনেছে। লুকিয়ে রেখেছে বাজারের দোকানে। আজ সাইকেল বের করার শুভ দিন। সাইকেলে ডায়নোমো বসানো লাইট আছে। ডায়নোমার একটা অংশ ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই বাতি জ্বলে। বাতির খুবই পাওয়ার। দিনের মতো আলো হয়ে যায়। সাইকেলের ঘণ্টাও সুন্দর। জলতরঙ্গের মতো শব্দ হয়।

পরীবানু তার সাইকেলের ব্যাপারটা জানে না। সাইকেল নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কি-না— এই বিষয়েও মাসুদ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। মনে হয় যাওয়াটা ঠিক হবে না। পরীবানুর অতিরিক্ত প্রশ্ন করা স্বভাব। সাইকেল দেখে একহাজার প্রশ্ন করবে। মেয়েছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়া এক দিগদারি।

সাইকেল কিনেছ টাকা পেয়েছ কোথায় ? টাকা কি চুরি করেছ ? কী সর্বনাশ, তুমি চোর!

দিগদারি প্রশ্ন শুনতেও ভালো লাগে না, প্রশ্নের জবাব দিতেও ইচ্ছা করে না। মাসুদ পরীবানুর বাড়ির কাছাকাছি এসে সিদ্ধান্ত নিল, পরীবানুর সঙ্গে দেখা করবে না। বরং সাইকেল নিয়ে চলে যাবে ধর্মপাশা। ধর্মপাশা এখান থেকে দশ-বারো মাইল। কাঁচারাস্তা হলেও ডিসট্রিক বোর্ডের সুন্দর সড়ক। খানাখন্দ কম। সাইকেল নিয়ে একটানে চলে যাওয়া যাবে।

ধর্মপাশায় গুনীন সুরুজ মিয়া থাকেন। তন্ত্র-মন্ত্রের সাগর। জানেন না হেন জিনিস নেই। কোনো মুসলমানের কালী সাধনা থাকে না। উনার কালী সাধনাও আছে। মাসুদ কয়েকবারই তার কাছ থেকে জিনিসপত্র নিয়েছে। ফল পাওয়া গেছে। উনার মন্ত্র পড়া সুরমার নাম-ডাক আছে। এই সুরমা চোখে মেখে কঠিন হাকিমের সামনে দাঁড়ালে ঘটনা ঘটে। হাকিম যখন সুরমা দেয়া চোখের দিকে তাকান তখনই একশান হয়, হাকিমের দিল নরম হয়। যতবার তাকাবেন ততবার দিল নরম হবে। গুনিন সুরুজ মিয়ার সুরমা চোখে দিয়ে অনেক খুনের আসামি খালাস পেয়ে গেছে।

মাসুদ পড়া সুরমার জন্যে সুরুজ মিয়াকে দশ টাকা গত মাসের সাত তারিখ দিয়ে গেছে। অমাবস্যা ছাড়া সুরমায় মন্ত্র দেয়া যায় না। মাঝখানে অমাবস্যা গেছে। এখন ধর্মপাশা গেলে সুরমা নিয়ে আসা যাবে। মাসুদ ঠিক করে রেখেছে, এখন থেকে বাবার সামনে পড়ার আগে চোখে সুরমা দিবে। তার বাবা তো হাকিমের মতোই।

ধর্মপাশায় যাবার আরেকটি কারণ আছে। ধর্মপাশার নূর হোসেনের কাছে হারমোনিয়াম কেনার জন্যে একশ' টাকা দিয়ে রেখেছে। নূর হোসেন বাদ্য-বাজনার জিনিস ভালো চেনে। মাসুদের দরকার মেলডি কোম্পানির ডাবল রিড হারমোনিয়াম। নূর হোসেনের কলিকাতা থেকে হারমোনিয়াম আনিয়ে রাখার কথা। কলিকাতার সাথে নূর হোসেনের যোগাযোগ আছে। সে যদি হারমোনিয়াম এনে থাকে তাহলে সাইকেলের কেরিয়ারে করে নিয়ে আসবে। নয়াবাজারের দোকানে লুকিয়ে রাখবে। মাসুদের বাবা নয়াবাজারে কখনোই যান না।

আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ। ফাঁকা সড়ক। সড়কের ধুলায় চাঁদের আলো পড়েছে। চিকচিক করছে। সড়কটাকে মাসুদের মনে হচ্ছে নদীর মতো। কিছুদূর গিয়েই মাসুদের মনখারাপ হয়ে গেল। পরীবানুর জন্যে মন টানছে। এমনই মন টানছে যে পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। ধর্মপাশা আরেক দিন যাওয়া যাবে। আজ

রাতটা না হয় পরীবানুর সঙ্গে কাটুক। পরীবানু তার বিবাহিতা স্ত্রী। সে যদি পরীবানুর সঙ্গে থাকে কারো কিছু বলার নাই। সে পরীবানুর বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টা দিতে পারে। গলা উঁচিয়ে ডাকতেও পারে— পরী। পরীবানু!

মাসুদ সড়কের মাঝখানে ব্রেক কষে সাইকেল থামাল। সে অনেকদূর এসে পড়েছে। অর্ধেকের বেশি। এখন সে কী করবে ? ধর্মপাশা যাবে না পরীবানুর কাছে ফেরত যাবে ? লটারি করলে হয়। লটারিতে যেটা ওঠে সেটা। লটারি করার বুদ্ধি কী ? মাসুদ ঠিক করল, সে সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার চোখ থাকবে রাস্তার দুই দিকে। যদি সে দেখে ধর্মপাশার দিক থেকে কেউ আসছে তাহলে সে রওনা হবে ধর্মপাশা। যদি দেখা যায় নয়াপাড়ার দিক থেকে কেউ আসছে তাহলে যাবে নয়াপাড়া। রাত তেমন হয় নি কিন্তু চারদিক নীরব। রাস্তায় কোনো লোক চলাচল নেই। মাসুদ অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করতে তার খুবই ভালো লাগছে।

সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে হলো না, তার আগেই পরীবানু দরজা খুলে বের হয়ে এলো। তার হাতে কুপি। কুপির লাল আলো পড়েছে তার মুখে। কী সুন্দর যে তাকে লাগছে! সাইকেল হাতে মাসুদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে মোটেই অবাক হলো না। যেন সে জানত নিশিরাতে মাসুদ এসে উপস্থিত হবে।

মাসুদ গলা নিচু করে বলল, সবাই কি ঘুমে ?

পরীবানু বলল, হুঁ।

তোমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ ?

পরীবানু বলল, সাইকেল রেখে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে যাও। কল পাড়ে সাবান-গামছা আছে।

মাসুদ বলল, কল চাপার শব্দে তোমাদের বাড়ির লোকজনের যদি ঘুম ভেঙে যায় ?

পরীবানু বলল, ঘুম ভাঙলে ভাঙবে। তুমি কি পৃথিবীর সবাইকেই ভয় পাও ?

মাসুদ বলল, আরে না। ভয় পাব কী জন্যে ? ভাব দেখাই যে ভয় পাই। আসলে পাই না।

পরীবানু কল চাপছে। মাসুদ চোখে-মুখে পানি দিচ্ছে। পানি গরম। মাসুদ বলল, একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছ গরমের সময় টিউব কলের পানি থাকে ঠাণ্ডা আর শীতের সময় গরম। ঘটনা চমৎকার না ?

হুঁ।

তুমি এত গম্ভীর কেন ? মন কি কোনো কারণে খারাপ ?

না।

জব্বর ভুখ লাগছে। ঘরে কি চিড়া-মুড়ি আছে ?

পরীবানু জবাব দিল না। মাসুদ বলল, কিছু না থাকলে নাই। গল্প করে রাত পার করে দিব। খালি পেটে আলাপ ভালো জমে এটা জানো ?

না।

খালি পেটে আলাপ ভালো জমে, ভরা পেটে জমে ঘুম। হা হা হা। ভালো বলেছি না ?

হুঁ।

মাসুদ পরীবানুর ঘরের মেঝেতে পাতা পাটিতে বসে আছে। তার সামনে থালায় গরম ভাত। সঙ্গে বেগুন দিয়ে ডিমের সালুন। মাসুদের অতি পছন্দের জিনিস। ভাত কিছুক্ষণ আগে রান্না হয়েছে। ধোঁয়া উঠছে। ভাতের উপর গরম ঘি দুই চামচ ঢালা হয়েছে। ঘিয়ের সুঘ্রাণে মাসুদ মোহিত হয়ে গেল।

মাসুদ বলল, কে রাঁধল ? তুমি ?

পরীবানু বলল, আমার বাড়িতে কি দশটা দাসী-বান্দি আছে ?

অতি সুখাদ্য হয়েছে।

এখনো তো মুখে দেও নাই। বুঝলে কীভাবে ?

দর্শনে বুঝা যায়। পহেলা দর্শনধারী।

পরীবানু হাতে পাখা নিয়ে বসেছে। গরম ভাত পাখা নেড়ে ঠাণ্ডা করছে। তার ঠোঁটে চাপা হাসি। সেই হাসি একটু বাড়ল। শব্দময় হলো। সে সঙ্গে সঙ্গেই হাসি বন্ধ করে বলল, দর্শনে সব বোঝা যায় না। তোমাকে দেখে বোঝার উপায় নাই যে তুমি বোকা।

আমি বোকা ?

হুঁ।

মাসুদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, পরী শোনো, আমি বোকা হই আর যাই হই এখন বিরাট এক দায়িত্ব আমার হাতে।

কী দায়িত্ব ?

খাঁ বাড়ির সবকিছু এখন আমার দেখা লাগবে, উপায় নাই। বাবার অবস্থা খারাপ। পক্ষাঘাত হয়েছে, উনার নড়ার অবস্থা না।

তোমাকে বলেছে কে ?

খবর আসছে। সাইকেল নিয়া এইজন্যে টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম। পোস্টমাস্টার সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম। টেলিগ্রাফ উনার কাছে এসেছে।

পরীবানু বলল, বাবার অবস্থা কি খুবই খারাপ ?

ডাক্তাররা বলেছে উনি টিকতে নাও পারেন।

তুমি তাহলে এখানে বসে আছ কেন ? ময়মনসিংহ যাও।

যাব। কাল সকালে যাব। তোমারে খবরটা দিতে আসছি।

পরীবানু পাখা দিয়ে হাওয়া করা বন্ধ করে শান্ত গলায় বলল, সবসময় মিথ্যা বলা ঠিক না। সবসময় মিথ্যা বললে অভ্যাস হয়ে যাবে। সত্য কথা বলতে পারবা না।

মাসুদ খাওয়া বন্ধ করে আহত গলায় বলল, কোনটা মিথ্যা বললাম ? যাও কোরান মজিদ আনো। কোরান মজিদে হাত দিয়া বলব— যা বলেছি সত্য বলেছি। বসে আছ কেন ? কোরান মজিদ নিয়ে আসো।

ঝামেলা করো না। ভাত খাও।

আমি যে সত্য বলতেছি— এটা ফয়সালা না হলে ভাত মুখে দিব না। ভাত এখন আমার কাছে শিয়ালের গু।

পরীবানু বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি সত্য বলতেছ। আমার ভুল হয়েছে। মাফ চাই।

মাসুদ বলল, বাপজানের অসুখ নিয়া আমি মিথ্যা বলব না। এটা তোমার বোঝা উচিত।

পরীবানু বলল, একবার তো বলেছি ভুল করেছি। সালুন ভালো হয়েছে ?

হ্যাঁ ভালো হয়েছে। ডিমের সালুন আমার প্রিয়। অত্যধিক প্রিয়। একটা ডিম দিয়ে আমি দুই গামলা ভাত খেতে পারি।

মাসুদ খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় গেল হাত ধুতে। পরীবানু জগে করে পানি ঢালছে, মাসুদ হাত ধুচ্ছে। মাসুদের মন আনন্দে পূর্ণ। পরীবানু আশপাশে থাকলেই তার ভালো লাগে। আজ অন্যদিনের চেয়েও বেশি ভালো লাগছে। পরীবানু বলল, তোমারে একটা খবর দেওয়া হয় নাই। তোমার বাবা সন্ধ্যার সময় ফিরে আসছেন। খবর পাঠায়েছেন, আগামীকাল সন্ধ্যার পর আমাকে তুলে নেবেন।

মাসুদের মুখ হা হয়ে গেল।

পরীবানু সহজ গলায় বলল, পান দিব ?

মাসুদ জবাব দিতে পারল না। সে পরীবানুর দিকে তাকিয়ে আছে। পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। তার কিছু আলো এখনো অবশিষ্ট আছে। সেই আলোয় পরীবানুকে কী সুন্দর যে লাগছে!

পরীবানু বলল, তুমি এই বাড়িতে থাকবে, না চলে যাবে ?

মাসুদ বলল, বুঝতেছি না। আমার কী করা উচিত ?

পরীবানু বলল, তোমার নিজ বাড়িতে চলে যাওয়া উচিত।

কেন ?

তোমার বাবা হঠাৎ খোঁজ করে যদি তোমাকে না পান তাহলে মিজাজ খারাপ করবেন।

মাসুদ বলল, আমার উপরে উনার মিজাজ আর খারাপ হবে না। আমি ব্যবস্থা নিয়েছি। ধর্মপাশার সুরুজ গুনীনের পড়া সুরমা চোখে দিয়া রাখব। সঙ্গে সঙ্গে একশান।

পরীবানু হাসছে। শব্দ করেই হাসছে।

মাসুদ আহত গলায় বলল, হাসো কেন ?

পরীবানু বলল, তুমি পুলাপানের মতো কথা বলবা, আমি হাসব না!

মাসুদ বলল, পুলাপানের কথা কী বললাম ?

পরীবানু বলল, যাও বাড়িতে যাও।

মাসুদ বলল, বাড়িতে যাব না। ধর্মপাশা যাব। সুরমা নিয়া আসব। সাইকেলে শাঁ শাঁ করে চলে যাব।

নতুন সাইকেল কিনেছ ?

হুঁ।

টাকা কই পেয়েছ ?

মাসুদ বলল, টাকা-পয়সা মেয়েছেলের দেখার বিষয় না। টাকা-পয়সা নিয়া কথা বলবা না।

মেয়েছেলে কী করবে ? ভাত সালুন রানবে ?

হুঁ।

প্রতি বৎসর একটা করে সন্তান দিবে ?

কী প্যাচাল শুরু করলা ? পান দিবা বলছিলা পান কই ? সামান্য জর্দা দিও। জর্দা বিহন পান আর নুন বিহন সালুন একই।

পরীবানু বলল, তুমি যে আমাকে মিথ্যা বললা এই বিষয়ে কিছু বলবা না ?

মাসুদ কিছু বলল না। উদাস চোখে সাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

মাসুদ পান চিবাচ্ছে। আড়চোখে পরীবানুর দিকে তাকাচ্ছে। পরীবানুর মুখের ভাব দেখার চেষ্টা করছে। মাসুদ যখন মুখ ভর্তি করে পান খায় তখন যদি পরীবানু আশপাশে থাকে তাহলে একটা ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে পরীবানু তার হাত বাড়িয়ে দেয় মুখের চাবানো পানের জন্যে। এই ঘটনা আজ ঘটছে না। পরীবানু হাত বাড়াচ্ছে না। মাসুদের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে কি তার মিথ্যা কথায় রাগ করেছে ? স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে টুকটাক মিথ্যা বলবে, এতে দোষ হয় না।

পরী!

হুঁ।

পান খাবে ?

না।

রাগ করেছ না-কি ?

না, আমার শরীরে এত রাগ নাই। তাছাড়া মা কি ছেলের উপর রাগ করতে পারে ?

মাসুদ হতভম্ব গলায় বলল, মা কে ? আর ছেলে কে ?

পরীবানু হাসতে হাসতে বলল, আমি মা, তুমি ছেলে। মনে নাই তুমি আমাকে মা ডাকলা ? পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলা ?

রাগে মাসুদের গা জ্বলে যাচ্ছে। ইচ্ছা করছে পরীবানুর গালে ঠাশ করে একটা চড় লাগাতে। স্ত্রীকে শাসন করার জন্যে মাঝেমধ্যে তার গায়ে হাত তোলা জায়েজ আছে। জুম্মাঘরের ইমাম শুক্রবারে খুতবা পাঠের পর বলেছেন। উনি তো না জেনে বলেন নাই। জেনেশুনে বলেছেন।

পরীবানুর গালে সে যে একটা চড় বসাবে— এই বিষয়ে মাসুদ পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল, কিন্তু তার রাগ সেরকমভাবে উঠছে না। সব দিন তার রাগ দ্রুত উঠে না।

পরী!

হুঁ।

এই ধরনের কথা আর কোনোদিন বলবা না।

আচ্ছা বলব না।

পরীবানু মাসুদের মুখের কাছে হাত বাড়িয়েছে। এখন সে পান খাবে। মাসুদের আবার মন খারাপ হয়ে গেল। মাসুদের মুখে কোনো পান নেই। রাগের কারণে পান গিলে ফেলেছে।

মাসুদ বলল, পরী, আমার একটা কথা রাখবা ?

পরীবানু বলল, তোমার একটা কথা না, সব কথাই রাখব।

মাসুদ বলল, কথাটা কী শুনলে তুমি পিছাইয়া পড়বা। যদি রাখো তাহলে ভবিষ্যতে তোমার দশটা অপরাধ ক্ষমা করব।

কথাটা কী ?

রাত অনেক হয়েছে। গ্রামের মানুষজন ঘুমে। আসমানে চাঁদও নাই। অন্ধকার।

কথাটা বলো।

তুমি আমার সাইকেলের পিছনে বসো। আমি তোমারে নিয়া ঘুরব। কেউ কিছু জানব না। রাজি আছ ?

পরীবানু ক্ষীণস্বরে বলল, হুঁ।

মাসুদ গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে সাইকেল চালাচ্ছে। একসময় সে নদীর দিকে চলল। নদীর পাড়ে চর পড়েছে। ফাঁকা চরে সাইকেল চালানোর মজাই অন্যরকম। পরীবানুর শুরুতে ভয় ভয় লাগছিল, এখন মজাই লাগছে। সে ক্ষণে ক্ষণে চাপা গলায় হাসছে।

কে ? মাসুদ না ? মাসুদ, এদিকে আসো।

নদীর চরে সিদ্দিকুর রহমান দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর একপাশে লোকমান একপাশে সুলেমান। সুলেমানের হাতে বন্দুক। তাঁর গলার স্বর শুনেই মাসুদ সাইকেল নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সিদ্দিকুর রহমান আবার ডাকলেন, মাসুদ কাছে আসো।

মাসুদ বাবার কথার পর পরই সাইকেল নিয়ে ঝড়ের গতিতে বের হয়ে গেল। পরীবানুর কথা একবারও তার মনে হলো না। সিদ্দিকুর রহমান লোকমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, লোকমান, তুমি মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসো।

নদীর পাড় ঘেঁসে সিদ্দিকুর রহমান হাঁটছেন। সুলেমান তার পিছু পিছু যাচ্ছে। সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। রাত-বিরাতে এইভাবে বের হওয়া ঠিক না। কখন কী ঘটে তার কি ঠিক আছে ?

সুলেমান!

জি চাচাজি।

আমার গাধা ছেলে স্ত্রীকে সাইকেলের পিছনে নিয়া চক্কর দিতেছিল। দৃশ্যটা তোমার কাছে কেমন লাগল ?

ভালো না চাচাজি। বিরাট অন্যায় হয়েছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমি আনন্দ পেয়েছি। গাধাটাকে আমি ডেকেছিলাম কী জন্যে জানো ? গাধাটাকে ডেকেছিলাম একটা কথা বলার জন্যে। কথাটা হলো— যা তুই যতক্ষণ ইচ্ছা সাইকেলে করে চক্কর দে।

সুলেমান চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। সে এতদিন ধরে মানুষটার সঙ্গে আছে, তারপরেও মানুষটার বিষয়ে সে কিছুই জানে না। এটা কেমন করে হয় ?

WWW.BDBANGLA.COM

বাড়ির উঠোনে ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের হাতলে লাল ঠোঁটের হলুদ পাখি বসে আছে। লীলা অবাক হয়ে পাখির দিকে তাকিয়ে আছে। কাক, চড়ুই এবং কবুতর— এই তিন ধরনের পাখি মানুষের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। অন্যসব পাখি দূরে দূরে থাকে। মানুষ দেখলেই উড়ে কোনো গোপন জায়গায় চলে যায়।

লীলা মুগ্ধ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। নড়াচড়া করতেও ভয় পাচ্ছে— পাখিটা যদি উড়ে চলে যায়! থাকুক আরো কিছুক্ষণ বসে। ধান এনে উঠোনে ছড়িয়ে দিলে কি পাখিটা টুকটুক করে ধান খাবে ? বাড়ির ভেতর থেকে জলচৌকি নিয়ে লোকমান বের হচ্ছে। লীলা ইশারায় তাকে থামতে বলল। লোকমান ইশারা বুঝতে পারল না। এগিয়ে এলো। দরজার চৌকাঠের সঙ্গে জলচৌকি লেগে শব্দ হলো। হলুদ পাখি উড়ে চলে গেল। লীলার মনটা খারাপ হয়ে গেল। লোকমান বলল, আমারে কিছু বলছেন ?

না, কিছু বলছি না।

লোকমান বলল, জলচৌকি কী করব ?

লীলা বলল, উঠানের ঠিক মাঝখানে রাখেন। ইজিচেয়ার সরিয়ে দিন।

লোকমান ইজিচেয়ার হাতে নিয়ে এগুচ্ছে। ঠিক তখন হলুদ পাখিকে আবার দেখা গেল। সে এসে কাপড় শুকানোর দড়িতে বসল। বসেই আবারো উড়ে চলে গেল।

লীলা বলল, হলুদ পাখিটাকে কি দেখেছেন ?

লোকমান বলল, জি দেখেছি।

পাখিটার নাম কী ?

হইলদা পাখি।

এই পাখিটার আর কোনো নাম নেই ?

জি না। আর কী নাম থাকব ?

অবশ্যই এই পাখিটার কোনো-একটা নাম আছে। টিয়া পাখির গায়ের রঙ সবুজ। তাই বলে টিয়া পাখিকে আমরা সবুজ পাখি বলি না। কোকিলকে কালো পাখি বলি না। জলচৌকিটা রেখে আপনি লোকজনদের জিজ্ঞেস করে পাখিটার নাম জেনে আসবেন।

জি আচ্ছা।

আপনি একা কেন ? আর লোকজন কোথায় ?

সুলেমান চাচাজির সাথে কই জানি গেছে।

সুলেমান ছাড়াও তো এ-বাড়িতে আরো লোকজন আছে। সবাইকে আসতে বলুন।

জি আচ্ছা।

আজ এ বাড়িতে একটা বিশেষ দিন। এটা কি জানেন ?

লোকমান জবাব দিল না। আজ যে এ-বাড়িতে বিশেষ দিন তা সে জানে। এ-বাড়িতে বউ আসবে। পরীবানুকে আনা হবে। তবে এই আনা অন্যরকম আনা। আনন্দ-উল্লাসের আনা না। লোকমান ভেবেছিল অন্ধকারে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে মেয়েটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হবে। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। এখন মনে হচ্ছে তা না। মোটামুটি আয়োজন করেই আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। লোকমান নিশ্চিত চাচাজি বিষয়টা পছন্দ করবেন না। তিনি খুবই রেগে যাবেন। তবে রেগে গেলেও কিছু বলবেন না। তিনি তাঁর মেয়েকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এই বিষয়টা এখন বোঝা যাচ্ছে।

আপনাকে বলেছিলাম পালকির ব্যবস্থা করতে। করেছেন ?

লোকমান বলল, জি-না। প্রয়োজনে সেনবাড়ির পালকি আনা হইত। সেনবাড়ির পালকি এখন নাই।

পালকি ছাড়া নতুন বউ আসবে কীভাবে ? আর কোথাও পালকি নেই ?

জি না।

লীলা বলল, কাঠমিস্ত্রি খবর দিয়ে আনুন। কাঠ কিনে আনার ব্যবস্থা করুন। পালকি বানানো এমন কোনো জটিল ব্যাপার না।

লোকমান বলল, কী যে কন! পালকি বানান জটিল আছে।

লীলা বলল, জটিল না সরল সেটা বুঝবে কাঠমিস্ত্রি। আপনি ডেকে নিয়ে আসুন। আমি কথা বলব।

জি-আচ্ছা।

লীলা বলল, এখানের দোকানে রঙিন কাগজ পাওয়া যায় ? লাল-নীল কাগজ ?

যাইতে পারে।

আমার রঙিন কাগজ লাগবে। খোঁজ নিয়ে দেখুন রঙিন কাগজ পাওয়া যায় কি না।

জি আচ্ছা।

এখন বলুন আপনাকে কী কী কাজ করতে দেয়া হয়েছে ?

কাঠমিস্ত্রি খবর দিয়ে আনব। রঙিন কাগজ আনব।

আরেকটা কাজ করতে বলেছিলাম। হলুদ পাখির নাম জেনে আসতে। আপনাকে তিনটা কাজ দিয়েছি, আপনি তিনটা কাজ শেষ করে যত দ্রুত পারেন চলে আসবেন।

বেলা বেশি হয় নি। ন'টা সাড়ে ন'টা বাজে। লীলার হাতে অনেক সময় আছে। পরীবানু আসবে সন্ধ্যায়, তার আগে সব কাজ গুছিয়ে ফেলা যাবে। সিদ্দিকুর রহমান তাঁর মেয়ের হাতে পরীবানুকে এ-বাড়িতে আনার সমস্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। লীলা কাজগুলি আগ্রহ নিয়ে করছে। সে রমিলার ঘরে ঢুকল।

রমিলা খাটে বসেছিলেন। মেয়েকে দেখে দ্রুত খাট ছেড়ে উঠে এলেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন, মাগো, বাড়িতে কি কোনো ঘটনা আছে ?

লীলা বলল, আজ মাসুদের বউকে এ-বাড়িতে আনা হবে।

পরীবানু ?

হ্যাঁ, পরীবানু। আপনি নাম জানেন ?

জানি।

বাড়িতে নতুন বউ এলে কী কী করতে হয় আমি জানি না। আপনি আমাকে বলে দিন।

রমিলা আনন্দে হেসে ফেললেন। লীলা বলল, ঘরে তালাবন্ধ থেকে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। আমি তালা খুলে দিচ্ছি।

তোমার বাপজান রাগ হইব।

আমি তাঁর রাগ সামলাব। আসুন আমরা দু'জনে মিলে সব আয়োজন করি।

অনেক জোগাড়যন্ত্র লাগব গো মা। কালা গাই-এর দুধ লাগব।

দুধ লাগবে কেন ?

দুধ পায়ে ঢালতে হয়।

দুধ কে ঢালবে ?

নিয়ম হইল ছেলের মা ঢালবে। তবে আমারে দিয়ে হবে না। পাগল আর বিধবা এই দুই কিসিমের মেয়ে দুধ ঢালতে পারে না। অলক্ষণ হয়।

অলক্ষণ হোক আর সুলক্ষণ হোক— দুধ আপনি ঢালবেন।

তুমি বললে ঢালব।

আরেকটা কথা মা, আপনি সবসময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। আপনার মাথা হঠাৎ গরম হয়ে গেলে যেন আমি বুঝতে পারি। ব্যবস্থা নিতে পারি।

রমিলা বললেন, আমার একটা নতুন লাল পাইড় শাড়ি লাগব গো মা। ছেলের মা'র লাল পাইড় নতুন শাড়ি পরতে হয়।

লীলা বলল, আমি আপনার শাড়ির ব্যবস্থা করছি।

রমিলা বললেন, তোমার বাপ কিন্তু রাগ হইব।

না, বাবা রাগ করবেন না। উনি অবাক হবেন কিন্তু রাগ করবেন না। উনার সব রাগ এখন মাসুদের উপর। আমাদের উপর উনার কোনো রাগ নাই।

রমিলা বললেন, মা, তোমার খুব বুদ্ধি।

লীলা বলল, আপনারও খুব বুদ্ধি।

লীলা রমিলার ঘরের তালা খুলে দিল। রমিলা ঘর থেকে বের হলেন। চাপা গলায় বললেন, মাগো আমার খুব ইচ্ছা করতেছে দিঘিতে সিনান করি।

লীলা বলল, বেশ তো, আমিও আপনার সঙ্গে দিঘিতে গোসল করব। আমি কিন্তু সাঁতার জানি না।

রমিলা মুখ টিপে হাসছেন। লীলা সাঁতার জানে না এই খবরে তিনি মনে হলো খুব মজা পাচ্ছেন। তাঁর হাসি থামেই না।

সিদ্দিকুর রহমান বাড়ি ফিরলেন দুপুরে। 'গইড়ার ভিটা' নামে পরিচিত দেড় শ' বিঘার মতো জমির জন্যে বায়না দলিল করতে তাঁর দেরি হলো। গইড়ার ভিটা এই অঞ্চলের দোষী জমি। এই জমি কিনে যে ভোগদখল করতে গিয়েছে তার উপরই মহাবিপদ নেমেছে— এ-ধরনের জনশ্রুতি আছে। জমির বর্তমান মালিক কাজী আসমত খাঁও নির্বংশ হয়েছেন। তাঁর একমাত্র জোয়ান ছেলে এবং ছেলের ঘরের নাতি একই দিনে নৌকাডুবিতে মারা গেছে। সিদ্দিকুর রহমান এইসব কারণেই গইড়ার ভিটা নামমাত্র মূল্যে পেয়েছেন। কাজী আসমত খাঁ বায়না দলিলে সই করার সময় নিচু গলায় বলেছেন, জমিটা যে দোষী কথা সত্য। ভোগদখলের আগে মোল্লা মুসুল্লি ডাইক্যা দোয়া পড়াইতে ভুল কইরেন না।

বড়ই দোষ লাগা জায়গা। সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, মানুষ দোষী হয়। জমি দোষী হয় না। মানুষের অন্তরে দোষ লাগে। জমির অন্তরে দোষ লাগে না। কথাটা বলে তাঁর ভালো লেগেছে। তাঁর মনে হয়েছে কিছু না বুঝেই তিনি খুব একটা ভাবের কথা বলে ফেলেছেন। এই ভাবের কথার মর্ম সবাই ধরতে পারবে না। ভাবের কথার মর্ম বুঝতে পারার জন্যে ভাবের জগতে থাকতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ ভাবের জগতে থাকে না।

গইড়ার ভিটা কেনার পেছনে সিদ্দিকুর রহমানের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য কাজ করছে। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভাবের জগতের কিছু যোগ আছে। জমি দলিলে রেজিস্ট্রি হবার পর তিনি তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ করবেন। তাও সবার সঙ্গে না। দু'একজনের সঙ্গে। সেই দু'একজন কে তা তিনি ঠিক করে রেখেছেন।

কাজী আসমত খাঁর বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে আসতে তাঁর একঘণ্টার মতো লাগল। সঙ্গে ছাতা নেয়া হয় নি। কড়া রোদের সবটাই মাথায় পড়েছে। তাঁর দ্রুত হাঁটার অভ্যাস। শেষের দিকে তাঁর হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে এলো। বুকে চাপা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। তিনি নিজের দুর্বলতা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে হাঁটার গতি বাড়াতে চেষ্টা করলেন। হাঁটার গতি তেমন বাড়ল না, বুকের চাপ ব্যথাটা শুধু বাড়ল। সুলেমান চিন্তিত গলায় বলল, চাচাজির শইল কি খারাপ লাগতেছে ? তিনি প্রশ্নের জবাব দিলেন না। বাড়ি পৌঁছানোর পর চোখ বন্ধ করে ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে। মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে পাঁচ-দশ মিনিট মরা মানুষের মতো পড়ে থাকলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়িতে পা দিয়ে তিনি ধাক্কার মতো খেলেন। বাংলাঘরের উঠানে দুই কাঠের মিস্ত্রি সমানে করাত চালাচ্ছে। তাদের তিনজন জোগালি কাঠে রান্দা দিচ্ছে। একটু দূরে লোকমান শুকনামুখে বসে আছে। তাকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ঘটনা কী ? লোকমান চট করে জবাব দিতে পারল না, হড়বড় করতে লাগল। সিদ্দিকুর রহমান কড়া গলায় বললেন, ঘটনা কী বলো ? এরা কী বানায় ? পালঙ্ক ?

লোকমান বলল, জি না।

তাহলে বানাইতাছে কী ?

পালকি।

পালকি কী জন্যে ?

বইনজির হুকুমে পালকি বানাইতাছে।

বইনজিটা কে ?

বিডিবাংলা ডট কম

লীলা বইনজি।

সিদ্দিকুর রহমান বিস্মিত হয়ে বললেন, পালকি দিয়া কী হবে ? সে কি পালকি দিয়া যাতায়াত করবে ?

নতুন বউ পালকি দিয়া আসবে।

সিদ্দিকুর রহমান আরো অবাক হয়ে বললেন, নতুন বউ কে ?

লোকমান ভীত গলায় বলল, মাসুদ ভাইজানের ইসতিরি। পরীবানু।

সিদ্দিকুর রহমান ধাক্কার মতো খেলেন। মাসুদের স্ত্রীকে যে আজই এ-বাড়িতে আনার কথা সেটাই তাঁর মনে নেই। মেয়েটার নাম যে পরীবানু তাও মনে ছিল না। সুলেমান বলল, চাচাজি, কাজ কি বন্ধ করে দিব ?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমার মেয়ে যে কাজ শুরু করেছে সেই কাজ আমি বন্ধ করব এটা কেমন কথা ?

সুলেমান বলল, কাজ বন্ধ না কইরা উপায়ও নাই। একদিনে কাজ শেষ হইব না। অসম্ভব।

সিদ্দিকুর রহমান গম্ভীরমুখে বললেন, অসম্ভব বলে কোনো কথা নাই। দুইজন মিস্ত্রি না পারলে দশজন মিস্ত্রিরে কাজে লাগও। জোগালি বাড়ায়ে দাও। পালকি এমন কোনো জটিল জিনিস না যে বানাতে একবছর লাগবে।

সুলেমান বিড়বিড় করে বলল, কথা সত্য।

সিদ্দিকুর রহমান মিস্ত্রিদের দিকে বললেন, কী, তোমরা দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবা ?

মিস্ত্রিদের একজন বলল, চেষ্টা নিব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, চেষ্টা নেওয়া-নেওয়ির কিছু নাই। হয় পারবা, না হয় পারবা না। দুই-এর মাঝামাঝি কিছু নাই।

পিনিছিং ভালো হইব না। তয় কাজ চলব।

সিদ্দিকুর রহমান আর কথা বাড়ালেন না। বকুলগাছের ছায়ার নিচে তাঁর ইজিচেয়ার পাতা আছে। তিনি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। বুকের চাপা ব্যথা আরো বেড়েছে। পানির পিপাসা হয়েছে। তীব্র পিপাসা নিয়ে পানি খেতে নেই। তিনি পানির পিপাসা কমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। শরীরটাকে ঠিক করতে হবে। মাসুদের বউ আসবে। কিছু ব্যবস্থা তাকে নিতে হবে। এখন আধমরার মতো বিছানায় শুয়ে থাকা যাবে না। সমস্যা হলো মানুষ ইচ্ছা করলেই তার শরীর ঠিক করতে পারে না। মানুষ তার শরীর যেমন ঠিক করতে পারে না, মনও ঠিক করতে পারে না। মন এবং শরীর কোনোটার উপরই মানুষের কোনো দখল নেই।

সিদ্দিকুর রহমান চাপা গলায় ডাকলেন, বদু কি আছ আশেপাশে ?

বদু দৌড়ে এলো। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, নাপিত ডাক দিয়া আনো। নাপিতরে বলো সে যেন মাসুদের মাথা কামায়ে দেয়।

জি আচ্ছা।

মাসুদরে বলবা, এটা আমার হুকুম।

জি আচ্ছা।

সিদ্দিকুর রহমান চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। ঘুমের মধ্যেই মনে হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাক মানুষ নামে এক আশ্চর্য জিনিস তৈরি করেছেন, যে-জিনিসের কোনো নিয়ন্ত্রণ তার নিজের কাছে নাই। নিয়ন্ত্রণ অন্য কোনোখানে। তিনি ইচ্ছা করলেও এখন জেগে থাকতে পারবেন না। তাঁকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। সিদ্দিকুর রহমান ঘুম-ঘুম চোখে ডাকলেন, সুলেমান।

সুলেমান ভীত গলায় বলল, জি।

আমি যদি ঘুমায়ে পড়ি কেউ যেন আমার ঘুম না ভাঙায়।

জি আচ্ছা।

আমার শরীর ভালো না। আমি কিছুক্ষণ শান্তিমতো ঘুমাব।

সুলেমান বলল, জি আচ্ছা।

বড় দেখে একটা তালা জোগাড় করো।

জি আচ্ছা।

মাসুদের বউ ঘরে আসার পরে আমি মাসুদকে তালাবন্ধ করে রাখব।

জি আচ্ছা।

সিদ্দিকুর রহমানের ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল। তাঁর মাথায় অন্য একটা চিন্তা এসেছে। কোনো মানুষেরই তার নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু একজন মানুষ ইচ্ছা করলে অন্য একজন মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয় নি। কিন্তু অন্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছে। বড়ই জটিল অঙ্ক।

সুলেমান!

জি চাচাজি ?

পানি খাব। পানির পিপাসা হয়েছে।

সুলেমান ছুটে গেল পানি আনতে। পানির জগ এবং গ্লাস হাতে ফিরে এসে সে দেখে, সিদ্দিকুর রহমান গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছেন। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন। সুলেমান তাঁর ঘুম ভাঙাল না। ইজিচেয়ারের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে রইল যেন কোনো অবস্থাতেই কেউ সিদ্দিকুর রহমানের কাছে যেতে না পারে। দুনিয়া উলট-পালট হয়ে গেলেও চাচাজির ঘুম ভাঙানো যাবে না।

শহরবাড়ির বারান্দায় আনিস বসে আছে। তার শরীর পুরোপুরি সারে নি। দু'পা হাঁটতেই শরীর ভেঙে আসে। তবে জ্বর আসছে না। খাওয়ায় রুচি ফিরে এসেছে। মজার ব্যাপার হলো, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় নি। ময়মনসিংহ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যেতেও হয় নি। গৌরীপুর জংশনে হঠাৎ সে উঠে বসে বলেছে, আমার শরীর ঠিক হয়ে গেছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কীভাবে ঠিক হয়ে গেল ?

আনিস বলল, কীভাবে ঠিক হয়েছে জানি না। কিন্তু এখন ঠিক আছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ঠিক আছে বেঠিক হতে কতক্ষণ ?

আনিস বলল, বেঠিক হবে না।

সতীশ ডাক্তার থার্মোমিটারে জ্বর মেপে বলল, জ্বর নাই।

সিদ্দিকুর রহমান রোগী নিয়ে ফিরে এলেন।

এখন আনিসের গায়ে একটা কম্বল। সে কম্বলের ভেতর থেকে পা বের করে খালি পা রোদে মেলে আছে। কার্তিক মাসের রোদটা খুবই আরামদায়ক মনে হচ্ছে। সে আগ্রহ নিয়ে মাসুদকে দেখছে। মাসুদ বকুলতলায় বসে আছে। একজন নাপিত তার মাথা কামিয়ে দিচ্ছে। আনিস শুনেছে মাসুদের আজ বিয়ে। যে ছেলের বিয়ে তার মাথা কামিয়ে দেয়া হচ্ছে কেন তা সে বুঝতে পারছে না। এই বাড়ির অনেক কিছুই তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়।

দিঘির পানিতে পা ডুবিয়ে লীলা বসে আছে। সে খুবই অবাক হচ্ছে— এই দিঘির পাড়-ঘেঁসে সে বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছে অথচ কখনো চোখে পড়ে নি এই দিঘির বাঁধানো ঘাট অসম্ভব সুন্দর। আগে জানলে সে ঘাটে এসে পা ডুবিয়ে বসে থাকত।

রমিলা মাঝপুকুরে। তিনি মনের আনন্দে সাঁতার কাটছেন। তাঁকে দেখে মনেই হচ্ছে না সাঁতার কাটা কোনো পরিশ্রমের কাজ। মনে হচ্ছে মানুষটা পাখির পালকের মতো হালকা। নিজে নিজেই পানির উপর ভেসে আছেন। মাঝে মাঝে বাতাস আসছে। বাতাস মানুষটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

লীলা বলল, মা, আপনি বেশি দূরে যাবেন না। আমার ভয় লাগে।

রমিলা বললেন, কিসের ভয় গো মা ?

লীলা বলল, আমার শুধু মনে হচ্ছে হঠাৎ আপনি সাঁতার কাটতে ভুলে যাবেন আর টুপ করে পানিতে ডুবে যাবেন।

সাঁতার কেউ ভোলে না।

লীলা বলল, আপনাকে সাঁতার কাটতে দেখে আমার নিজেরও সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সাঁতার কাটা খুব সহজ কাজ। আপনি কি আমাকে সাঁতার কাটা শিখিয়ে দিতে পারবেন ?

হুঁ পারব।

লীলা বলল, সাঁতার কাটা শেখার পর আমি রোজ দুপুরে আপনাকে নিয়ে দিঘিতে সাঁতার কাটব।

রমিলা বলল, কুমারী মেয়ের এই দিঘিতে নামা নিষেধ আছে গো মা। তোমার বাবার কঠিন নিষেধ আছে।

লীলা অবাক হয়ে বলল, কেন ?

রমিলা বললেন, দুইজন কুমারী মেয়ে এই দিঘিতে সাঁতার দিতে গিয়ে মারা গেছে। এইজন্যেই নিষেধ। তোমার বাবার ধারণা দিঘিটা দোষী। উনি নিজেও কোনোদিন দিঘিতে নামেন না।

লীলা বলল, মা, আপনি উঠে আসুন তো, আমার ভালো লাগছে না।

রমিলা বললেন, আরেকটু থাকি গো মা। কতদিন পরে দিঘিতে নামলাম। মা শোনো, কুঁজা মাস্টার হাসপাতাল থাইক্যা ভালো হইয়া ফিরছে কিন্তু তুমি তারে দেখতে যাও নাই এইটা কেমন কথা!

আমি যে দেখতে যাই নাই আপনাকে কে বলল ?

রমিলা হেসে দিলেন। হাসতে হাসতে পানিতে ডুব দিলেন। লীলার মনে হলো, দিঘির ভেতর থেকে তাঁর হাসির শব্দ আসছে। আতঙ্কে লীলার হাত-পা জমে আসছে।

অনেকক্ষণ পরে রমিলার মাথা ভেসে উঠল। তিনি দিঘির ঘাটে উঠে এলেন। লীলার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, মাগো, আমারে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়া তালাবন্ধ করে রাখো। আমার ভালো লাগতেছে না। মাথা যেন কেমন করতেছে।

লীলা মায়ের হাত ধরল। রমিলা থরথর করে কাঁপছেন।

সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের ঘুম ভাঙল আছরের পর। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে আছরের নামাজ পড়লেন। সুলেমানকে বললেন, অবেলায় কিছু খাবেন না। শুধু ডাবের পানি খাবেন।

আছরের নামাজ শেষ করে তিনি পালকি দেখতে গেলেন। পালকি বানানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দেখতেও যে খারাপ হয়েছে তা না। তিনি লোকমানকে ডেকে বললেন, এদের প্রত্যেককে একটা করে নতুন লুঙ্গি যেন বখশিশ হিসেবে দেয়া হয়। লুঙ্গি আর পাঁচ টাকা করে বখশিশ।

সিদ্দিকুর রহমান বাড়ির উঠানে ঢুকে চমৎকৃত হলেন। উঠানের মাঝখানে জলচৌকি বসানো। জলচৌকিতে নকশা করা হয়েছে। জলচৌকির চারপাশে চারটা কলাগাছ। রঙিন কাগজের মালা দিয়ে গাছ সাজানো। বধূবরণের ব্যবস্থা। তাঁর মন হঠাৎ অসম্ভব ভালো হয়ে গেল। তাঁর ইচ্ছা করতে লাগল লীলাকে ডেকে তাঁর ভালো লাগার কথাটা বলবেন। তিনি তা না করে সুলেমানকে ডাকলেন। শান্ত গলায় বললেন, তোমারে বড় তালার জোগাড় দেখতে বলেছিলাম। দেখেছ?

সুলেমান বলল, জি চাচাজি, তালার জোগাড় হয়েছে।

মাসুদের স্ত্রীর নাম যেন কী?

পরীবানু।

পরীবানু বাড়িতে ঢোকার পরপরই মাসুদকে তার ঘরে তালা দিয়ে আটকায়ে রাখবে।

জি আচ্ছা।

এইটা আমার হুকুম। হুকুমের যেন নড়চড় না হয়।

জি আচ্ছা।

ভেতরবাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। রমিলা চিৎকার করে কী যেন বলছেন। মাথা দিয়ে কাঠের দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে। সন্ধ্যার আগে-আগে রমিলার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। আজ মনে হয় বেশি এলোমেলো হয়েছে।

সিদ্দিকুর রহমান বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন। হাতের ইশারায় সুলেমানকে ডাকলেন। শান্ত গলায় বললেন, জামাইয়ের মাথা কি কামানো হয়েছে?

সুলেমান বলল, জি।

মাথা কামানোর সময় জামাই কি চোখের পানি ফেলেছে?

জি। খুব কান্নাকাটি করেছে।

এখন লীলাকে বলো, মাসুদের স্ত্রীকে আনার জন্যে যেন পালকি যায়।

জি আচ্ছা।

হিন্দুবাড়ি থেকে ঢোল করতাল বাজাবার কিছু লোকজন আনো। আমার ছেলে গানবাজনার এত বড় সমাজদার! তার স্ত্রী এই বাড়িতে ঢুকবে গানবাজনা ছাড়া— এটা হয় না। যাও বাজনাদার আনো।

মাসুদকে সত্যি সত্যি তালাবন্ধ করা হয়েছে। তার মাথা কামানো। সে হলুদ রঙের একটা চাদর গায়ে দিয়েছে। তাকে দেখাচ্ছে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো।

বাড়ির উঠানে বাজনাদাররা এসে বাজনা বাজাচ্ছে। বাজনার শব্দ তার কানে যাচ্ছে। রমিলা চিৎকার করছেন। রমিলার ঘর মাসুদের ঘরের কাছে না। অনেকটা দূরে। তারপরেও বাজনার শব্দ ছাপিয়ে রমিলার কান্নার শব্দ মাসুদের কানে আসছে। মাসুদ একসময় চাপা গলায় ডাকল, বুবু। বুবু।

লীলা এসে মাসুদের সামনে দাঁড়াল।

মাসুদ বলল, বুবু, আমি কিন্তু এর শোধ তুলব। আমি অবশ্যই শোধ তুলব।

লীলা বলল, এখনই এত অস্থির হয়ো না।

মাসুদ বলল, বাবা সব মানুষকে গরু-ছাগল মনে করে। এটা ঠিক না বুবু।

কয়েকটা দিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাসুদ বলল, ঠিক হোক, বেঠিক হোক আমি এর শোধ তুলব। বাবা কী করবে না করবে সেটা যেমন আগে কেউ বুঝতে পারে না, আমি কী করব সেটাও বাবা বুঝতে পারবে না। সমানে সমান।

সমান হবার চেষ্টা করা ভালো না মাসুদ।

মাসুদ হাউমাউ করে কাঁদছে। লীলার মন খারাপ লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, জটিল একটা খেলা শুরু হয়েছে। তাকে এখানে রাখা হয়েছে দর্শক হিসেবে। এর বাইরে তার কোনো ভূমিকা নেই।

বাজনা শুরু হবার পরপরই রমিলা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছেন। তাঁর মনে পড়েছে যে আজ এ বাড়িতে ছেলের বউ আসবে। তাকে বধূবরণ করতে হবে। তিনিও চাপা গলায় ডাকছেন, লীলা, ও লীলা।

WWW.BDBANGLA.COM

পরীবানুর ডাকনাম পরী।

তার জন্মের রাতে পরীবানুর দাদি স্বপ্নে দেখেন, একটা পরী তার পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। পরীর পাখার খোঁচায় তিনি খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। তিনি পরীকে বললেন, মা গো, তোমার পাখা দুইটা খুইল্যা ঘুমাও। পরী মেয়েটা দুঃখিত গলায় বলল, দাদি, আমার পাখা খোলার নিয়ম নাই। তখনি তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি বিছানায় উঠে বসে শুনলেন— বাড়িতে নানান হৈচৈ। তাঁর ছেলের বউয়ের প্রসববেদনা উঠেছে। ধাই এসেছে। তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, তোর কন্যা-সন্তান হবে। কন্যা-সন্তানের নাম আমি দিলাম পরীবানু। এই নামের ইতিহাস আছে। ইতিহাস আমি পরে বলব।

পরীবানু নামের ইতিহাস এই বৃদ্ধ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিনই বলে গেছেন। বাড়িতে ভিক্ষার জন্যে ভিনগাঁয়ের ভিক্ষুক এলে তাকেও বলেছেন। পরীবানুকে তিনি যে আদর করেছেন তারও কোনো তুলনা নেই। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, এই মেয়েকে মারা তো দূরের কথা, কেউ কোনোদিন ধমকও দিতে পারবে না। যদি দেখেন কোনো কারণে এই মেয়ের চোখে পানি এসেছে, তাহলে তিনি বাড়িঘর ছেলে চলে যাবেন।

সত্যিকার ভালোবাসা দু'দিকেই প্রবাহিত হয়। পরীবানুর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তার জগৎ ছিল দাদিময়। ঘরে কোনো ভালো জিনিস রান্না হলে দাদি মুখে না দেয়া পর্যন্ত সে মুখে দেবে না। ঈদের সময় সবার আগে তার দাদির জন্যে নতুন শাড়ি কিনতে হবে।

দাদির মৃত্যুর সময় পরীবানুর বয়স ছয় বছর। সে তার দাদির মৃত্যু সহজভাবেই নিল। খুব সম্ভবত মৃত্যুবিষয়ক ধারণা তার দাদি আগেভাগে তাকে দিয়ে রেখেছিলেন। তবে তার পরিবর্তন যেটা হলো তা হচ্ছে— যখন-তখন দাদির কবরের কাছে চলে যাওয়া। কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলা—

আইজ কী ঘটনা ঘটেছে জানো দাদি? হাসির ঘটনা। ঘটনা শুনলে হাসতে হাসতে তোমার পেট-বেদনা হবে। হি হি হি...

পরীবানুর বয়স এখন পনেরো।

সে খুবই বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। শুধু দাদির বিষয়ে তার বুদ্ধি কাজ করে না। এখনো সে দাদির কবরের কাছে যায়। মাথা নিচু করে মৃত দাদির সঙ্গে একতরফা গল্প করে।

বউ হিসেবে বড় বাড়িতে রওনা হবার ঠিক আগেআগে সে গিয়েছে দাদির কবরের কাছে। বাঁধানো কবরের গায়ে হাত রেখে চাপা গলায় বলেছে— দাদি গো, খাঁ বাড়িতে যাইতেছি। আর কোনোদিন এইখানে আসতে পারব বইল্যা মনে হয় না। এই পর্যন্ত বলেই সে প্রতিজ্ঞা ভুলে অনেকক্ষণ কাঁদল। দাদির সঙ্গে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যত দুঃখ-কষ্টই হোক সে কোনোদিন কাঁদবে না। বেশির ভাগ প্রতিজ্ঞাই মানুষ রাখতে পারে না।

নতুন বউ স্বামীর বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে যায়। পরীবানু কাঁদল না। পালকি থেকে নামল। যখন জলচৌকিতে উঠে দাঁড়াতে বলল, সে দাঁড়াল। একজন মহিলা তার পায়ে দুধ ঢেলে দিল। এই মহিলা তার শাশুড়ি। মহিলার মাথার ঠিক নেই। তাকে নাকি সবসময় ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। পরীবানু খুব আগ্রহ করে মহিলাকে দেখল। তাকে মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না। সে তার শ্বশুরকে কোথাও দেখল না। নতুন বউ শ্বশুরবাড়িতে এসে শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে সালাম করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে শ্বশুরের সঙ্গে তার দেখা হবে না— এটা সে ধরেই নিয়েছিল। তার পরেও ক্ষীণ আশা ছিল— হয়তো এ-বাড়ির সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে কোনো সমস্যারই সমাধান হয় নি। সব সমস্যার সমাধান তাকে করতে হবে। কেউ কি তাকে সাহায্য করবে? লীলা নামের মেয়েটা হয়তো করবে। তবে মেয়েটা তার খুব কাছে আসছে না। দূরে দূরে থাকছে।

মাগরিবের নামাজের পর লীলার সঙ্গে তার প্রথম কথা হলো। সে বড় একটা ঘরের পালঙ্কের উপর একা বসেছিল। শ্বশুরবাড়িতে পা দেবার পর কোনো মেয়েই সন্ধ্যারাতে একা বসে থাকে না। তাকে রাজ্যের মানুষ ঘিরে থাকে। অথচ সে বসে আছে একা। একসময় যখন তার মনে হলো, তাকে এই পালঙ্কে একা বসে থাকতে হবে কেউ তার পাশে আসবে না, তখন লীলা হাতে শরবতের গ্লাস নিয়ে ঢুকল। তার পাশে বসতে বসতে বলল, এটা চিনির শরবত না, লবণের শরবত। লেবু, কাঁচামরিচ আর লবণ দিয়ে বানানো শরবত। আমার ধারণা আজ সারাদিন তোমার উপর দিয়ে অনেক চাপ গিয়েছে। শরবতটা খাও, দেখবে ভালো লাগবে।

নতুন বউয়ের অনেক নিয়মকানুন আছে। শরবত খাও বললেই কোনো নতুন বউ হাত থেকে টান দিয়ে শরবতের গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে না। নতুন বউদের সাধ্যসাধনা করে খাওয়াতে হয়। পরী সহজভাবেই হাতে গ্লাস নিল। লেবুর শরবতটা খেতে তার ভালো লাগল।

লীলা বলল, তোমার কি মাথাব্যথা করছে?

পরীবানু বলল, না।

তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় তোমার মাথাব্যথা।

পরীবানু বলল, হ্যাঁ, আমার মাথাব্যথা।

লীলা বলল, আমার কাছে কিছু গোপন করবে না। আমার কাছে কেউ কিছু গোপন করলে আমার ভালো লাগে না।

পরী ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

লীলা বলল, তোমার কি ক্ষুধা লেগেছে?

পরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি।

লীলা বলল, রান্না হয়ে গেছে। আমরা দু'জন একসঙ্গে খেয়ে নেব। ক্ষুধার কারণে অনেক সময় মাথা ধরে।

পরী বলল, আমি আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দু'টা কথা বলব।

মাসুদের সঙ্গে কথা বলতে চাও?

জি।

ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তুমি তো জানোই বাবা কেমন রাগী মানুষ, উনি মাসুদকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন। বাবার রাগ কমার সময় দিতে হবে।

উনার রাগ কমবে?

নিজ থেকে কমবে না। কমাবার চেষ্টা করতে হবে। আমি চেষ্টা করব। তুমিও চেষ্টা করবে।

আমি কীভাবে চেষ্টা করব?

সেটা ভেবে ঠিক করা হবে।

লীলা পরীবানুর সঙ্গে কথা বলে অবাক হয়েছে। মেয়েটা গ্রামের মেয়েদের মতো কথা বলছে না। মোটামুটি শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছে। মেয়েটিকে লীলার বুদ্ধিমতী বলেও মনে হচ্ছে। মেয়েটা এই বাড়ির ব্যাপারগুলি বোঝার চেষ্টা করছে। যে-পরিস্থিতিতে মেয়েটা এসেছে সেই পরিস্থিতিতে পড়লে সব মেয়েই হাল ছেড়ে দেবে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। কোনোকিছু বোঝার চেষ্টা করবে না।

লীলা বলল, তুমি কি শহরে কিছুদিন ছিলে?

পরী বলল, জি। আমি ময়মনসিংহে থাকি। বিদ্যাময়ী স্কুলে পড়ি। ছুটিতে বাড়িতে আসি।

কোন ক্লাসে পড়ো?

এবার ম্যাট্রিক দিব।

তোমার সঙ্গে মাসুদের পরিচয় কোথায় হয়েছে? ময়মনসিংহে?

জি না। আমাদের বাড়িতে। উনি বাবার কাছে গান শুনতে আসতেন।

তুমি গান জানো?

জি না।

লীলা বলল, তুমি কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকো। রান্না হয়ে গেলেই আমি তোমাকে নিয়ে খেতে বসব।

পরী কিছু বলল না। তবে লীলার কথামতো কুণ্ডলি পাকিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে নতুন বউ ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্নে দেখল তার দাদিকে। দাদি খাট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ হাসি-হাসি। তিনি বললেন, তোর শ্বশুরবাড়ি দেখতে আসছি। খুশি হয়েছি। এদের বিরাট শান-শওকত। তবে মানুষজন নাই। ঘরবাড়ি জিনিসপত্র দিয়া শান-শওকত হয় না। শান-শওকত হয় মানুষজন দিয়া। তুই একলা শুয়ে আছিস। তোর জামাই কই?

পরী হাসতে হাসতে বলল, তারে তালাবন্ধ করে রেখেছে।

কী জন্যে?

জানি না।

তালাবন্ধ কে করছে?

আমার শ্বশুর সাহেব করেছেন।

এই লোকের দেখি স্বভাব ভালো না! সবেরে তালাবন্ধ করে রাখে। নিজের স্ত্রীকেও শুনেছি তালাবন্ধ করে রেখেছে।

বেশিক্ষণ দাঁড়ায়ে থাকবা না দাদি। শেষে তোমারেও তালাবন্ধ করবে।

আমারে তালাবন্ধ করে করুক, তোর জামাইরে কেন করবে? যা তারে ছুটায়ে নিয়ে আয়।

কীভাবে ছুটায়ে আনব? আমার কাছে চাবি নাই।

চাবি আমি নিয়া আসছি। এই নে।

বৃদ্ধা বড় একটা পিতলের চাবি পরীর হাতে দিলেন। পরী সেই চাবি সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির আঁচলে বেঁধে ফেলল। তখনি তার ঘুম ভাঙল। স্বপ্নটা এত বাস্তব ছিল যে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পরী শাড়ির আঁচল ঘুরেফিরে দেখল। রাত কত হয়েছে পরী বুঝতে পারছে না। কোনোরকম সাড়াশব্দ নেই। মনে হচ্ছে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িটাও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের নিজেদের বাড়ির অবস্থা অন্যরকম। সন্ধ্যার পর থেকে লোকজন আসতে থাকে। রাত একটু বাড়ার পর ঢোলের বাড়ি পড়তে শুরু করে। মাঝরাতে শুরু হয় গানের আসর। বন্দনা দিয়ে শুরু হয়—

পশ্চিমে বন্দনা করি সোনার মদিনা
ঝলমল ঝলমল ঝলমল ঝলমল
সোনার মদিনা...

লীলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পরীকে চমকে গিয়ে বলল, ঘুম ভেঙেছে?

পরী বলল, জি।

রান্না হয়ে গেছে। তুমি ঘুমাচ্ছিলে বলে ঘুম ভাঙাই নি। এসো খেতে বসি। মাথাধরা এখনো আছে?

না।

বাবা-মা, ভাই-বোনদের জন্য মনখারাপ লাগছে?

না।

মনখারাপ লাগছে না কেন?

জানি না।

খাওয়ার আয়োজন ভেতরের বারান্দায়। পোলাও-কোরমা, মাছভাজি—অনেক আয়োজন। পরী কিছুই খেতে পারছে না। হাত দিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করছে। লীলা বলল, খেতে পারছ না?

পরী বলল, না। আপনি খান। আমি বসে থাকি।

লীলা কিছুক্ষণ পরীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, পরী, তোমার কি সন্তান হবে?

পরী বলল, হ্যাঁ।

বিয়েটা কি এইজন্যই তাড়াহুড়া করে গোপনে করে ফেলেছ?

পরী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

লীলা বলল, কয় মাস কী, এইসব হিসাব কি তোমার আছে?

পরী বলল, হিসাব আছে। তিন মাস।

লীলা বলল, তোমরা দু'জন যে বিরাট একটা অন্যায় করেছ, এটা কি জানো?

আমি কোনো অন্যায় করি নাই। আপনি কাউকে বলেন, শুকনা মরিচের ভর্তা বানিয়ে আমাকে দিতে। মরিচভর্তা ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে আমি ভাত খেতে পারি না।

লীলা পরীর দিকে তাকিয়ে আছে। পরী বসে আছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তাকিয়ে আছে লীলার দিকে। সেই দৃষ্টিতে কোনো অস্বস্তি নেই।

রাতের খাবারের পরপরই সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। লোকমান হুক্কার নল তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল। তিনি ঘুমের ঘোরে দু'টা টান দিলেন। তাঁর মনে হলো নল-হাতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। এই লক্ষণ ভালো না। এই লক্ষণ বার্ধক্য এবং স্থবিরতার লক্ষণ। স্থবির মানুষরাই মুখভর্তি পান নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। হুক্কার নল হাতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সিদ্দিকুর রহমান ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করলেন। ঘুমটা যাচ্ছে না। আবারো যেন চেপে আসছে। জটিল কোনোকিছু নিয়ে চিন্তা করলে কিংবা কারো সঙ্গে জটিল আলোচনা করলে ঘুমটা হয়তো কাটবে। তিনি চাপা গলায় ডাকলেন, লোকমান!

লোকমান তাঁর ইজিচেয়ারের পেছনে বসেছিল। সেখান থেকে জবাব দিল—জি চাচাজি?

মাস্টারের খবর কী?

উনি ভালো আছেন। আজ সারাদিনে জ্বর আসে নাই।

উনারে ডেকে নিয়ে আসো।

জি আচ্ছা।

সিদ্দিকুর রহমান ঘুমিয়ে পড়তে চান না। এখন ঘুমিয়ে পড়া মানে রাত দুইটা-আড়াইটার দিকে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা। খাটে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা। সাপে-কাটা রোগীকে কিছুতেই ঘুমাতে দেয়া হয় না। তিনি কল্পনা করছেন চার-পাঁচ হাত লম্বা কালো একটা চন্দ্রবোড়া সাপ তাঁর পায়ে ছোবল দিয়েছে। ওঝা এসে বিষ ঝাড়বে। বিষ না নামানো পর্যন্ত তাঁকে জেগে থাকতে হবে।

আমাকে ডেকেছেন ?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, মাস্টার, জলচৌকিটার উপর বসো।

আনিস বসল। সিদ্দিকুর রহমান হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর ঘুম পুরোপুরি চলে গেছে। তিনি সামান্যতম আলস্যও বোধ করছেন না। তাঁর শরীর ঝনঝন করছে।

মাস্টার, কেমন আছ ?

জি ভালো।

তুমি তো আমাদের মোটামুটি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। ভালো কথা, তুমি গায়ে সেন্ট মেখেছ না-কি ? সেন্টের গন্ধ পাচ্ছি।

আনিস লজ্জিত গলায় বলল, পাঞ্জাবির পকেটে কয়েকটা আমের মুকুল রেখেছি। আমের মুকুলের গন্ধ।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি কি একটা জিনিস লক্ষ করেছ ? ফুল যতক্ষণ গাছে থাকে তখন তার একরকম গন্ধ, যেই তুমি ফুল ছিঁড়ে হাতে নিবে তখনি তার অন্যরকম গন্ধ।

ব্যাপারটা আমি লক্ষ করি নাই।

লক্ষ করে দেখবে। কিছু-কিছু ফুলগাছ আছে যাদের শেকড়ের গন্ধও ফুলের গন্ধের মতো।

আমি আপনার কাছে প্রথম শুনলাম। আগে কোনোদিন শুনি নাই।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি এমন অনেক কথাই তোমাকে বলতে পারি যেটা তুমি আগে কখনো শোনো নাই। বলার মতো মানুষ পাই না বলে বলি না। সব কথা সবাইকে বলা ঠিক না। মাস্টার, খাওয়াদাওয়া করেছ ?

জি করেছি।

আজ আমার বাড়িতে ছেলের বউ প্রথম এসেছে। খাওয়াদাওয়ার বিরাট আয়োজন করা উচিত ছিল। আয়োজন করা হয় নাই। মনে রাগ নিয়া উৎসবের আয়োজন করা যায় না।

রাগটা কী জন্যে ? আপনাকে না জানিয়ে ছেলে বিয়ে করে ফেলেছে এই জন্যে ? এটা রাগ করার মতো কোনো কারণ না।

সিদ্দিকুর রহমান হতভম্ব হয়ে বললেন, এটা রাগ করার মতো কারণ না ?

আনিস বলল, জি-না। কোনো কারণ না। বিয়েটা সম্পূর্ণ আপনার ছেলের নিজের ব্যাপার। সে তার নিজের সংসার করবে। সেই সংসারে আপনি কে ?

আমি কেউ না ?

জি না। আপনি কেউ না। মাসুদের সংসার মাসুদের। আপনারটা আপনার।

আনিস জলচৌকিতে বসতে বসতে বলল, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন মাসুদের বিষয়ে দু'একটা কথা বলব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, অনুমতি দিলাম না।

সিদ্দিকুর রহমান হুক্কার নলে টান দিতে লাগলেন। আগুন নিভে গেছে, নলে টান দিলে গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হয়। শব্দটা শুনতে ভালো লাগে। মনে হয় তিনি কোনো-একটা কাজের মধ্যে আছেন।

মাস্টার!

জি ?

তোমার একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি। তুমি কোনো-না-কোনোভাবে আমার সঙ্গে তর্ক বাঁধায়ে দিতে চাও। কোনো-একটা বিষয়ে তুমি আমার সঙ্গে একমত হয়েছ এরকম মনে হয় না।

আনিস নিচু গলায় বলল, তার কারণ হয়তো এই যে, আপনি যে-মতের জগতে বাস করেন আমি সেই জগতে বাস করি না। আজ আপনার বাড়িতে ছেলের বউ এসেছে। এই উপলক্ষে সবাই নতুন কাপড় পেয়েছে। আমিও একটা পাঞ্জাবি পেয়েছি। অথচ এই আনন্দের দিনে আপনি আপনার ছেলেটাকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন।

এই ছেলে তোমার হলে তুমি তাকে কোলে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে ?

তা করতাম না। কিন্তু তাকে তালাবন্ধ করেও রাখতাম না।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি আমার ছেলের বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যে তোমাকে ডাকি নাই। যে-কারণে ডেকেছি সেটা মন দিয়ে শোনো।

আনিস কৌতূহলী হয়ে বলল, কী কারণে ডেকেছেন ?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি একটা আশ্রম বানাতে চাই।

আনিস বলল, আপনি কী বললেন, বুঝতে পারলাম না। কী বানাতে চান ?

আশ্রম বানাতে চাই।

আশ্রম বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন ? অর্থটা পরিষ্কার হচ্ছে না। যেখানে আশ্রয় আছে সেটাই আশ্রম। আশ্রয় তো আপনার আছে।

সিদ্দিকুর রহমান আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন, লোকমান টিক্কায় আগুন ধরিয়ে নতুন তামাক দিয়েছে। এই আম্বরী তামাকের বিশেষত্ব হলো—প্রথম কিছুক্ষণ খুব সুন্দর গন্ধ থাকে। তারপর হঠাৎ গন্ধটা মরে যায়। তিনি

তামাক টানেন গন্ধ মরে না যাওয়া পর্যন্ত। এখন তামাকে টান দিলেন না। মাস্টারের দিকে তাকিয়ে খানিকটা লজ্জিত গলায় বললেন, আশ্রম বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছি সেটা আমিও জানি না।

আপনার কল্পনায় কী আছে ?

আমার কল্পনায় আছে খুব সুন্দর একটা জায়গা। চারদিকে গাছ। চেনা অচেনা গাছ। পানির ঝরনা। অতি নির্জন। কোনো লোকজন নাই। চারদিকে শান্তি।

এরকম একটা জায়গার কথা আপনার মাথায় কী জন্যে এসেছে সেটা কি জানেন ?

একটা বইয়ে এরকম পড়েছিলাম। পড়াটা মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে।

বইটার নাম কী ? লেখকের নাম কী ?

কিছুই মনে নাই। বইটার ঘটনাও মনে নাই। যেটা মনে আছে সেটা হলো— একটা মানুষ আশ্রমে থাকে। মহাশান্তির মধ্যে বাস করে। পাহাড়ি একটা ঝরনা আছে। ঝরনার পানি টলটলা নীল। ঝরনা যেখানে পড়েছে সেখানে পানি জমেছে। মানুষটা নগ্ন হয়ে সেই পানিতে সাঁতার কাটে। এইটুকু মনে আছে। আর কিছু মনে নাই।

আনিস বলল, আপনি আশ্রম কী জন্যে বানাতে চান, নগ্ন হয়ে সাঁতার কাটার জন্যে ?

কথাটা বলেই আনিসের মনে হলো, সে খুবই অসৌজন্যমূলক কথা মানুষটাকে বলেছে। তার কথার মধ্যে ঠাট্টার ভাব প্রবল। এমন একজন বুদ্ধিমান মানুষ ঠাট্টা বুঝবেন না তা হয় না। কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে এবং তিনি তা সহ্য করে যাবেন তা কখনো হবে না।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, মাস্টার, তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করেছ। রসিকতাটা আমি গায়ে মাখলাম না। কারণ ঐ বইটার মানুষটা শুধু যে সাঁতারের সময় নগ্ন থাকতেন তা না। সারাক্ষণই নগ্ন থাকতেন। কে তাকে নিয়ে কী ভাবছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কারণ তিনি বাস করতেন সম্পূর্ণ তার নিজের অঞ্চলে। কেউ সেখানে ঢুকতে পারত না।

আপনি এরকম একটা জায়গা বানাতে চান ?

হ্যাঁ। আমি অনেকখানি জমি কিনেছি। এই বিষয়ে তোমার মতামত কী ?

আনিস বলল, আমি কোনো মতামত দিতে পারছি না। কারণ আপনি কী বলার চেষ্টা করছেন আমি বুঝতে পারছি না। ভাসাভাসা ঘটনা শুনে ভাসাভাসা মত দেয়া যায়।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তোমার ভাসাভাসা মতটা কী ?

আনিস বলল, আমার ভাসাভাসা মতটা হলো, আপনার শরীরটা ভালো না। আপনি অসুস্থ। আপনার ভেতর মৃত্যুচিন্তা ঢুকে গেছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, মাস্টার, আমার মৃত্যুচিন্তা আছে। ভয় নাই। জীবনে একবার বিরাট ভয় পেয়েছিলাম। সেই ভয় আরো একবার পাব। এর বাইরে ভয় পাব না।

কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন ?

সেটা তোমাকে বলব না। আচ্ছা তুমি এখন যাও। এখন আর কথা বলতে ইচ্ছা করতেছে না।

কথা বলার দরকার নাই। দু'জন চুপচাপ বসে থাকি।

আচ্ছা থাকো বসে।

কুঁজা মাস্টার বসে আছে। সিদ্দিকুর রহমান হঠাৎ ব্যাপারটায় মজা পেয়ে গেলেন। দেখা যাক মাস্টার কতক্ষণ বসে থাকতে পারে। একটা ধৈর্যের খেলা হয়ে যাক।

WWW.BDBANGLA.COM

কেউ একজন আমাকে তিনটা ডিকশনারি পাঠিয়েছে। ইংলিশ টু ইংলিশ, ইংলিশ টু বেঙ্গলি এবং বেঙ্গলি টু বেঙ্গলি। প্রেরকের নাম শরিয়তুল্লাহ। ঠিকানা— এগারো তস্তুরিবাজার ঢাকা। আমি শরিয়তুল্লাহ নামের কাউকে চিনি না। তস্তুরিবাজারের শরিয়তুল্লাহ সাহেব জানেন না যে আমার ডিকশনারি প্রয়োজন। একজন জানেন, তিনি মালেক ভাই। তিনি তস্তুরিবাজারে থাকেন না। তিনি থাকেন রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে।

আমার চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছেছে এবং তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক মানুষ আছে যারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়। মালেক ভাই তেমন একজন।

আমি ঠিক করে ফেললাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। পুলিশ ধরলে ধরবে। জেলখানায় তাঁর সঙ্গে থাকতে পারাও হবে ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি সব সময় বলতেন, সব মানুষেরই কিছুদিন জেলে থাকা উচিত। জেল মানুষকে শুদ্ধ চিন্তা করতে শেখায়। পৃথিবীর মহৎ চিন্তার আশি ভাগ করা হয়েছে জেলখানায়।

তাঁর কথা শুনে আমি বলেছিলাম, যে মহৎ চিন্তা জেলখানায় করা যাবে সেই চিন্তা ঘরে বসে করা যাবে না কেন ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, মানুষ যখন শারীরিকভাবে বন্দি থাকে তখন ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতি তার মন মুক্ত করে দেয়। মুক্ত মন ছাড়া মহৎ চিন্তা সম্ভব না।

আমি বললাম, খারাপ চিন্তা কিংবা নিচ চিন্তা করার জন্যে আমরা কোথায় যাব ?

তিনি বললেন, জেলখানা। সৎ চিন্তা যেখানে হবে অসৎ চিন্তাও সেখানেই হবে। তাছাড়া ইকুইলিব্রিয়াম হবে না। প্রকৃতি ইকুইলিব্রিয়াম চায়।

ডিকশনারি হাতে পাওয়ার পর পরই আমি ঠিক করেছি, মালেক ভাই জেলখানা থেকে ছাড়া পেলেই তাকে বিশ্রামের জন্যে কিছুদিন এখানে নিয়ে আসব। জেলখানার লাপসি খেয়ে খেয়ে যে অভ্যস্ত তার সামনে সপ্তম ব্যঞ্জন দিলে সে কী করবে ?

মালেক ভাই কী করবেন আমি জানি। তিনি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকবেন তারপর ভারী গলায় বলবেন—

'নগরের এক প্রান্তে প্রচুর খাবার কিন্তু কোনো ক্ষিধে নেই।
অন্য প্রান্তে প্রচুর ক্ষিধে কিন্তু কোনো খাবার নেই।'

মালেক ভাইয়ের সামনে যতবার ভালো কোনো খাবার দেয়া হয়েছে ততবারই তিনি এই কথা বলেছেন। কিন্তু ভালো খাবার খেয়েছেন খুব আগ্রহ নিয়ে। কোনো এক বাড়িতে উনি হয়তো গলদা চিংড়ি খেলেন। এই গল্প তিনি করবেন কম করে হলেও পঞ্চাশবার। মুগ্ধ গলায় বলবেন— আহা কী রান্না! স্বাদ মুখে লেগে গেছে। বাবুর্চির হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়া দরকার।

সমস্যা হচ্ছে, এই বাড়িতে তাঁকে আনা যাচ্ছে না। কারণ আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। আমার মন টিকছে না। আমি এখানে বিশাল এক বাড়িতে বাস করি। চারদিকে খোলা প্রান্তর। অথচ আমার নিজেকে সারাক্ষণ বন্দি মনে হয়। কোনো রকমে যদি জেলে ঢুকতে পারতাম তাহলে হয়তো উল্টা ব্যাপার হতো। নিজেকে মুক্ত মনে হতো।

এই বাড়িতে থাকতে না চাওয়ার পিছনে আরো একটা বড় কারণ আছে। কারণটা হাস্যকর। লীলাবতী নামের মেয়েটাকে আমি প্রতিরাতেই স্বপ্নে দেখছি। অতি বিচিত্র সব স্বপ্ন। পরশু রাতে দেখেছি দুজন নৌকায় করে কোথাও যাচ্ছি। বেশ বড় পালতোলা নৌকা। নৌকা চলছে। বাইরে রোদ। আমি রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছই-এর ভেতর শুয়ে আছি। লীলাবতী ছই-এর বাইরে। সে বলল, চারদিকে এত সুন্দর দৃশ্য আর তুমি যাচ্ছ ঘুমাতে ঘুমাতে! উঠ তো। আমি বললাম, ঘুম পাচ্ছে তো। সে বলল, আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাও। আমি বললাম, তাহলে তুমি ভেতরে আসো। আমি বাইরে যাব না। বাইরে রোদ। সে বলল, তোমার গায়ে রোদ লাগবে না। আমি শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখব।

স্বপ্নের শেষ অংশটা ভয়াবহ। আমি নৌকার গলুই-এ লীলাবতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। লীলাবতী রোদ থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে আমার মুখের উপর শাড়ির আঁচল ধরে আছে। শাড়ির আঁচলের ভেতর থেকে লীলাবতীর হাসি হাসি মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি।

এই ধরনের স্বপ্ন দেখার অর্থ একটাই— আমি সমস্যায় পড়েছি। ভয়াবহ সমস্যা। সমস্যায় পড়ার কোনো কারণ কিন্তু নেই। লীলাবতীর সঙ্গে আমার দেখা হয় না বললেই হয়। আর দেখা হলেও কথা হয় না। তবে এক সন্ধ্যায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা এরকম— আমি বসে অপেক্ষা করছি, আমার

দুই ছাত্রী হারিকেন হাতে উপস্থিত হবে। তারা এলো না। চাদরে শরীর ঢেকে উপস্থিত হলো লীলাবতী। সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, মাস্টার সাহেব, ভালো আছেন ?

আমি বললাম, জি।

হাতে বেত নিয়ে বসে আছেন কেন ?

আমি হাতের বেত নামিয়ে রাখলাম। একটু মনে হয় অপ্রস্তুত বোধ করলাম। লীলাবতী বলল, জইতরী কইতরী দুজনই আপনাকে প্রচণ্ড ভয় পায়। এটা কি ভালো ?

আমি বললাম, শিক্ষককে ভয় পাওয়া ভালো। শিক্ষক খেলার সাথি না। আমি তাদের সঙ্গে সাপ-লুডু খেলি না।

আপনি বেত দিয়ে তাদের মারেন ?

মাঝে মাঝে শাসন করতে হয়। মানুষকে সবসময়ই কিছু অপ্রিয় প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। শিক্ষকের শাসন সেরকম একটা বিষয়। অপ্রিয় কিন্তু প্রয়োজনীয়।

লীলাবতী শান্ত গলায় বলল, আপনি কিন্তু শাসন করার জন্যে তাদের মারেন না। আমি আড়াল থেকে কয়েকবার দেখেছি। আপনি তের ঘরের নামতা জিজ্ঞেস করেন। এরা দুইজনেই তের ঘরের নামতা জানে। আপনাকে ভয় পেয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। আপনি এই সুযোগটা গ্রহণ করেন।

আমি চুপ করে রইলাম। লীলাবতী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার চোখে সামান্য উত্তেজনাও নেই। তার তাকানোর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে তৈরি হয়ে এসেছে।

মাস্টার সাহেব!

জি।

তের ঘরের নামতা আপনার একটা অজুহাত। আমি একবার শুনলাম জইতরী ঠিকই বলল চার তের বাহান্ন। তারপরেও আপনি তাকে মারলেন। আপনার সমস্যাটা কী ? আপনি নিজে কি তের ঘরের নামতা জানেন ? আমার তো ধারণা আপনি নিজেই জানেন না।

বলতে বলতেই লীলাবতী হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরে রাখা বেতটা টেনে নিল। এবং কঠিন গলায় বলল, বলুন সাত তের কত ? এক্ষুনি বলুন। এক্ষুনি বলতে না পারলে কিন্তু আপনার সমস্যা আছে।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কী করছে এই মেয়ে ? তার হাতে বেত। সে বেতটা দোলাচ্ছে। জইতরী-কইতরীকে পড়াবার সময় আমি যেভাবে বেত দোলাতাম অবিকল সেইভাবে। লীলাবতী বলল, দেরি করবেন না এক্ষুনি বলুন।

একানব্বুই।

লীলাবতী হেসে ফেলে বলল, হয়েছে। আপনি কী ভেবেছিলেন ? আপনাকে মারব ?

লীলাবতী উঠে চলে গেল। আমার হতভম্ব ভাব কাটছে না। আমি বসেই আছি। কখন যে জইতরী-কইতরী এসেছে, মাথা দুলিয়ে পড়তে শুরু করেছে আমার খেয়াল নেই। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, কেমন আছ তোমরা ?

দুই বোন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কইতরীর চোখে তীব্র আতঙ্ক। আমি বুঝতে পারছি সে টেবিলের নিচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে জইতরীর হাঁটু ধরেছে। আমি বললাম, আজ আমার শরীরটা ভালো না। আজ পড়াব না।

জইতরী ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার, চলে যাব ?

আমি বললাম, হুঁ।

আমি আমার জায়গায় বসে আছি। শুনতে পাচ্ছি মেয়ে দুটি মঞ্জু সাহেবের ঘরে ঢুকে বিরাট হৈচৈ শুরু করেছে। তিনজন মিলে কোনো একটা খেলা বোধহয় খেলছে। মঞ্জু সাহেব অদ্ভুত ভাষায় কিছু বলছেন, মেয়ে দুটিও অদ্ভুত ভাষায় তাঁর কথার জবাব দিচ্ছে। কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে আমি অদ্ভুত ভাষার রহস্য উদ্ধার করলাম।

মঞ্জু সাহেব বললেন, তিটমরা কিটি কিটরো ? যার অর্থ— তোমরা কী করো ? জইতরী বলল, মিটজা কিটরি। অর্থ হলো, মজা করি। বাচ্চা দুটি কী সুখেই না আছে! মঞ্জু সাহেব যে আনন্দ নিয়ে এদের সঙ্গে খেলছেন আমি কোনোদিনও এত আনন্দ নিয়ে কারো সঙ্গে খেলতে পারব না। খেলতে পারলে ভালো হতো। লীলাবতীকে বলতাম, তিটুমি কিটেমন ইটাছ ? (তুমি কেমন আছ ?) সে বলত, ভিটালো (ভালো)। আমি বলতাম, বিটসো (বসো)। সে বলত, কিটি কিটরেন ? (কী করেন ?) আমি বলতাম...

আমি রাতে ভাত খেলাম না। রাগ করে খেলাম না তা না। ভাত না খাওয়ার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য কাজ করছিল। কোনোভাবে লীলাবতীর কাছে খবর যাবে আমি ভাত খাই নি। সে আসবে আমার কাছে। আমাকে বলবে, আমার উপরে রাগ করে ভাত খাচ্ছেন না— এটা কেমন কথা ? খেতে বসুন।

লীলাবতী এলো না। আমি তিনটা পর্যন্ত জেগে বসে রইলাম। সেই রাতে যথারীতি আবারো লীলাবতীকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি ভাত খাচ্ছি। সে আমার সামনে বসে আছে। তার হাতে বেত, মুখে হাসি। আমি বললাম, তুমি বেত হাতে বসে আছ কেন?

সে বলল, তুমি খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে আর আমি তোমার মাথায় বেতের বাড়ি দেব। বেশি করে ভাত নাও।

আমি ভাত নিলাম। সে বলল, এখন আমাকে বলো যূথি মেয়েটা কে? তুমি যতবার অসুস্থ হও ততবার যূথিকে ডাকো।

যূথি আমার খালাতো বোন। ওর বিয়ে হয়ে গেছে।

বিয়ে হোক বা কুমারী থাক, খবরদার আর কখনো যূথির নাম মুখে আনবে না।

আচ্ছা।

যদি আবার কোনোদিন যূথির নাম মুখে আনো আমি কিন্তু বেত দিয়ে তোমাকে মারব।

আমার যে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি সেটা বুঝতে পারছি। সুস্থ মাথার মানুষ রোজ রাতে একই ধরনের স্বপ্ন দেখবে না। স্বপ্ন ছাড়াও আমার অসুস্থতার আরো একটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। দস্তয়েভস্কির *ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্টের* অনুবাদ এখন বন্ধ। এখন আমি খাতায় গুটিগুটি করে একটা শব্দই লিখি। শব্দটা— লীলাবতী। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এই জিনিস। আমার হাতে লেখা এক পৃষ্ঠায় থাকে পঁচিশ লাইন। প্রতি লাইনে লীলাবতী লেখা হয় আটবার। অর্থাৎ পৃষ্ঠায় দুইশবার করে এই নাম লেখা হচ্ছে। আমি তিনশ' আঠারো পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি। তার মানে এখন পর্যন্ত আমি ছয়ত্রিশ হাজার ছয়শবার লিখলাম— লীলাবতী। খারাপ কী!

মালেক ভাই যদি শুনেন আমার এই অবস্থা, তিনি কী করবেন? প্রথমে কিছুক্ষণ হাসবেন। তাঁর বিখ্যাত ছাদ ফাটানো হাসি। তারপর বলবেন, তোমার নাম বদলে মজনু রাখলে কেমন হয়? শোনো আনিস, জায়গির মাস্টারের সঙ্গে জায়গির বাড়ির মেয়ের প্রেম প্রায় শাশ্বত বাংলার বিষয়। এই বাংলায় এমন কোনো জায়গির শিক্ষক ছিলেন না যার সঙ্গে সেই বাড়ির কোনো মেয়ের প্রেম হয় নাই। অন্য কিছু কি করা যায় না? নতুন কিছু করো। সবচে' ভালো হয়, এই লাইনটা যদি ছেড়ে দাও। তোমার ক্ষমতা আছে। ক্ষমতা ব্যবহার করো।

একমাত্র মালেক ভাই বলেছেন আমার ক্ষমতা আছে। আমি জানি, যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা। এই ক্ষমতার সবচে' বড় প্রকাশ, লীলাবতী লিখে পাতা ভরানোতে সীমাবদ্ধ। কোনো বানান ভুল হবে না। লাইন সোজা হবে। প্রতি পৃষ্ঠায় দুশবার করে লেখা হবে। অক্ষরগুলিও হবে সুন্দর। এর বেশি ক্ষমতা আমার নেই। তবে এই ক্ষমতাও অগ্রাহ্য করার মতো না।

বিডিবাংলা ডট কম

ভিটাবাড়িতে লিচুগাছ লাগানো নিষেধ।

যে ভিটাতে ফলবান লিচুবৃক্ষ থাকে সেই ভিটা জনশূন্য হয়— এই প্রবাদ আছে। তারপরেও শহরবাড়ির সামনে সিদ্দিকুর রহমান দুটি লিচু গাছ লাগিয়েছেন। দশ বছরেই গাছ দুটি বিশাল আকৃতি নিয়েছে। গত তিন বছর থেকে ফল দিচ্ছে। বৈশাখে গাছ দুটি লাল টকটকে হয়ে যায়। দূর থেকে মনে হয় গাছে আগুন ধরে গেছে। সিদ্দিকুর রহমান হুকুম দিয়েছেন, গাছের লিচু গাছেই থাকবে। কারোর লিচু খেতে ইচ্ছা হলে সে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে।

গত বছর সিদ্দিকুর রহমান লিচুতলা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ হঠাৎ তিনি এখানে এসে বসেন। তাঁর বসার সময়ের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই বলেই লিচুতলা সবসময় ঝকঝকে রাখা হয়। বাঁধানো অংশে একটা শুকনো পাতাও পড়ে থাকে না।

মঞ্জু লিচুতলায় বসে আছেন। তার সামনে জইতরী। দু'জন গভীর মনোযোগে সাপলুডু খেলছে। কইতরী বসে আছে মঞ্জুর গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে। সাপলুডু খেলা জটিল আকার ধারণ করেছে। দুটি গুটিই পাশাপাশি যাচ্ছে। জইতরী সাপের মুখে পড়ে পিছিয়ে পড়েছিল, কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ি পেয়েছে।

বাজির খেলা হচ্ছে। বাজির পরিমাণ সামান্য না, এক টাকা। জইতরীর কাছে টাকা নেই। সে বলেছে, সে যদি হারে তবে টাকাটা দেবে ঈদের পরে। ঈদে সে সালামি পায়। সালামির টাকা থেকে দেবে। মঞ্জু এই শর্তে রাজি আছেন। কইতরী বোনের গুটি চালানো কঠিন চোখে লক্ষ করছে। জইতরীর নাকি চোরামি করার স্বভাব আছে। চার উঠলে সে পাঁচ চেলে গুটিকে সিঁড়ির মুখে নিয়ে যায়। কইতরীর কঠিন চোখের সামনে জইতরী এই সুযোগ পাচ্ছে না।

দুটি গুটিই এখন নিরানব্বই-এর ঘরে আটকে আছে। এক না উঠলে খেলা জেতা যাবে না। যার আগে উঠবে সে-ই জিতবে। মঞ্জু প্রতিবারই দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দিয়ে দান দিচ্ছেন। লাভ হচ্ছে না।

খেলার এই পর্যায়ে মঞ্জু বললেন, আমি আর টেনশন নিতে পারছি না। একটা কাজ করলে কেমন হয়— এসো লটারি করি। একটা কাগজে তোমার নাম লেখা থাকবে। একটাতে থাকবে আমার নাম। কইতরী কাগজ টানবে। যার নাম উঠবে সে-ই জিতবে। জইতরী, রাজি আছো ?

জইতরী বলল, হুঁ।

যাও তাহলে কাগজ-কলম নিয়ে আসো। আমার লটারির ভাগ্য অবশ্যি খুবই ভালো। আমার জিতে যাওয়ার কথা। তার উপর আজ রবিবার।

রবিবারে কী হয় ?

রবিবার হলো আমার জন্মবার। জন্মবারে মানুষের ভাগ্য থাকে সবচে' ভালো। আমি যে জিতব এটা নিয়েও এখন বাজি রাখতে পারি।

লুডুর বাজিতে জইতরী জিতল। মঞ্জুর এমন মনখারাপ হলো যে জইতরীর মনখারাপ হয়ে গেল। এত বড় মানুষ কিন্তু কী ছেলেমানুষ! বাজিতে হেরে কাঁদো কাঁদো মুখ হয়ে গেছে। জইতরীর ইচ্ছা করছে, এক টাকার নোটটা ফেরত দিয়ে দেয়।

মঞ্জু বললেন, আরেক দান খেলবে ? এইবার দুই টাকা বাজি। তুমি হারলে এখন দিবে এক টাকা, বাকি এক টাকা দিবে ঈদের দিন।

ঈদ পর্যন্ত আপনি থাকবেন ?

না থাকলেও ঈদের দিন টাকা নিতে আসব।

দ্বিতীয় দফায় খেলা শুরু করার আগেই বদু এসে খবর দিল, চাচাজি আপনারে ডাকে। জইতরী এবং কইতরী দুই বোনের মুখ একসঙ্গে কালো হয়ে গেল। বাবার ভয়ে এরা সবসময় অস্থির হয়ে থাকে।

সিদ্দিকুর রহমান পুকুরঘাটে বসেছিলেন। তাঁর পেছনে লোকমান ছাতা ধরে আছে। আকাশ মেঘলা। ছাতা ধরার প্রয়োজন নেই। এই সত্য লোকমানও জানে। তারপরেও সে ছাতা ধরে আছে। এমনভাবে ধরেছে যেন সত্যি সত্যি রোদ আটকাচ্ছে।

সিদ্দিকুর রহমান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, মঞ্জু, তুমি সোনালু গাছ চেনো ?

মঞ্জু বললেন, জি না।

চল তোমাকে গাছ দেখায়ে আনি।

সোনালু গাছ দেখার চেয়ে জইতরী-কইতরীর সঙ্গে লুডু খেলতে পারলে মঞ্জুর ভালো লাগত। তার মতে গাছপালা আয়োজন করে দেখার কিছু না। মানুষটা এমন যে মুখের উপর না করা যায় না। মেজাজি মানুষ। ছেলেকে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছে। কারোর তাতে কিছু যাচ্ছে আসছে এমনও মনে হচ্ছে না। সবাই এমন ভাব করছে যেন এটা কোনো বিষয়ই না। কারোর কাছে যখন বিষয় না তখন মঞ্জুর কাছেও বিষয় না। সে এই কারণেই মহানন্দে লুডু খেলে বেড়াচ্ছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, হলুদ রঙের লতানো ফুল হয়। চৈত্রমাসে ফুল ফোটে। তখন মনে হয় হলুদ চুলের কোনো মেয়ে চুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার খুবই পছন্দের গাছ। তোমার কি কোনো পছন্দের গাছ আছে?

জি না। সব গাছ আমার কাছে একরকম মনে হয়। ডালপালা, পাতা।

বটগাছও আমার পছন্দ। তবে সব বট না— মহাবট।

মহাবট কোনটা?

বটগাছেরও নানান রকমফের আছে। মহাবট দেখার জিনিস। কালিগঞ্জে একটা মহাবট আছে। আমি যখন দেখতে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি একশ' আঠারোটা ঝুড়ি।

আপনি বসে বসে ঝুড়ি গুনেছেন?

বসে বসে গুনি নাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনেছি। গাছভর্তি হরিয়াল পাখির আস্তানা। হরিয়াল পাখি চেনো?

জি না।

হরিয়াল পাখি বটের ফল ছাড়া কিছু খায় না। সব পাখি মাংসাশী, শুধু হরিয়াল নিরামিষ পাখি। এই পাখি ফল ছাড়া কিছু খায় না বলে এর মাংসও অতি স্বাদু। তুমি হরিয়ালের মাংস খেয়েছ?

জি না।

আচ্ছা তোমাকে হরিয়ালের মাংস খাবার ব্যবস্থা করব।

আপনার সোনালু গাছ আর কত দূরে?

এই তো এসে গেছি।

মঞ্জু প্রায় বলেই ফেলছিল, এতদূর এসে গাছ দেখে পোষায় না। কথা মুখে আটকে গেল। সোনালু গাছ দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি তিনটা গাছ। গাছের গা ঘেঁসে যাচ্ছে নদীর পানি।

নদীর নাম ভোমরা। শীতের সময় পানি থাকে না, বর্ষায় পানি হয়, সেই পানি থাকে ভদ্র পর্যন্ত।

মঞ্জু বৃক্ষপ্রেমিক কিংবা প্রকৃতি-প্রেমিক কোনোটাই না, তারপরেও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল— বাহ্!

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে?

অবশ্যই। অবশ্যই পছন্দ হয়েছে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি বলেছিলাম তোমাকে সামান্য সম্মান করতে চাই, মনে আছে না?

জি মনে আছে।

এই জায়গাটা আমার। তিন বিঘার মতো জমি। জমিটা আমি তোমাকে লিখে দিতে চাই। যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

মঞ্জু হতভম্ব গলায় বললেন, কী বলেন এইসব!

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি এখন চলে যাব। তুমি একা কিছুক্ষণ থাকো। দেখ কেমন লাগে। দুপুর একটার সময় ভোমরা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন যাবে। অতি সুন্দর দৃশ্য।

মঞ্জুর চোখ থেকে হতভম্ব ভাব এখনো দূর হয় নি। সিদ্দিকুর রহমান মানুষটাই বিচিত্র প্রকৃতির— এটা ঠিক আছে। যত বিচিত্রই হোক কোনো মানুষই নিতান্ত অপরিচিত একজনকে তিন বিঘা জমি দিয়ে দেয় না।

সিদ্দিকুর রহমান ডাকলেন, নিরঞ্জন আছ?

সোনালু গাছের আড়াল থেকে নিরঞ্জন বের হয়ে এলো। ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা খালি গায়ের একজন বয়স্ক মানুষ। মাথার চুল সবই পাকা। সে বের হয়েই হাতজোড় করে আছে।

নিরঞ্জন!

জে আজ্ঞে!

মঞ্জুকে জায়গা দেখাও। সীমানা কোন পর্যন্ত বুঝায়ে বলো।

জে আজ্ঞে।

রান্নাবান্না করেছ না?

নিরঞ্জন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, অতিথি রেখে গেলাম, যত্ন করে খাওয়াবে।

নিরঞ্জন আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। সে এখনো জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি মাটির দিকে।

সিদ্দিকুর রহমান নদীর পাড় ঘেঁসে হাঁটছেন। তিনি কোথায় যাবেন সেটা লোকমান ধরার চেষ্টা করছে। হয়তো তিনি নদী পার হবেন। নদী পার হবার

সাঁকো অনেক দূরে। কোনো কোনো দিন উনার হাঁটতে ভালো লাগে। আজ কি সেরকম একটা দিন? তিনি দ্রুত হাঁটছেন। এত দ্রুত যে লোকমান তাল মিলিয়ে আসতে পারছে না। মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছে।

লোকমান!

জি।

মঞ্জু মানুষটা কেমন বলো দেখি।

ভালো।

কী কারণে ভালো?

লোকমান জবাব দিতে পারল না। চাচাজি মাঝে-মধ্যেই এমন সব প্রশ্ন করেন যার জবাব দেয়া যায় না। অথচ তিনি জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা করেন।

কেন ভালো বলতে পারলা না?

জে না।

মানুষটার মধ্যে মায়া বেশি। সে জইতরী-কইতরীকে কেমন মায়া করে, দেখো নাই?

জি দেখেছি।

পশুপাখির মধ্যে কি মায়া আছে লোকমান?

জি আছে।

সামান্য ভুল বলেছ। পশুর মধ্যে মায়া আছে। পাখির মধ্যে নাই। পাখি মায়ার বশ হয় না। পশু হয়। ঠিক বলেছি?

জি।

এইখানে একটা কথা কিন্তু আছে লোকমান। মানুষ মায়া দিয়ে পশু বশ করার চেষ্টা করেছে। পাখি বশের চেষ্টা কখনো করে নাই। কেন করে নাই জানো?

জে না।

পশুর কাছ থেকে মানুষ উপকার পায়। পাখির কাছ থেকে পায় না। পাখির কাছ থেকে উপকার পাওয়া গেলে মানুষ পাখি বশ করার চেষ্টা নিত। এখন বুঝেছ?

জি।

এখন বলো মঞ্জু নামের লোকটাকে আমি জমি দিতেছি কেন?

জানি না।

আমি মায়া দিয়ে লোকটাকে বশ করার চেষ্টা নিতেছি। আমার নিজের মধ্যে কিন্তু মায়া নাই। তারপরেও আমি মায়ার খেলা খেলি। কেন খেলি জানো?

জি না।

মায়ার খেলা বড় মজার খেলা এইজন্যে খেলি। আরেকটা মজার খেলা হলো ঘৃণার খেলা। এই খেলাটা আমি আমার ছেলের সঙ্গে খেলতেছি।

নদী পারাপারের সাঁকো এসে গেছে। সিদ্দিকুর রহমান সাঁকোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। সাঁকো পার হবেন কি হবেন না এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাঁর মাথার উপর চিল উড়াউড়ি করছে। তিনি এখন আগ্রহ নিয়ে চিলের উড়াউড়ি দেখছেন।

লোকমান!

জি।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাখি বশ করার চেষ্টা নিব। ভালো হবে না?

জি ভালো হবে।

গইড়ার ভিটায় রোজ একবেলা ধান ছিটায়ে দিবা। যেন পাখি এসে ধান খেতে পারে। প্রতিদিন একটা বিশেষ সময়ে আধমণ ধান।

জি আচ্ছা।

আজ কি বার?

বুধবার।

শুক্রবার থেকে শুরু করবা।

জি আচ্ছা।

ধান ছিটায়ে দিয়ে চলে আসবা। কেউ থাকবা না।

গরু-ছাগল ধান খাইয়া ফেলবে।

কাঁটাতারের বেড়া থাকবে। গরু-ছাগল ঢুকবে না।

জি আচ্ছা।

চল গইড়ার ভিটার দিকে যাই।

সিদ্দিকুর রহমান হাঁটতে শুরু করেছেন। লোকমান চিন্তিত বোধ করছে। গইড়ার ভিটার মতো এত বড় এলাকায় কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দেয়া অতি কঠিন কাজ। এক-দুই দিনের কাজ না। কাঁটাতার আনতে ময়মনসিংহ যেতে হবে। খুঁটি পুততে হবে। বিরাট ঝামেলা।

WWW.BDBANGLA.COM

গইড়ার ভিটায় এসে লোকমান ধাক্কার মতো খেল। অনেক লোকজন সেখানে খুঁটি পোতার কাজ করছে। কাঁটাতার লাগাচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমানকে দেখে হেড মিস্ত্রি রশিদ এগিয়ে এলো। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, শুক্রবারের মধ্যে কাজ শেষ হবে না ?

রশিদ বলল, অবশ্যই।

লোকমানের মনটা খারাপ হয়েছে। বেশ খারাপ। এমন বিশাল কর্মকাণ্ড অথচ সে কিছুই জানে না।

মঞ্জু দুপুরে খুব আরাম করে খেয়েছেন। সবই নিরামিষ— বেগুন, ভাজি, শাক, আলু ভর্তা, ডাল। প্রতিটি খাবারই অতি সুস্বাদু। মঞ্জু বললেন, নিরঞ্জন ভাই, আপনি কি দ্রৌপদী বলে কারোর নাম শুনেছেন ?

নিরঞ্জন না-সূচক মাথা নাড়ল।

মঞ্জু বললেন, দ্রৌপদী ছিল এই পৃথিবীর সেরা রাঁধুনি। আপনার রান্না খেয়ে বুঝেছি সে আপনার দাসী হবার যোগ্যও না। বুঝেছেন আমার কথা ?

হুঁ।

আপনি আমার কথা কিছুই বুঝেন নাই। যাই হোক, না বুঝলে নাই। আপনার কাছে আমি রান্না শিখব। বুঝেছেন ?

হুঁ।

প্রতিদিন আমি আসব। একটা করে আইটেম আমাকে শিখাবেন। পারবেন না ?

হুঁ।

প্রথম শিখাবেন আলুভর্তা। এইটাই মনে হয় সবচে' সোজা। সোজাটা দিয়েই শুরু হোক। ঠিক আছে ?

হুঁ।

আপনার কাছে সব রান্না শিখে আমি একটা ভাতের হোটেল দিব। হোটেলের নাম দিব— নিরঞ্জনের ভাতের হোটেল। ঠিক আছে ?

হুঁ।

আপনি কি মাছ-মাংস রাঁধতে পারেন ?

পারি।

কাল মাছ খাওয়াবেন। পারবেন না ?

হুঁ।

কাল আমি দুজন অতিথি নিয়ে আসব। জইতরী কইতরী। ঠিক আছে ?

হুঁ।

সকালবেলা এই দুইজনকে নিয়ে চলে আসব, সন্ধ্যাবেলা যাব। নদীর পাড়ে বসে লুডু খেলব। জইতরী-কইতরী এই দুইজনকে চিনেন ?

না।

সিদ্দিক সাহেবের দুই মেয়ে। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমি আমার জীবনে দেখি নাই। দেখব বলেও মনে হয় না। আর না দেখাই ভালো। ভালো জিনিস কম দেখতে হয়। ভালো জিনিস বেশি দেখলে ভালোর মান থাকে না।

নিরঞ্জন বলল, হুঁ।

মঞ্জু বললেন, আপনি হুঁ ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন ?

নিরঞ্জন জবাব দিল না। মঞ্জু বলল, করেন কী আপনি ? এইখানে একা থাকেন ?

হুঁ।

বউ ছেলেমেয়ে নাই ?

আছে।

তাহলে একা থাকেন কেন ?

নিরঞ্জন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি পতিত হইছি, আমার জাইত গেছে। আমারে সমাজ থাইক্যা বাইর কইরা দিছে। এইজন্যে একলা থাকি। বড় সাব আমারে পালে।

পতিত হয়েছেন কেন ?

বড় সাহেবের জন্যে একদিন গো-মাংস রান্না করছিলাম, এইজন্যে পতিত হইছি।

বলেন কী ? শুধু রান্না করার জন্যে সমাজ থেকে বের করে দিয়েছে! খেয়ে দেখেন নি!

আমি নিরামিষ ছাড়া কিছু খাই না।

মঞ্জুর মন মায়ায় ভরে গেল। আহা বেচারা। তার জন্যে কিছু করা উচিত।

জইতরী দুপুরে খায় নি। সে খুবই মন খারাপ করেছে কারণ মঞ্জুমামা লুডু খেলা নিয়ে একটা অন্যায় করেছেন। ইচ্ছা করে বাজিতে হেরে জইতরীকে জিতিয়ে দিয়েছেন। লটারির দুটা কাগজেই জইতরীর নাম লিখেছেন। সে কাগজ দেখে টের পেয়েছে। জইতরী এভাবে বাজি জিততে চায় নি। জইতরী ঠিক করেছে,

সে আর কোনো দিনই মঞ্জুমামার সঙ্গে কথা বলবে না। বড় পীর সাহেবের কসম— কথা বন্ধ। জইতরী জানে সবচে' কঠিন কসম— বড় পীর সাহেবের কসম। এই কসম ভাঙা মানেই মৃত্যু। কিছুক্ষণ পরই জইতরীর মনে হলো, সে একটা ভুল করে ফেলেছে। বড় ভুল। মঞ্জুমামার সঙ্গে কথা না বলে সে থাকতে পারবে না। তাকে যা করতে হবে তা হলো কসম ভাঙানোর ব্যবস্থা। একেক কসম একেকভাবে ভাঙাতে হয়। শুধু আল্লাহর নামে যে কসম সেটা ভাঙতে কিছু করতে হয় না। আল্লাহপাক কসম ভাঙলে রাগ করেন না। নাপাক অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া যায় কিন্তু বড়পীর সাহেবের নাম নেয়া যায় না।

জইতরী মন খারাপ করে ঘুরছে। পীর সাহেবের নামের কসম ভাঙানোর উপায় বের করতে পারছে না। এইসব জিনিস সবচে' ভালো জানেন মা। তাঁকে আজ কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। তাঁর মাথা আজ অতিরিক্ত গরম। যখন তাঁর মাথা অতিরিক্ত গরম থাকে তখন তিনি কাউকে চিনতে পারেন না। আজ জইতরী কয়েকবার তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে গিয়েছে। তিনি জইতরীকে চিনতে পারেন নি।

এই বিষয় নিয়ে সে নতুন বউকেও জিজ্ঞেস করতে পারে। পরীবানু নামের এই মেয়েটা নিশ্চয়ই কসম ভাঙার বিষয় জানে। সমস্যা একটাই, নতুন বউয়ের সঙ্গে তার এখনো কোনো কথা হয় নি। জইতরী আগ বাড়িয়ে কারোর সঙ্গে কথা বলে না। পরীবানুও মনে হয় তার মতো। সেও আগ বাড়িয়ে কথা বলে না। বেশির ভাগ সময় নিজের ঘরে বসে থাকে। ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করে। জইতরী দেখেছে হাঁটাহাঁটির সময় এই মেয়ে নিজের মনে কথা বলে। বিড়বিড় করে কথা। জইতরীর সঙ্গে এখানেও তার মিল আছে। জইতরীও নিজের মনে কথা বলে।

পরীবানু খাটে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। তার ঘরের দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে পরীবানুর গায়ে। অন্ধকার ঘরে পরীবানুর গায়ে রোদ পড়ার কারণে ঝলমল করছে। বারান্দা থেকে এই দৃশ্য দেখে জইতরীর এতই ভালো লাগল যে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। পরীবানু বলল, জইতরী কিছু বলবে ?

জইতরী বলল, না।

পরীবানু বলল, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। মন এত খারাপ থাকে, কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তুমি মনে কিছু নিও না। আসো আমার পাশে বসো। দুইজনে কিছুক্ষণ গল্প করি।

জইতরী খাটে উঠে বসল। পরীবানু বলল, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি আমার জীবনে দেখি নাই। তুমি যখন শাড়ি পরা ধরবে তখন তোমাকে নিয়া আমি একটা গীত বাধব।

জইতরী বলল, তুমি গীত বাধতে জানো ?

পরীবানু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, জানি। গীত বাধতে জানি, গাইতেও জানি। সবেরে অবশ্যি মিথ্যা কইরা বলি আমি কিছু জানি না।

মিথ্যা বলো কেন ?

নিজেরে আড়াল রাখার জন্যে মিথ্যা বলি। মেয়েছেলেদের নিজেদের আড়াল করার জন্যে অনেক কিছু করতে হয়। তুমি নিজেও করো। করো না ?

জইতরী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। পরীবানুকে তার সামান্য পছন্দ হতে শুরু করেছে। জইতরী বলল, আমি বড় পীর সাহেবের নামে কসম কাটছি! এখন কসম ভাঙব। আমার কী করা লাগবে তুমি জানো ?

জানি।

জানলে বলো।

বড়পীর সাহেবের উপরে যিনি তাঁর নামে কসম ভাঙতে হবে। বড়পীর সাহেবের উপরে আছেন আমাদের নবী-এ করিম। তার নামে কসম ভাঙবা। কী নিয়া কসম কাটছিলা ?

জইতরী কসমের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লক্ষ করল, কথা বলতে তার ভালো লাগছে। শুধু যে ভালো লাগছে তা না, যতই কথা বলছে পরীবানু মেয়েটাকে তার ততই ভালো লাগছে। পরীবানু বলল, তুমি কি মঞ্জু নামের মানুষটারে খুব ভালো পাও ?

হুঁ।

খুব বেশি ভালো পাও ?

হুঁ।

তোমারে একটা উপদেশ দেই, মন দিয়া শোনো। নিকট আত্মীয়ের বাইরে কোনো পুরুষমানুষরে মেয়েদের বেশি ভালো পাওয়া উচিত না।

জইতরী বলল, উচিত না কেন ?

মেয়েছেলের মন অন্যরকম। মেয়েছেলে সবসময় ভালো যারে পায় তারে নিয়া সংসার করতে চায়। তুমি যখন আরেকটু বড় হইবা তখন বুঝবা। এখন বুঝবা না। তুমি বড়পীর সাহেবের নামে কসম কাটছ, মঞ্জু নামের মানুষটার সাথে কথা বলবা না। কসম না ভাঙাই ভালো। কসম ভাঙাইবা না।

পরীবানু পা দোলাচ্ছে। তার আচার-আচরণ স্বাভাবিক। সে কথা বলার সময় জইতরীর দিকে তাকাচ্ছেও না। কথা বলছে সহজ-স্বাভাবিক গলায়। অথচ এমনভাবে কথা বলছে যেন সে সবই জানে।

বিডিবাংলা ডট কম

জইতরী।

হুঁ।

আমার কথায় তুমি কিছু মনে নিও না। আমার মন মিজাজ ভালো না। কখন কী বলি তার নাই ঠিক।

পরীবানু চোখ মুছল। সহজ-স্বাভাবিকভাবে যে মেয়ে কথা বলছিল মুহূর্তেই তার চোখে পানি। জইতরী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। পরীবানু চোখ মুছে হেসে ফেলে বলল—

'ক্ষণেকে চোখে পানি ক্ষণেকে হাসি
সেই কন্যা হয় রাক্ষস রাশি।'

WWW.BDBANGLA.COM

সিদ্দিকুর রহমান আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

নানান ধরনের পাখি ধান খাচ্ছে। কাক, শালিক, কবুতর, টুনটুনি, সাতরা পাখি। গ্রামাঞ্চলে কাক থাকে না। এই দুই দাড়কাক কোত্থেকে এসেছে? তিনি আগ্রহ নিয়ে কাক দুটিকে দেখছেন। সাধারণ কাকের দ্বিগুণ আয়তন। চোখ টকটকে লাল। পাখিসমাজ এই দু'জনকে সমীহের চোখে দেখছে। কাক দুটির উপর দিয়ে বিকট শব্দ করে অচেনা একটি পাখি উড়ে গেল। কাক দুটি নড়ল না। আবার ঘাড় কাত করে দেখারও চেষ্টা করল না কী হচ্ছে।

পাখির সংখ্যা গুনতে পারলে ভালো হতো। দিন দিন পাখির সংখ্যা বাড়ে না কমে এটা দেখা যেত। একজন কাউকে কি রেখে দেবেন যার কাজ হবে দিনে তিনবার পাখি গোনা! সকালে একবার, দুপুরে একবার, সন্ধ্যায় আরেকবার।

লোকমান-সুলেমান দুই ভাইই তাঁর সঙ্গে আছে। তাদের চোখে মুখে কোনো পরিবর্তন নেই। বিশাল একটা জংলা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হয়েছে, সেখানে ধান ছড়ানো হচ্ছে। পাখি এসে এই ধান খাচ্ছে। এই বিষয়গুলি তাদেরকে স্পর্শ করছে না। ধান ছড়ালে পাখি খাবে— এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নাই। এই দৃশ্য আয়োজন করে দেখারও কিছু নাই।

সুলেমান!

জি চাচাজি?

একটা জিনিস কি লক্ষ করেছ, পাখি যখন ধান খায় সে কোনো শব্দ করে না? ডাকাডাকি নাই, ক্যাচক্যাচানি নাই।

সুলেমান কিছু লক্ষ করে নি, তারপরেও সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমি কিছুক্ষণ একা একা জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করব। তোমরা দুজন বাইরে অপেক্ষা করো।

দুই ভাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। উনাকে একা রেখে তাদের ঘরে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই। এই কথাটা বলার সাহসও পাচ্ছে না।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও। কাঁটাতারের বাইরে থাকো। আমি না ডাকলে ভিতরে ঢুকবে না।

তিনি বনের ভেতরে ঢুকে গেলেন। সাপখোপের ব্যাপার এখন থাকবে না। শীতের সময় সাপ গর্তে ঢুকে এক ঘুমে সময় পার করে দেয়। একেক প্রাণীজগতের জন্যে একেক ব্যবস্থা। সব ব্যবস্থার পিছনে সূক্ষ্ম কোনো হিসাব আছে। এই হিসাব সবার বোঝার বিষয় না।

তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটছেন। নজর করে কিছু দেখছেন না আবার সবকিছুই দেখছেন। জঙ্গলের মাঝখানে বড়-সড় ডোবার দেখা পেলেন। ডোবায় রোদ পড়েছে। ঝিলমিল করছে ডোবার পানি। পানিও পরিষ্কার। তাঁর কাছে মনে হলো, এত পরিষ্কার পানি তিনি অনেকদিন দেখেন নি। ডোবাটাকে আরো বড় করলে কেমন হয়? দিঘি হবে না। ঝিলের মতো হবে। এই ঝিল বনের ভেতর দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাবে।

তাঁর গরম লাগছে। বনের ভ্যাপসা গরম। তিনি গায়ের পাঞ্জাবি খুললেন। হঠাৎ মনে হলো, শুধু পাঞ্জাবি কেন খুলবেন? কেন সম্পূর্ণ নগ্ন হবেন না? আব্রুর জন্যেই তো পোশাক। এখন তাঁর আব্রু ঘন বন। এই বনে দ্বিতীয় কেউ ঢুকবে না। নগ্ন হবার চিন্তাটা বাদ দিলেন। সব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। শুধুমাত্র মস্তিষ্ক বিকৃত মানুষই সকল চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়।

তাঁর মাথার উপর দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে এক ঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে গেল। তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। এই বনে নিশ্চয়ই প্রচুর টিয়া পাখি বাস করে। তাঁর মনে হলো— বনের নাম 'টিয়া বন' দিলে কেমন হয়? লীলাবতীকে একবার এনে বন দেখাতে হবে। সেটা কি আজই দেখাবেন? নাকি আরো কিছু পরে? লীলা চলে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। যে-কোনো একদিন সে বলবে— আমি আজ দুপুরের গাড়িতে যাব। তখন তাকে যেতে দিতে হবে। পশুপাখি আটকে রাখা যায়। মানুষ আটকে রাখা যায় না।

শব্দ করে ঝোপ-ঝাড় নাড়িয়ে কোনো একটা জন্তু ছুটে গেল। বনবিড়াল হতে পারে। আবার খরগোশও হতে পারে। বনের পশু যা আছে কাঁটাতারের বেড়ায় আটকা পড়েছে। এটা মন্দ কী! এই বনে কী কী পশু আছে তার একটা হিসাব থাকলে ভালো হতো। তিনি ডোবার পানিতে নামলেন। পানি ঠাণ্ডা হবে ভেবেছিলেন। পানি ঠাণ্ডা না, যথেষ্টই গরম। পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে হাঁটতে তাঁর ভালো লাগছে।

লীলাবতী মঞ্জুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লীলাবতীর চোখে কৌতূহল, ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসি। মঞ্জুমামার কর্মকাণ্ডে না হেসে উপায় নেই। একদল মানুষ আছে যাদের বয়স বাড়ে না। মঞ্জুমামা সেই দলের।

মঞ্জু অতি আগ্রহে পাথরে ঝিনুক ঘষছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে কাজটা করে তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

মামা, কী করছ?

মঞ্জু চোখ না তুলেই বললেন, ঝিনুকের ছুরি বানাচ্ছি। ঝিনুকের ছুরি হচ্ছে পৃথিবীর সবচে' ধারালো ছুরি। ব্লেডের চেয়ে ধার।

ধারালো ছুরি দিয়ে কী করা হবে?

ছুরি বানানো শেষ হোক— তারপর দেখবি কী করা হবে।

লীলাবতী পাশে বসতে বসতে বলল, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল মামা— এখন কি বলা যাবে?

জরুরি কথা?

খুবই জরুরি।

তাহলে বলে ফেল।

ঝিনুকের ঘষাঘষি বন্ধ রাখো, তারপর বলি?

তোর যা বলার এই ঘষাঘষি শব্দের মধ্যেই বলতে হবে। আমি কাজ বন্ধ করব না। তোর এমন কোনো জরুরি কথা আমার সঙ্গে নেই যে কাজ বন্ধ করে শুনতে হবে।

তুমি এইখানেই থেকে যাবে এমন পরিকল্পনা কি নিয়েছ?

না।

বাবা তোমাকে না-কি জমি দিয়েছেন?

হুঁ।

রোজ না-কি তুমি তোমার জমিতে বসে থাকো?

আমি আমার নিজের জমিতে বসে থাকি, অন্যের জমিতে তো বসে থাকি না। আমি আমার নিজের জমির দেখভাল করব এটাই কি স্বাভাবিক না?

মামা, তুমি কি বুঝতে পারছ বাবা চেষ্টা করছেন তোমাকে এখানে আটকে ফেলতে?

আমাকে আটকে ফেলে তাঁর লাভ কী?

লীলাবতী শীতল গলায় বলল, বাবার আসল চেষ্টা আমাকে আটকানো। তোমাকে দিয়ে শুরু।

মঞ্জু কাজ বন্ধ করে লীলাবতীর দিকে তাকালেন। তাঁর কাছে মনে হলো, এখানে এসে মেয়েটা আরো সুন্দর হয়ে গেছে। সৌন্দর্যও জায়গা-নির্ভর। যে মেয়েকে মরুভূমিতে সুন্দর লাগে সেই মেয়েকে পানির দেশে সুন্দর লাগবে না।

লীলাবতী বলল, বাবা অতি বুদ্ধিমান মানুষদের একজন। তিনি আমাকে এই অঞ্চলে আটকাবার জন্যে সুন্দর সুন্দর বুদ্ধি বের করছেন। তিনি তাঁর ছেলের বিয়ে দিলেন। তারপর সেই ছেলেকে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। যাতে বাড়িতে বড় ধরনের ঝামেলা তৈরি হয়। আমি যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে না পারি।

কোনো বাবা যদি তার মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে চায় তাতে দোষ কী ?

তাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কৌশল খাটানোটা দোষ।

লীলা উঠে দাঁড়াল। মঞ্জু বললেন, আমার জন্যে চা পাঠিয়ে দে।

লীলা বলল, চা পাঠাচ্ছি। মামা তুমি তৈরি থেকো, আমি কিন্তু যে-কোনোদিন একঘণ্টার নোটিশে রওনা হব।

মাসুদকে জেলখানা থেকে উদ্ধার করে তারপর তো যাবি ?

উদ্ধারের ব্যবস্থা তার স্ত্রী করবে। পরী মেয়েটাও খুব বুদ্ধিমতী। ও জানে কখন কী করতে হয়। তোমার দুই অ্যাসিসটেন্ট কোথায় ? কই আর জই ?

ওদের কাজে পাঠিয়েছি। বড় সাইজের ঝিনুক আনতে গেছে।

মামা, তুমি সুখে আছ।

আমি সুখে থাকলে তোর কোনো সমস্যা আছে ?

না সমস্যা নেই।

মঞ্জু বিরক্ত গলায় বললেন, সুখী মানুষ দেখতে তোর যদি খারাপ লাগে যা একজন অসুখী মানুষ দেখে যা। লিচুতলায় চলে যা, কুঁজা মাস্টার মুখ ভোঁতা করে বসে আছে। এখন মনে হয় মাথাও খারাপ হয়ে গেছে — বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলে।

আনিস লিচু গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল। তার আবার জ্বর এসেছে। জ্বরের লক্ষণ সুবিধার না। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। মনের জোর দিয়ে নাকি অসুখ সারানো যায়— আনিস সেই চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝাচ্ছে— আমার কিছু হয় নি। আমি ভালো আছি। সামান্য গা ম্যাজম্যাজ করছে। এটা কোনো ব্যাপারই না। অসময়ে ঘুমানোর কারণেই এই গা ম্যাজম্যাজানি।

লীলা নিঃশব্দে আনিসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জু মামার কথা সত্যি, মানুষটা নিজের মনে বিড়বিড় করছে। লীলা স্পষ্ট শুনেছে— লোকটা বলছে— অসময়ের ঘুম। অসময়ের ঘুম।

লীলা বলল, কেমন আছেন ?

আনিস চমকে পিছনে ফিরল। তার সঙ্গে দুটি খাতা। সে দ্রুত চাদরের নিচে খাতা দুটি টেনে নিল। পারলে নিজেও চাদরের নিচে ঢুকে যায় এমন অবস্থা। লীলার কাছে মনে হলো, এই মানুষটার কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক। তাকে দেখে সে এত চমকাবে কেন ? শুধু মাত্র ভূতপ্রেত দেখলেই মানুষ এতটা চমকায়।

লীলা বলল, আমাকে চিনেছেন ?

কেন চিনব না! আপনি লীলাবতী।

আপনার কি শরীর খারাপ ? চোখ লাল হয়ে আছে এইজন্যে জানতে চাইলাম।

জি আমার জ্বর আসছে।

জ্বর নিয়ে রোদে বসে আছেন কেন ? ছায়ায় বসুন। বাঁ-দিকে ছায়া আছে।

আনিস সরে বসল। সঙ্গে সঙ্গেই তার শীত লাগতে লাগল। জ্বর মনে হয় ভালোই এসেছে।

লীলা বলল, গাছতলায় বসে না থেকে বিছানায় শুয়ে থাকুন। আমি ডাক্তার সাহেবকে খবর দেবার ব্যবস্থা করব। ডাক্তার এসে দেখে যাবে।

দরকার নেই।

দরকার নেই কেন ?

লীলা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে প্রশ্নের জবাব চাচ্ছে। আনিস কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না। মেয়েটার সঙ্গে যূথির কোনো মিল নেই। যূথি কখনো কোনো প্যাঁচ খেলানো প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করলেও জবাব শোনার অপেক্ষা করে না। তারপরেও এই মেয়েটাকে দেখলেই যূথির কথা মনে আসে। এই রহস্যের মানে কী!

লীলা বলল, আপনি তো বললেন না— কেন ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই।

আনিস বলল, আমি নিজেই নিজের চিকিৎসা করছি। চিকিৎসার ফলাফল দেখতে চাই।

কী রকম চিকিৎসা ?

মানসিক চিকিৎসা। অন্য একসময় আপনাকে বুঝিয়ে বলব।

অন্য সময় কেন ? এখন বুঝিয়ে বলতে সমস্যা কী ?

আনিস হতাশ গলায় বলল, এখন কথা বলতে ভালো লাগছে না।

লীলা বলল, আপনি আমাকে দেখেই চাদরের নিচে কী যেন লুকিয়েছেন। কী লুকিয়েছেন ?

লীলাবতী বলল, বাবা অতি বুদ্ধিমান মানুষদের একজন। তিনি আমাকে এই অঞ্চলে আটকাবার জন্যে সুন্দর সুন্দর বুদ্ধি বের করছেন। তিনি তাঁর ছেলের বিয়ে দিলেন। তারপর সেই ছেলেকে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। যাতে বাড়িতে বড় ধরনের ঝামেলা তৈরি হয়। আমি যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে না পারি।

কোনো বাবা যদি তার মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে চায় তাতে দোষ কী ?

তাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কৌশল খাটানোটা দোষ।

লীলা উঠে দাঁড়াল। মঞ্জু বললেন, আমার জন্যে চা পাঠিয়ে দে।

লীলা বলল, চা পাঠাচ্ছি। মামা তুমি তৈরি থেকো, আমি কিন্তু যে-কোনোদিন একঘণ্টার নোটিশে রওনা হব।

মাসুদকে জেলখানা থেকে উদ্ধার করে তারপর তো যাবি ?

উদ্ধারের ব্যবস্থা তার স্ত্রী করবে। পরী মেয়েটাও খুব বুদ্ধিমতী। ও জানে কখন কী করতে হয়। তোমার দুই অ্যাসিসটেন্ট কোথায় ? কই আর জই ?

ওদের কাজে পাঠিয়েছি। বড় সাইজের ঝিনুক আনতে গেছে।

মামা, তুমি সুখে আছ।

আমি সুখে থাকলে তোর কোনো সমস্যা আছে ?

না সমস্যা নেই।

মঞ্জু বিরক্ত গলায় বললেন, সুখী মানুষ দেখতে তোর যদি খারাপ লাগে যা একজন অসুখী মানুষ দেখে যা। লিচুতলায় চলে যা, কুঁজা মাস্টার মুখ ভোঁতা করে বসে আছে। এখন মনে হয় মাথাও খারাপ হয়ে গেছে — বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে কথা বলে।

আনিস লিচু গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল। তার আবার জ্বর এসেছে। জ্বরের লক্ষণ সুবিধার না। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। মনের জোর দিয়ে নাকি অসুখ সারানো যায়— আনিস সেই চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝাচ্ছে— আমার কিছু হয় নি। আমি ভালো আছি। সামান্য গা ম্যাজম্যাজ করছে। এটা কোনো ব্যাপারই না। অসময়ে ঘুমানোর কারণেই এই গা ম্যাজম্যাজানি।

লীলা নিঃশব্দে আনিসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জু মামার কথা সত্যি, মানুষটা নিজের মনে বিড়বিড় করছে। লীলা স্পষ্ট শুনেছে— লোকটা বলছে— অসময়ের ঘুম। অসময়ের ঘুম।

লীলা বলল, কেমন আছেন ?

আনিস চমকে পিছনে ফিরল। তার সঙ্গে দুটি খাতা। সে দ্রুত চাদরের নিচে খাতা দুটি টেনে নিল। পারলে নিজেও চাদরের নিচে ঢুকে যায় এমন অবস্থা। লীলার কাছে মনে হলো, এই মানুষটার কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক। তাকে দেখে সে এত চমকাবে কেন ? শুধু মাত্র ভূতপ্রেত দেখলেই মানুষ এতটা চমকায়।

লীলা বলল, আমাকে চিনেছেন ?

কেন চিনব না! আপনি লীলাবতী।

আপনার কি শরীর খারাপ ? চোখ লাল হয়ে আছে এইজন্যে জানতে চাইলাম।

জি আমার জ্বর আসছে।

জ্বর নিয়ে রোদে বসে আছেন কেন ? ছায়ায় বসুন। বাঁ-দিকে ছায়া আছে।

আনিস সরে বসল। সঙ্গে সঙ্গেই তার শীত লাগতে লাগল। জ্বর মনে হয় ভালোই এসেছে।

লীলা বলল, গাছতলায় বসে না থেকে বিছানায় শুয়ে থাকুন। আমি ডাক্তার সাহেবকে খবর দেবার ব্যবস্থা করব। ডাক্তার এসে দেখে যাবে।

দরকার নেই।

দরকার নেই কেন ?

লীলা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে প্রশ্নের জবাব চাচ্ছে। আনিস কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না। মেয়েটার সঙ্গে যূথির কোনো মিল নেই। যূথি কখনো কোনো প্যাঁচ খেলানো প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করলেও জবাব শোনার অপেক্ষা করে না। তারপরেও এই মেয়েটাকে দেখলেই যূথির কথা মনে আসে। এই রহস্যের মানে কী!

লীলা বলল, আপনি তো বললেন না— কেন ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই।

আনিস বলল, আমি নিজেই নিজের চিকিৎসা করছি। চিকিৎসার ফলাফল দেখতে চাই।

কী রকম চিকিৎসা ?

মানসিক চিকিৎসা। অন্য একসময় আপনাকে বুঝিয়ে বলব।

অন্য সময় কেন ? এখন বুঝিয়ে বলতে সমস্যা কী ?

আনিস হতাশ গলায় বলল, এখন কথা বলতে ভালো লাগছে না।

লীলা বলল, আপনি আমাকে দেখেই চাদরের নিচে কী যেন লুকিয়েছেন। কী লুকিয়েছেন ?

আনিস বলল, কিছু না।

লীলা বলল, আমি দেখলাম সবুজ মলাটের দুটা খাতা। খাতায় কী লেখা?

আনিস বলল, আপনাকে এখন বলব না। পরে কোনো একদিন বলব।

লীলা বলল, এখন বলতে সমস্যা কী?

আনিস বলল, এখন আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।

লীলা চলে যাচ্ছে। আনিসের মনে হলো, মেয়েটা রাগ করে চলে যাচ্ছে। এখন কথা বলতে ভালো লাগছে না— এ ধরনের কথা বলা ঠিক হয় নি। মেয়েরা এই ধরনের কথায় খুবই আহত হয়। সে একবার যূথিকে বলেছিল— যূথি, এখন আমি লিখছি। তুই পরে আয়। যূথি প্রায় দৌড়ে সামনে থেকে চলে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল সকাল দশটার দিকে। সে সকাল দশটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতে অসুখ বাঁধিয়ে ফেলল।

আনিস দুপুর নাগাদ প্রবল জ্বরের ঘোরে চলে গেল। দিনের আলো কড়কড় করে চোখে লাগতে লাগল। নিঃশ্বাসেও কষ্ট। কানের ফুটো দিয়ে ভাপের মতো বের হচ্ছে। আলো চোখে লাগে বলে যতবারই সে চোখ বন্ধ করে ততবারই দেখে যূথিকে। যূথি অনেক অদ্ভুত কর্মকাণ্ড করছে— যেমন একবার দেখা গেল বড় একটা কলাপাতা নিয়ে কলাপাতা ছিঁড়ছে। কলাপাতার রঙ হয় সবুজ। এই কলাপাতাটা সোনালি রঙের। আরেকবার দেখল, কাঁসার জগে সে যেন কী ঘুঁটছে, শব্দ হচ্ছে সাইকেলের ঘণ্টার মতো ক্রিং ক্রিং ক্রিং। আনিস বলল, কী বানাচ্ছিস? যূথি বলল, শরবত বানাচ্ছি। বেলের শরবত। খাবে? তারপর সে দেখল, যূথি শরবত বানানো বন্ধ করে কঠিন গলায় কথা বলছে। কাকে যেন আদেশ দিচ্ছে— মাথায় পানি ঢালতে শুরু করো। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত পানি ঢালতে থাকবে। আনিসের তখন মনে হলো— কঠিন গলায় যে কথা বলছে তার নাম যূথি না। তার নাম লীলাবতী।

মাথায় পানি ঢালা পর্ব শুরু হয়েছে। বদু পানি ঢালছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি। এরা কি বরফকল থেকে বরফ নিয়ে এসে পানির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে? পানি গন্ধহীন হবার কথা। এই পানির গন্ধ আছে। মাছ মাছ গন্ধ।

লীলাবতী বলল, আপনার কি খুব বেশি খারাপ লাগছে?

আনিস বলল, হুঁ।

ডাক্তার আনতে লোক গেছে। ডাক্তার চলে আসবে। আপনি এক-দুই দিন পরে পরেই বিরাট অসুখ বাঁধাচ্ছেন। আপনার ভালো চিকিৎসা হওয়া উচিত।

আনিস বিড়বিড় করে বলল, আচ্ছা চিকিৎসা করাব। আপনি এখন চলে যান।

চলে যেতে বলছেন কেন?

আনিস জবাব দিল না। তবে সে মনে-প্রাণে চাচ্ছে মেয়েটা চলে যাক— পানির আঁশটে গন্ধ পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে। এক্ষুনি বমি হবে। এই মেয়েটার সামনে বমি করতে মন চাচ্ছে না। আনিস বলল, আপনি চলে যান। আপনি চলে যান। আপনি চলে যান। সে বলেছে মাত্র একবার কিন্তু 'আপনি চলে যান' বাক্যটা মাথার ভেতর বেজেই চলছে। ঐ তো মেয়েটা চলে যাচ্ছে, এখন আর তাকে 'আপনি চলে যান' বলার দরকার নেই। তারপরও সে বলে যাচ্ছে। আশ্চর্য তো!

লীলা শহরবাড়ি ছেড়ে মূল বাড়ির দিকে এগুচ্ছে। তবে সে মনস্থির করতে পারছে না— সে মূল বাড়িতে যাবে না-কি কিছুক্ষণ পুকুরঘাটে বসে থাকবে! পানির কাছাকাছি থাকলে মন শান্ত হয়। কে জানে, কেন হয়!

পরীবানু দিঘির জলে পা ডুবিয়ে একা একা বসে আছে। লীলাকে দেখতে পেয়েই সে হাত ইশারা করে ডাকল। আনন্দিত গলায় বলল, বুবু, একটা মজার জিনিস দেখে যাও। পরীবানুর এমন আনন্দিত গলা লীলা আগে শোনে নি। সে বিস্মিত হয়ে বলল, কী?

আমার মতো করে বসো বুবু, পানিতে পা ডুবাও, তারপর দেখবে।

কী দেখব?

আগে বলব না। আগে বললে মজা চলে যাবে।

লীলা পা ডুবিয়ে বসল। আসলেই তো মজা। কড়ে আঙুলের মতো সাইজের মাছ এসে পায়ে ঠোকর দিচ্ছে। একটা দু'টা মাছ না— অনেক মাছ।

লীলা বলল, এই মাছগুলোর নাম কী?

দাড়িকিনি মাছ। এই পুষকুনিতে অনেক বড় বড় মাছ আছে। বুবু, তুমি কোনোদিন বর্শি দিয়ে মাছ ধরেছ?

না।

আসো না আমরা একদিন বর্শি ফেলে মাছ ধরি। ধরবে?

লীলা বলল, তুমি কি পুকুরপাড়ে প্রায়ই আসো?

পরী বলল, হুঁ।

কাঁদার জন্যে আসো?

পরী কিছু বলল না।

তোমার সারা মুখে কাজল লেপ্টে গেছে। পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলো।

পরী আজলা ভর্তি পানি মুখে ছিটাচ্ছে। লীলা সহজ গলায় বলল, ঘাটে বসে কাঁদার মতো কিছু হয় নাই। বাবার রাগ পড়ে যাবে। তুমি মাসুদের সঙ্গে সুখে দিন কাটাবে। কয়েকটা দিন কষ্ট করে পার করো।

উনার রাগ পড়বে না। উনি অন্যদের মতো না।

লীলা বলল, তোমার ধারণা বাবা সারাজীবন মাসুদকে আটকে রাখবে?

পরী কিছু বলল না। তার মুখের কাজল ধুয়ে গেছে, তারপরও সে মুখে পানি ছিটিয়ে যাচ্ছে।

লীলা বলল, মাসুদের সঙ্গে তোমার কথা হয় না?

পরী বলল, না। উনি আমাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আমি উনার নিষেধ মানছি।

মাসুদকে আটকে রাখা হয়েছে মূল বাড়ির শেষপ্রান্তে। ঘরের সামনে বদু বসে থাকে। তার দায়িত্ব বন্দির উপর লক্ষ রাখা। রাতে বদু ঘরের সামনের বারান্দায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমায়।

দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় মাসুদ বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। ঘরের ভেতর গুমোট গরম। এই গরমে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা কষ্টের ব্যাপার। মাসুদকে দেখে মনে হয় না সে কষ্টে আছে। যতক্ষণ সে ঘুমায় না ততক্ষণ খাটে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। বদু তার সঙ্গে মাঝেমধ্যে গল্প করতে আসে। বদু নিজের মনে কথা বলে যায়। এই বাড়ির কোথায় কী ঘটছে তা শোনায়। দায়িত্ব নিয়েই শোনায়। একজন মানুষ আটকা পড়ে আছে, কোথায় কী হচ্ছে কিছুই জানে না। তাকে জানানো প্রয়োজন।

ভাইজান শুনেন— আপনের পিতা কী করে শুনেন। জঙ্গলে বইসা থাকে। একলা যায়। কাউরে সাথে নেয় না। এইটা আচানক ঘটনা না? আপনে বলেন। আপনের নিজেরও তো একটা বিবেচনা আছে। আপনের বিবেচনা কী বলে— ঘটনা কী? জিন সাধনার বিষয় আছে। যারা জিন সাধনা করে তারার একা কিছু সময় থাকতে হয়। এই সময় তারা জিনের সাথে কথা কয়।

আবার স্মরণ কইরা দেখেন আপনের পিতারে কি আপনে কোনোদিন পুষকুনিতে সিনান করতে দেখছেন? দেখেন নাই। ঘটনা কী বলেন দেখি। বিবেচনা কইরা বলেন। যারা জিন সাধনা করে তারা কি পুষকুনিতে সিনান করতে পারে? পারে না। নিয়ম নাই। তারারে সবসময় তোলা পানিতে সিনান করতে হয়।

এখন আপনারে বলি আরেক বিবেচনার কথা, যে বাড়িতে জিন সাধনা হয় সেই বাড়িতে সবসময় অসুখ-বিসুখ লাইগ্যা থাকবে। কুঁজা মাস্টারের কথাটা বিবেচনায় আনেন। তার কপালে অসুখ আছে কি-না এইটা বলেন। এখন তার জ্বর। এমন জ্বর যার মা-বাপ নাই। জ্বর কী জন্যে হয় জানেন? জিনের বাতাস লাগলে হয়। জিনের শইল্যের বাতাস খুব ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা বাতাস শইল্যে লাগলেই হয় জ্বর। ঘটনা কেমন আশ্চার্য চিন্তা করেন। একটা জিনিস আগুনের তৈয়ারি কিন্তুক তার বাতাস ঠাণ্ডা। আর আমরা মানুষ আমরারে পয়দা করা হইছে মাটি দিয়া। কিন্তুক আমরার শইল্যের বাতাস গরম। আশ্চার্য কি-না বলেন!

জিনের দোজখ যে পানি দিয়া তৈয়ারি এইটা কি জানেন ভাইজান? আগুনের দোজখে এরার কিছু হবে না। নিজেরাই তো আগুনে তৈয়ার। এই জন্যে আল্লাহপাক তারার জন্য বানায়েছেন পানির দোজখ। সেই দোজখে হাঁটু পানি। চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা।

জিনের খাওয়া খাদ্য কী জানেন ভাইজান? প্রধান খাদ্য ছানার মিষ্টি। ভূত-প্রেতের প্রধান খাদ্য মাছ ভাজা। সব মাছ না— শউল মাছ। শউল মাছের পরেই বোয়াল মাছ।

বদু কথা বলেই যায়, মাসুদ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে গল্প শুনছে এরকম মনে হয় না, আবার শুনছে না এরকমও মনে হয় না। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ করেই বদুকে থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলে— বদু একটা কাজ করেন। পরী কোথায় আছে একটু দেখে আসেন।

এখন যাব?

হ্যাঁ, এখন যান।

কিছু বলা লাগবে?

কিছু বলা লাগবে না, শুধু দেখে আসেন।

বদু গল্প বলায় সাময়িক বিরতি দিয়ে খোঁজ নিতে যায়। আবার ফিরে এসে গল্প শুরু করে। জিন-ভূত-প্রেত বিষয়ক গল্প। জুম্মাঘরের কাছে তেঁতুল গাছে যে পেত্নী থাকে তার গল্প বদু খুব আগ্রহের সঙ্গে করে। কারণ এই পেত্নীটাকে বদু নিজেও কয়েকবার দেখেছে। পেত্নীর নাম কলন্দর বিবি। সে অনেক দিন থেকেই না-কি তেঁতুল গাছে বাস করছে।

ভাইজান শুনেন, তেঁতুল গাছটা নজর কইরা কোনোদিন দেখছেন? তেঁতুল গাছে তেঁতুল হবে এইটাই জগতের নিয়ম। এই গাছে ফুল আসে কিন্তু তেঁতুল হয় না। ঘটনা বুঝতেছেন তো? কোনো পাখি দেখছেন এই গাছে বসেছে? দেখেন নাই। কারণ একটাই কলন্দর বিবি। তিনবার তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। একবার তো মরতেই বসছিলাম। সেই গল্পটা শুনেন...

WWW.BDBANGLA.COM

জানালার দু'পাশে দু'জন।

একপাশে মাসুদ। অন্য পাশে লীলাবতী। মাসুদ জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লীলা জানালার পাশে চেয়ার টেনে বসেছে। লীলার মুখ বিষণ্ন। তার কিছুই ভালো লাগছে না। নিজেকে এই বাড়ির সঙ্গে জড়ানো ভুল হয়েছে— এমন একটা চিন্তা মাথায় ঢুকেছে। বাড়িটা যেন অদৃশ্য সুতায় তাকে ধরে রেখেছে। অদৃশ্য সুতা কাটতে যে কাচি লাগে সেই কাচি তার কাছে নেই।

মাসুদ বলল, বুবু, দরজা খুলে দাও।

লীলা বলল, আমার কাছে চাবি নাই।

মাসুদ বলল, তালা ভাঙার ব্যবস্থা করো। আজ দুপুরের মধ্যে যদি আমাকে বের না করো আমি কিন্তু ঘটনা ঘটাব।

কী ঘটনা ?

মাসুদ জবাব দিল না। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাগে তার শরীর কাঁপছে। জানালার শিক ধরে সে শরীরের কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করছে। তার গায়ের হালকা সবুজ রঙের পাঞ্জাবি ঘামে ভেজা।

বুবু, আমি কিন্তু সত্যি ঘটনা ঘটাব।

লীলা উঠে দাঁড়াল। তার বসে থাকতে ভালো লাগছে না। মাসুদ বলল, বুবু, চলে যাচ্ছ কেন ? তুমি যেতে পারবে না। বসো।

লীলা বলল, বসে থেকে কী করব ?

আমি কিন্তু ঘটনা ঘটাব।

ঘটনা ঘটাতে চাইলে ঘটাও। আমাকে বলার দরকার কী ?

মাসুদ তীব্র গলায় বলল, ঘটনা ঘটে গেলে কিন্তু তোমার উপরে দোষ পড়বে। কারণ তোমাকে আগে সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমি ফাঁস নিব, দড়ি জোগাড় করেছি। দেখতে চাও ?

লীলা কিছু বলল না। মাসুদ খাটের নিচ থেকে লম্বা দড়ির গোছা বের করে দেখাল। বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখাল। শিশুরা তাদের পছন্দের খেলনা বড়দের

যেমন আগ্রহ নিয়ে দেখায় সেরকম আগ্রহ। আগ্রহে উত্তেজনায় মাসুদের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

ফাঁস কখন নিবে ?

আছরের ওয়াক্তে। আছরের আজানের পর। বুবু, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না ? আমি সত্যি ফাঁস নিব। আল্লাহর কসম, নবীজির কসম, পরীবানুর কসম। বুবু, তুমি এখনো আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না ?

লীলা বলল, আমার বিশ্বাস করা না-করায় কিছু যায় আসে না।

বুবু, আমি জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না। কোরানশরিফ আনো, আমি কোরানশরিফ ছুঁয়ে কসম কাটব। বুবু শোনো, পরীবানুর পেটে যে সন্তান আছে সেই সন্তানের কসম, আমি ফাঁস নিব। এইবার কি বিশ্বাস করেছ ?

লীলা বলল, করেছি।

মাসুদ বলল, যাও এখন ব্যবস্থা নাও।

লীলা বের হয়ে এলো। তার মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে। আছর ওয়াক্তের অনেক দেরি আছে। অস্থির হবার কিছু নেই। তার আগেই অনেককিছু করা যাবে। কিন্তু লীলার অস্থির লাগছে। ঝামেলা এখনই শেষ করে দেয়া উচিত। লীলা তার বাবার খোঁজে বের হলো। তিনি মূলবাড়িতে নেই। শহরবাড়িতেও নেই। পাখিদের ধান খাওয়াতে গেছেন। লীলার একবার মনে হলো, সেও পাখির ধান খাওয়া দেখতে যাবে। বাবার সঙ্গে যা কথা বলার সেখানেই বলবে। তার একা যেতে ইচ্ছা করছে না, আবার কাউকে সঙ্গে নিতেও ইচ্ছা করছে না। বাড়ির সীমানার বাইরে যেতে হলে বোরকা পরতে হবে। এটা সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের সাম্প্রতিক নির্দেশ। লীলা যে বোরকা পরে নি তা-না। কিন্তু বোরকা পরলেই কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

লীলা বাড়ির বারান্দায় হাঁটছে। মন শান্ত করার ব্যাপারে হাঁটা ভালো কাজ করে। কেন করে কে জানে!

লীলা আম্মাজি!

রমিলা ডাকছেন। তাঁর গলার স্বর নিচু। ডাকছেন মমতা নিয়ে। লীলা রমিলার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়াল। রমিলা বললেন, মা, তোমাকে অস্থির লাগতেছে কেন ?

লীলা জবাব দিল না।

রমিলা বললেন, কোনো বিষয়ে অস্থির হওয়া ঠিক না মা। আল্লাহপাক মানুষের অস্থিরতা পছন্দ করেন না। কোরআন মজিদে উনি বলেছেন।

কী বলেছেন ?

উনি বলেছেন, 'হে মানুষ! তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

আপনি কোরআন শরীফের সূরার অর্থ জানেন ?

আমি জানি না গো মা। আমাদের এক হুজুর ছিলেন বিরাট আলেম। উনার কাছে যখন সবক নিতাম উনি সূরা ব্যাখ্যা করতেন।

তাহলে আমাদের তাড়াহুড়া করা উচিত না ?

না গো মা।

আমাদের উপর যখন বিরাট বিপদ এসে পড়বে তখনো আমরা অস্থির হবো না ?

না।

আপনি তো অনেক কথা আগে আগে বলতে পারেন— আপনার কি মনে হয় আমাদের উপর বড় বিপদ আসবে ?

সবসময় বলতে পারি না মা। মাঝে মাঝে পারি।

এখন কিছু বলতে পারছেন না ?

না। আল্লাহপাক মাঝে মাঝে আমাদের সাবধান করার জন্য বিপদের কথা আগেই জানান। মাঝে মাঝে তিনি চান না আমরা সাবধান হই। তিনি চান যেন আমরা বিপদে পড়ি।

লীলা বলল, আপনার ব্যাখ্যা সুন্দর। এমনভাবে বলেন যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।

রমিলা বলল, আমার হুজুর ছিলেন উনি এইভাবে কথা বলতেন। উনার কাছ থেকে এইভাবে কথা বলা শিখেছি।

লীলা বলল, আমি এইবার ঢাকা যাওয়ার সময় আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপনার চিকিৎসা করাব।

রমিলা বললেন, মাগো, তুমি তো ইনশাল্লাহ বললা না। আল্লাহপাকের ইচ্ছা হইলেই তুমি আমারে নিতে পারবা। উনার ইচ্ছা বিহনে পারবা না।

লীলা বলল, আপনার ঘরের তালা খুলে দেই ? আসুন আমরা বাগানে হাঁটি ?

রমিলা বললেন, তোমারে একটা সিমাসা দিব। যদি ভাঙ্গাইতে পারো তাহলে তোমার সঙ্গে হাঁটতে যাব। না পারলে যাব না।

সিমাসাটা কী ?

'এক পাখি নড়েচড়ে
দুই পাখি খায়
তিন পাখি নাওএ বসা
চার পাখি নাও বায়।'

লীলা বলল, পারব না। রমিলা জানালার পাশ থেকে সরে গেলেন।

মাসুদ আছর ওয়াক্তে ফাঁস নেবে— এই ব্যাপারটা অতি দ্রুত জানাজানি হয়ে গেছে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা। কেউ বিশ্বাস করছে না, আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও করছে না। পরীবানুর মধ্যে কোনোরকম চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল না। সে তার নিজের ঘরে খাটের উপর আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। তার প্রধান কাজ এখন বই পড়া। এই বাড়িতে বেশকিছু বই আছে। শরৎ, বঙ্কিমচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলি। সকালবেলা সে আলমিরা থেকে একটা বই বের করে বসে। পড়তে পড়তে বারবার তার চোখে পানি আসে। আনন্দের কোনো ঘটনাতেও পানি আসে। দুঃখের ঘটনাতেও পানি আসে। নিজের ঘর ছেড়ে তাকে বাইরে বের হতে দেখা যায় না। তার স্বামীকে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, এটা ভেবেই সে হয়তো নিজেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে রেখেছে। তবে মাসুদের ব্যাপারে সে কারো সঙ্গেই কোনো কথা বলে না।

লীলা যখন তার ঘরে ঢুকল সে তখন খাটে শুয়ে আছে। তার বুকের উপর মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'। লীলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে উঠে বসল। বই একপাশে রেখে লীলার দিকে তাকিয়ে বলল, বুবু, আপনার কি জ্বর এসেছে ? চোখ লাল।

লীলা বলল, জ্বর আসতে পারে। মাথা ধরেছে।

পরী হাত বাড়িয়ে লীলার হাত ধরল। জ্বর দেখার জন্যে হাত ধরা। কিন্তু সে হাত ছেড়ে দিল না। হাত ধরেই থাকল।

লীলা বলল, কী দেখলে, আমার গায়ে কি জ্বর আছে ?

জি আছে। বেশি না, অল্প। কিন্তু জ্বর বাড়বে।

কীভাবে বুঝলে ?

শরীর অল্প অল্প কাঁপতেছে। যতক্ষণ শরীর কাঁপে ততক্ষণ জ্বর বাড়ে। এটা আমি আমার দাদাজানের কাছে শিখেছি। উনি কবিরাজ ছিলেন। বুবু বসেন। দাঁড়ায়ে আছেন কেন ?

লীলা বসল। পরী বলল, আপনের ভাই নাকি ঘোষণা দিয়েছে ফাঁস নিবে ?

লীলা কিছু বলল না। পরী নিজের মনে মিটিমিটি হাসছে। লীলা বিস্মিত হয়ে দেখল— মেয়েটার হাসি খুবই সুন্দর।

পরী বলল, আপনার ভাইয়ের মাথা খুব গরম। যখন মাথা বেশি গরম হয়ে যায় তখন কেউ মাথা ঠাণ্ডা করতে পারে না।

তুমিও পারো না ?

আমি পারি। তার মাথা ঠাণ্ডা করার মন্ত্র আমি বের করেছি।

লীলা বলল, কী মন্ত্র— আমাকে শিখিয়ে দাও। মন্ত্র পড়ে আমি মাথা ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি।

এই মন্ত্র আপনি পড়লে কাজ হবে না। আমার পড়তে হবে।

যাও, তুমি পড়ে দিয়ে আসো।

পরী বলল, না। আমি যাব না।

পরীর হাসিহাসি মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। সেই কাঠিন্য স্থায়ী হলো না। মুখ স্বাভাবিক হলো। ঠোঁটের কোনায় অস্পষ্ট হাসি ফিরে এলো। পরী বলল, বুবু, আপনি নাকি ঢাকায় চলে যাবেন ?

লীলা বলল, হ্যাঁ।

কবে যাবেন ?

বাবার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি, আমার জন্যে তত ভালো।

বুবু, যদি রাগ না করেন আপনাকে একটা কথা বলি ?

বলো।

আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। আমি কয়েকটা দিন আপনার সঙ্গে থেকে আসি। এখানে আমি একা একা থেকে কী করব ? একটা মানুষ থাকবে না যার সঙ্গে আমি দু'টা কথা বলতে পারব। আপনার সঙ্গে যাওয়া কি সম্ভব ?

না।

পরী খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

লীলা বলল, তুমি যাতে তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারো আমি সেই ব্যবস্থা করতে পারি।

পরী শান্ত গলায় বলল, আমাকে এ-বাড়ি থেকে ছাড়বে না। আপনার ভাইকে তালাবন্ধ করে আটকে রেখেছে। আমাকে তালা ছাড়া আটকে রেখেছে। জিনিস একই। বুবু, আপনার জ্বর তো আরো বেড়েছে, আপনি আমার ঘরে শুয়ে থাকেন। আমি কপালে হাত বুলিয়ে দেই। আমি খুব ভালো মাথা মালিশ করতে

পারি। মাথা মালিশ করা আমি শিখেছি আমার দাদির কাছে। আমার দাদি মাথা মালিশ করে যে-কাউকে দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারতেন।

লীলা বলল, তুমি দেখি অনেকের কাছে অনেক জিনিস শিখেছ।

আমি সবার কাছ থেকেই কিছু-না-কিছু শেখার চেষ্টা করি।

আমার কাছ থেকে কী শিখেছ ?

আপনার কাছ থেকে অনেক বড় একটা জিনিস শিখেছি। কিন্তু কী শিখেছি সেটা এখন আপনাকে বলব না।

লীলা বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, তুমি আসলে আমার কাছ থেকে কিছু শেখ নি। কিন্তু এটা বলতে লজ্জা পাচ্ছ। ভাবছ এটা শুনলে আমার মন খারাপ হবে। এইজন্যে বলেছ— কী শিখেছি এটা আপনাকে বলব না। পরী, আমি কি ঠিক বলেছি ?

পরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর শান্ত গলায় বলল, জি, ঠিক বলেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় মনে থাকে না যে আপনার অনেক বুদ্ধি। বুবু, আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই ?

দাও, কিন্তু তোমার দাদির মতো ঘুম পাড়িয়ে দিও না। আমি অবেলায় ঘুমাতে চাই না।

পরী খাট ছেড়ে নামল। লীলা বলল, কোথায় যাচ্ছ ? পরী বলল, আমার হাত দুটা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখব। তখন হাত ঠাণ্ডা হবে। ঠাণ্ডা হাত কপালে রাখলেই দেখবেন আপনার খুব আরাম লাগছে।

এই বুদ্ধিও কি তোমার দাদির কাছ থেকে শেখা ?

জি।

পরী তার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারল না। তার আগেই লোকমান এসে বলল, মাস্টার সাব লীলা বইনজির সঙ্গে কথা বলতে চান।

আনিস মাস্টার দেশে চলে যাবে, সে এই প্রস্তুতি নিয়ে বড়বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে সুটকেস-ট্রাংক। দড়ি দিয়ে বাঁধা বইপত্র। লীলা অবাক হয়ে বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

দেশে চলে যাচ্ছি। শরীরটা এখন ভালো। মা'র সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। মা'র শরীরও ভালো না।

লীলা বলল, বাবা কি জানেন আপনি চলে যাচ্ছেন ?

জি, উনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি।

আপনি আবার ফিরে আসছেন তো ?

জি না। গ্রামে আমার মন টেকে না। দেখি শহরে কিছু করতে পারি কি না। তাছাড়া...

তা ছাড়া কী ?

এখানে কলেজে অনেক দিন শিক্ষকতা করলাম। বেতন পাই না।

বেতন পান না কেন ?

ছাত্র কম। আদায়পত্র নাই। নাম কামাবার জন্যে লোকজন স্কুল-কলেজ দেয়, পরে আর চালানোর ব্যবস্থা করে না।

লীলা বলল, আপনার ট্রেন কখন ?

দেড় ঘণ্টার মতো সময় হাতে আছে। আপনার সঙ্গে কথা শেষ করে রওনা দেব।

আমার সঙ্গে কথা শেষ হয়েছে। এখন রওনা দিতে পারেন।

আনিস বলল, আপনার সঙ্গে কথা শেষ হয় নি। জরুরি কিছু কথা ছিল।

বলুন, শুনছি।

আনিস বলল, দয়া করে আমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

লীলা বলল, আমি সবার সব কথাই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি। আপনি কোন প্রসঙ্গে কথা বলবেন ?

মাসুদ প্রসঙ্গে।

বলুন।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন মাসুদ আছরের ওয়াক্তে ফাঁস নেবার কথা বলেছে। সবাই তার কথা শুনছে। মজা পাচ্ছে। কেউ তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে না।

আপনার ধারণা— তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত ?

জি।

আপনার ধারণা— সে সত্যি সত্যি ফাঁসিতে ঝুলবে ?

সম্ভাবনা আছে।

সম্ভাবনা আছে— কেন বলছেন ?

আনিস শান্ত গলায় বলল, তার ভেতরে প্রচণ্ড রাগ তৈরি হয়েছে। ক্ষোভ আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিমান। আপনি আপনার বাবাকে বলে তাকে বের করে আনুন। আপনার কাছে এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। এইটুকুই আমার কথা। আমি আপনার বাবাকে আমার কথা বলার চেষ্টা করেছি। উনি

ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ধমক দিয়ে থামাবেন না। আপনার কথা উনি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। আমার কথা শেষ হয়েছে, এখন আমি যাই।

আচ্ছা যান।

আনিস বলল, আপনি আমার উপর কোনো রাগ রাখবেন না।

লীলা বিস্মিত হয়ে বলল, আমি আপনার উপর রাগ রাখব কেন ? আমি রাগ করতে পারি এমন কিছু কি আপনি করেছেন ?

আনিস কিছু বলছে না, হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে কথার পিঠে কথা বলতে পারে। আজ বলতে পারছে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

আনিস ইতস্তত করে বলল, আমি কি আমার ঠিকানাটা আপনার কাছে দিয়ে যাব ?

লীলা বলল, আমার কাছে ঠিকানা দিয়ে যাবেন কেন ? আপনার ঠিকানা দিয়ে আমি কী করব ?

আনিস খুবই বিব্রত হলো। লীলা বলল, আপনি বরং একটা কাজ করুন। বাবার কাছে ঠিকানা রেখে যান। উনার কোনো দরকার হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আনিস বলল, মাসুদের কথাটা মনে রাখবেন।

হ্যাঁ, আমি মনে রাখব। ভালো কথা, মাসুদের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি এত চিন্তিত, আপনার কি দেখে যাওয়া উচিত না সে কী করে ? আছরের ওয়াক্ত পার করে গেলে হয় না ?

আনিস বলল, জি-না হয় না। যদি সত্যি সত্যি কিছু ঘটে যায় সেটা আমি নিতে পারব না।

সে জন্যেই পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন ?

আনিস বিড়বিড় করে বলল, অন্য একটা কারণও আছে, কারণটা আপনাকে বলব না।

লীলা বলল, ঠিক আছে বলতে হবে না। চলে যান। শরীরের দিকে লক্ষ রাখবেন। দুদিন পর পর অসুখ বাঁধিয়ে যূথি নামের একজনকে ডাকাডাকি করা কোনো কাজের কথা না।

সিদ্দিকুর রহমান খেতে বসেছেন। লীলা তাঁর সামনে বসে আছে। খাবার সময় তিনি কথাবার্তা বলা পছন্দ করেন না। নিঃশব্দে খেয়ে যান। রান্না ভালো বা মন্দ

এই নিয়ে কখনো উচ্চবাচ্য করেন না। খাওয়া শেষ করেন অতিদ্রুত। শুধু শেষ পাতে তাঁর টক দই লাগে। টক দই-এ গুড় মাখিয়ে আরাম করে খান। আজও তা-ই করলেন। তিনি অতিদ্রুত টক দই-এ চলে এলেন। লীলা একটি কথাও বলল না। নিঃশব্দে বসে রইল।

সিদ্দিকুর রহমান হাত ধুতে ধুতে বললেন, মা, বলো কী বলবে?

লীলা সামান্য বিস্মিত হলো। তার হাবভাবে এক মুহূর্তের জন্যেও প্রকাশ পায় নি সে কিছু বলতে চায়। অতি বুদ্ধিমান এই মানুষটি কিন্তু ধরতে পেরেছেন।

মাসুদের ব্যাপারে কিছু বলতে চাও?

জি।

ঢাক-ঢোল পিটায়ে কেউ মরতে যায় না। ঘরে তার নতুন বউ। নতুন বউয়ের পেটে সন্তান। এই অবস্থায় কেউ দড়িতে ঝুলে না। তুমি এইসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। মাস্টার তোমার মাথায় এই জিনিস ঢুকায়েছে। মাস্টারের বেশির ভাগ চিন্তা-ভাবনা ভুল।

লীলা বলল, দুর্ঘটনা একবারই ঘটে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, দুর্ঘটনা নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে জীবনযাপন করা যাবে না। সবকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে। আমাদের এই বাড়িতে দু'টা বাস্তুসাপ থাকে। পদ্মগোখরা। দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করলে এই বাড়িতে বাস করাই সম্ভব হবে না। সারাক্ষণ সাপের ভয়ে অস্থির হয়ে থাকা লাগত। তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ?

জি।

মাসুদ গাধাটা গলায় ফাঁস নিবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। আজ যদি ভয় পেয়ে গাধাটাকে ছেড়ে দেই, সে দু'দিন পরেপরে ভয় দেখাবে। বুঝতে পেরেছ?

জি।

এখন তুমি বলো গাধাটাকে কি ছেড়ে দেয়া উচিত?

উচিত না, কিন্তু ছেড়ে দিন। মাঝে মাঝে আমরা সবাই কিছু অনুচিত কাজ করি।

সিদ্দিকুর রহমান পান মুখে দিলেন। সুলেমান তাঁর জন্যে তামাক নিয়ে এসেছে। তিনি কিছুক্ষণ নলে টান দিয়ে হুক্কা পরীক্ষা করে শান্ত গলায় বললেন, লীলা, তুমি দুশ্চিন্তা করবে না। আমার উপর বিশ্বাস রাখো। বাদ আছর কিছুই হবে না। এই বিষয়ে আমি আর কোনো কথা বলব না। তোমার কি শরীর খারাপ?

সামান্য খারাপ। জ্বর-জ্বর লাগছে।

খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে থাকো। বিশ্রাম করো। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করো। দুশ্চিন্তা করবে না। দুশ্চিন্তা পুরুষের বিষয়। পুরুষ দুশ্চিন্তা করবে, মেয়েরা দুশ্চিন্তাহীন জীবনযাপন করবে।

লীলা বলল, আমি ঠিক করেছি কাল ভোরে চলে যাব।

সিদ্দিকুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আসা-যাওয়া এইসব সিদ্ধান্ত মেয়েদের নেয়া ঠিক না। যা-ই হোক, তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলব না। কাল ভোরে যেতে চাও যাবে। বাকি আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা।

আমি মা'কে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। উনার চিকিৎসা করাব।

সিদ্দিকুর রহমান মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। লীলাবতী বলল, আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?

আমার কোনো আপত্তি নাই। তুমি তাকে সামলাতে পারবে?

লীলাবতী বলল, আপনিও সঙ্গে চলেন। আমি ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া নিব। আপনার বড় জায়গায় বাস করে অভ্যাস, আপনার হয়তো কষ্ট হবে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি সত্যি আমাদের নিতে চাও?

জি চাই।

এইখানের কাজকর্ম কে দেখবে?

মাসুদ দেখবে। তাকে দায়িত্ব দেন। বটগাছের ছায়ায় অন্য কোনো গাছ বড় হয় না। তাকে বড় হবার সুযোগ দিন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ঠিক আছে তুমি ব্যবস্থা করো। ঢাকা রওনা যেদিন হবো সেদিন মাসুদের তালা খুলে তাকে দায়িত্ব দিব।

লীলা দুপুরে কিছু খেল না। পরীর ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই সে বুঝতে পারছে— পরী খুব হালকাভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এত আরাম লাগছে! তার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর। ঘুম ভাঙার পরপরই খবর নিল— মাসুদকে পেঁপে দেয়া হয়েছে, সে পেঁপে খাচ্ছে। ঘিয়ে ভাজা মুড়ি চেয়েছে। তার জন্যে মুড়ি ভাজা হচ্ছে। লীলার বুকে যে চাপ ভাব ছিল তা নেমে গেল। গায়ে জ্বরও মনে হয় নেই। সে অবেলায় গোসল করল। পরপর দু'কাপ চা খেয়ে বাড়ির পেছনের বাগানের দিকে গেল। শ্বেতপাথরের বেদিতে কিছুক্ষণের জন্যে বসে থাকা। এই জায়গাটা তার খুব প্রিয়। মানুষের স্মৃতির বেশিরভাগ অংশ জুড়েই মানুষ থাকে। দৃশ্যাবলি থাকে না। তবে বাগানের এই অংশের স্মৃতি হয়তোবা তার মাথায় থাকবে। হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়বে।

বাগানে বসে-থাকা অবস্থাতেই লোকমান ছুটে এসে খবর দিল— মাসুদ ভাইজান ফাঁস নিছে।

আছরের ওয়াক্তে মাসুদ ঘটনা ঘটাতে পারে নি। সে ঘটনা ঘটিয়েছে মাগরেবের আজানের ঠিক আগে-আগে। তার আশেপাশে তখন কেউ ছিল না। দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দড়ি থেকে কেউ তাকে নামানোর জন্যে ছুটে আসে নি।

রাতে রমিলার ঘরে কখনো বাতি দেয়া হয় না। ঘরের জানালার সামনের বারান্দায় হারিকেন ঝুলানো থাকে। হারিকেনের আলো ঘরে যতটুকু যাবার যায়। আজ হারিকেন ঝুলানোর কথা কারো মনে নেই। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার। রমিলা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। বাড়িতে অনেক লোকজন। কিছুক্ষণ পর-পর তাঁর সামনে দিয়ে কেউ-না-কেউ আসা-যাওয়া করছে। তিনি প্রতিবারই বলছেন, 'ডর লাগে গো, একটা বাতি দেও।' কেউ তাঁর কথা শুনছে বলে মনে হয় না।

পরীবানু খাটের মাঝখানে বসে আছে। পরীবানুর হাত ধরে আছে লীলাবতী। সে বসেছে খাটের বাঁ পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার গায়ে কোনো শক্তি নেই, যে-কোনো মুহূর্তেই সে গড়িয়ে পড়ে যাবে। পরীবানুর ঘরের মেঝেতে হারিকেন জ্বলছে। মেঝে আলো হয়ে আছে। কিন্তু খাট অন্ধকার। অন্ধকারে পরীবানু বা লীলাবতী কারো মুখই দেখা যাচ্ছে না। ঘরের দরজা খোলা। এই দরজার সামনে দিয়ে কেউ আসা-যাওয়া করছে না। লীলা পরীর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, পানি খাবে? একটু পানি খাও।

পরী স্পষ্ট গলায় বলল, না।

লীলা বলল, একটা কাজ করো, বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকো।

পরী বলল, আপনার শরীর বেশি খারাপ করেছে, আপনি শুয়ে থাকুন।

লীলা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। পরী একটা হাত তুলে দিল লীলার কপালে। হাত ঠাণ্ডা। বেশ ঠাণ্ডা। হাত বা হাতের আঙুল একটুও নড়ছে না। পরী নিজেই স্থির হয়ে আছে। শুধু লীলাবতী একটু পর-পর কেঁপে উঠছে।

সিদ্দিকুর রহমান উঠানে বসে আছেন। লোকমান এবং সুলেমান দু'জনই তাঁর ইজিচেয়ারের পেছনে জবুথবু হয়ে বসে আছে। সুলেমানের সামনে একটা হারিকেন রাখা। সে কিছুক্ষণ পর-পর তার বাঁ হাত হারিকেনের চিমনির গায়ে রাখছে। প্রচণ্ড শীতের সময় এই কাজটা সে করে। ঠাণ্ডা হাত চিমনির গরমে সেঁকে নেয়। আজ গরম পড়েছে। গরমে শরীর ঘামছে। এই গরমে হাত সেঁকার

প্রয়োজন নেই। সিদ্দিকুর রহমানের হাতে হুক্কার নল। তিনি মাঝে মাঝে নলে টান দিচ্ছেন। কিন্তু কোনো ধোঁয়া বের হচ্ছে না। আগুন অনেক আগেই নিভে গেছে। তিনি নিজেও তা জানেন। আগুন আনতে কাউকে পাঠাচ্ছেন না। তাঁর ভয়-ভয় লাগছে। তিনি চাচ্ছেন লোকমান বা সুলেমান তাঁর পাশেই থাকুক। সিদ্দিকুর রহমান গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলেন, সুলেমান!

দুই ভাই একসঙ্গে জবাব দিল— জি চাচাজি?

সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, বাড়িতে একটা মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে কোনো কান্নার শব্দ নাই। এটা কেমন কথা?

লোকমান এবং সুলেমান নড়েচড়ে বসল। কেউ জবাব দিল না। তারা খুব ভালো করে জানে সিদ্দিকুর রহমান তাঁর বেশিরভাগ প্রশ্নেরই জবাব শুনতে চান না।

জন্ম এবং মৃত্যু এই দুই সময়েই শব্দ করে কাঁদতে হয়। জন্মের সময় দু'জন কাঁদে। যার জন্ম হয় সে কাঁদে। আর কাঁদে তার মা। মৃত্যুর সময় অনেকেই কাঁদে। শুধু যে মারা গেল সে কাঁদতে পারে না। সুলেমান!

জি চাচাজি?

থানায় কি লোক গিয়েছে?

জি, ওসি সাহেব আসতেছেন।

জানাজার ব্যাপারে কোনো মীমাংসা হয়েছে?

জি-না। মওলানা সাহেব বলেছেন, অপঘাতে মৃত্যু, জানাজা হবে না। কিতাবে লেখা আছে।

তুমি মাওলানা সাহেবকে বলে আসো— অপঘাতে মৃত্যু হলে জানাজা হবে না এটা কোন কিতাবে লেখা আছে আমাকে যেন এনে দেখায়।

এখন যাব?

হ্যাঁ, এখন যাবে।

সুলেমান চলে গেল। লোকমান হারিকেনের দিকে একটু এগিয়ে গেল। মনে হচ্ছে একা হয়ে যাওয়ায় সে খানিকটা ভয় পাচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। তিনি এই মুহূর্তে রমিলার কথা ভাবছেন। মাতা কি পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন? হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো, মস্তিষ্ক বিকৃত থাকার কিছু সুবিধা আছে। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ এই মস্তিষ্কবিকৃত মহিলা সহজভাবে গ্রহণ করবে। চিৎকার-কান্নাকাটি করবে না। ঘটনাটা হয়তো সে বুঝতেই পারবে না। এটা তার জন্যে মঙ্গলজনক।

লোকমান!

জি চাচাজি ?

মাসুদের মাতাকে কি মৃত্যুসংবাদ দেয়া হয়েছে ?

চাচাজি, আমি জানি না। খোঁজ নিয়া আসি।

খোঁজ নিয়া আসার প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই যাব।

হুক্কা ঠিক করে দিব চাচাজি ? আগুন নাই।

দাও, হুক্কা ঠিক করে দাও।

লোকমান প্রায় বিড়বিড় করে বলল, বাংলাঘরে অনেক লোক আসছে। আপনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কথা বলার কিছু নেই। তারা যেন এইদিকে না আসে।

জি আচ্ছা।

পরীবানুর বাড়ি থেকে কেউ এসেছে ?

উনার পিতা এসেছেন।

তাঁকে ভিতর-বাড়িতে নিয়ে যাও। মেয়ের সঙ্গে কথা বলায়ে দাও।

জি আচ্ছা।

মরাবাড়িতে তিনদিন তিনরাত চুলা জ্বালানো হয় না। চুলা যেন না জ্বালানো হয়।

জি আচ্ছা।

আশেপাশের বাড়ি থেকে মরাবাড়িতে খানা পাঠায়। এই বাড়িতে কেউ যেন খানা না পাঠায়।

জি আচ্ছা।

লোকমান কল্কেতে আগুন ধরিয়ে দিল। সিদ্দিকুর রহমান হুক্কার নলে একটা টান দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। রমিলার সঙ্গে কথা বলা দরকার। মাতাকে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ দেয়া প্রয়োজন। তাঁর মন বলছে, এই সংবাদ রমিলা এখনো পায় নাই। লোকমান তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল। তিনি লোকমানকে বললেন, তুমি বাংলাঘরে যাও। যারা এসেছেন তাদের দেখভাল করো। পান-তামাক দাও।

রমিলার ঘরের সামনের হারিকেনটা এখন জ্বালানো হয়েছে। হারিকেনের আলোয় দেখা যাচ্ছে, রমিলা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সিদ্দিকুর রহমানকে দেখেই তিনি মাথায় কাপড় তুলে দিলেন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কেমন আছ ?

রমিলা বললেন, ভালো আছি। আপনার শরীর কেমন ?

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমার শরীর ভালো। বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, এই খবর কি পেয়েছ ?

রমিলা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, খবর কে দিয়েছে ?

রমিলা বললেন, আমি একজনের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। তার নাম আপনেরে বলব না। আপনি মাসুদের বিষয় নিয়া অস্থির হবেন না। এখন অস্থির হওয়ার সময় না।

তুমি অস্থির না ?

না। সবেই সবের কপাল নিয়া আসে। মাসুদ তার কপাল নিয়া আসছে। তার কপালে যা ছিল তা-ই ঘটেছে। আল্লাহপাকের এইরকম ইচ্ছা ছিল।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি যা ভেবেছ তা ভাবলে মনে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনা সেরকম না। মানুষ নিজে তার কপাল তৈরি করে। এই স্বাধীনতা আল্লাহপাক মানুষকে দিয়েছেন।

রমিলা বললেন, মানুষের ভাগ্যে যা লেখা তার অতিরিক্ত কোনোকিছু করার ক্ষমতা তার নাই। এই বিষয়টা আমার মতো ভালো কেউ জানে না। আপনে যদি চান আপনারে বুঝায়ে বলতে পারি।

সিদ্দিকুর রহমান বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে রমিলাকে তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অত্যন্ত সুস্থ একজন মহিলা, যে-মহিলা জটিল তর্ক শুরু করতে পারে এবং তর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিনি রমিলার জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন। কোমল গলায় বললেন, তোমার খাওয়াদাওয়া কি হয়েছে ?

রমিলা বললেন, জি না। আইজ রাইতে আমি কিছু খাব না। আমি উপাস দিব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, তুমি যদি চাও আমি তোমার ঘরের দরজার তালা খুলে দিব। তুমি লীলার সঙ্গে থাক। লীলার মন ভালো হবে। সে বড়ই অস্থির হয়ে আছে।

রমিলা বললেন, আপনি লীলার কথা বললেন। তার মন ঠিক করার ব্যবস্থা নিলেন, কিন্তু মাসুদের স্ত্রীর বিষয়ে কিছু বললেন না। তার মন ঠিক করার বিষয়ে কিছু ভেবেছেন ?

না।

যান, তার মনটা ঠিক করে দেন।

কীভাবে ঠিক করব ?

রমিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্পষ্ট গলায় বললেন, আপনি তার কাছে যান। তার মাথায় হাত রেখে শুধু 'মা' বলে একবার ডাকেন।

তাতেই মন ঠিক হবে ?

হুঁ। মা বলে ডাক দিলে মেয়েটা কাঁদতে শুরু করবে। বড় কষ্ট পেলে মনে বিষ তৈরি হয়। তখন যদি কেউ কাঁদে, মনের বিষ চোখের পানির সঙ্গে বের হয়ে যায়।

বাহ, ভালো বলেছ। এইসব কি নিজে নিজেই বের করেছ, না কেউ তোমাকে আগে বলেছে ?

রমিলা জবাব দিলেন না। বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি লোকমানকে পাঠাচ্ছি। সে তোমার ঘরের দরজা খুলে দিবে।

আপনার মেহেরবানি।

মাসুদের মৃত্যুসংবাদ তোমাকে কে দিয়েছে এটা আমাকে বলতে চাচ্ছ না কেন ?

বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। কেউ আমাকে বিশ্বাস না করলে আমার খারাপ লাগে।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, অবিশ্বাস করার তো কিছু নাই। তুমি শুধু শুধু মিথ্যা কথা কেন বলবে ?

রমিলা চাপা গলায় বললেন, মাসুদের মৃত্যুসংবাদ আমাকে সে নিজেই দিয়েছে। আমার ঘরে সে এসেছিল। আমার বিছানায় অনেকক্ষণ বসেছিল। বারান্দায় যখন হারিকেন জ্বালাল তখন চলে গেল। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন ?

সিদ্দিকুর রহমান জবাব দিলেন না। রমিলা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এইজন্যেই তার নামটা আপনারে বলি নাই।

সিদ্দিকুর রহমান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপ। স্বাভাবিক আচরণের মাঝখানে ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকতা। তালা খুলে এই উন্মাদকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। যে-কোনো মুহূর্তে সে ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবে। তিনি পরীবানুর ঘরের দিকে রওনা হলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, পা টেনে এগোতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। শরীর ভারী হয়ে গেছে। পা ক্লান্ত। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কি আলাদা করে বিশ্রাম চায় ? চোখ ক্লান্ত হলে চোখের পাতা নেমে আসে। পা ক্লান্ত

হলে হাঁটার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তাঁরও কি এরকম হবে ? পরীবানুর ঘরের কাছে এসে পা থেমে যাবে ?

পরী ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। লীলা পরীর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। পরীর একটা হাত লীলার কপালে। শ্বশুরকে দেখে পরী লীলার কপাল থেকে হাত তুলে নিল। শ্বশুরের দিকে তাকাল।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন— মা, তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমার ছেলে যে এমন কাণ্ড করবে আমি বুঝতে পারি নাই।

পরী জবাব দিল না। শ্বশুরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে রাগ, অভিমান, দুঃখ কিছুই নেই। আবেগহীন, ভাষাহীন বড় বড় চোখ।

সিদ্দিকুর রহমান পরীর কাছে এগিয়ে গেলেন। তার মাথায় হাত রাখলেন। পরী সামান্য কেঁপে উঠল। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, এত বড় দুর্ঘটনা আমার কারণে ঘটেছে। তার জন্যে তুমি যদি আমাকে কোনো শাস্তি দিতে চাও দিতে পারো।

সিদ্দিকুর রহমান পরীর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। পরীর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। একসময় তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে শুরু করল।

রাত এগারোটা।

বড়বাড়ির পেছনের বাগানে মাসুদের জন্যে কবর খোঁড়া হয়েছে। লাশ ধোয়ানো হয়েছে। কাফন পরিয়ে রাখা হয়েছে। জানাজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লাশ কবরে নামানো হবে। মধ্যরাতের আগেই লাশ কবরে নামাতে হয়।

সিদ্দিকুর রহমানকে মধ্যরাতে জানানো হলো, ইমাম সাহেব জানাজা পড়তে কিছুতেই রাজি না। তবে তিনি খাস দিলে দোয়াখায়ের করবেন। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, ঠিক আছে। আল্লাহপাক মাসুদের কপালে যা রেখেছেন তা-ই হবে। লাশ কবরে নামানোর ব্যবস্থা করো। তবে মাটি দিও না। লাশ কবরে নামানোর পর ইমাম সাহেবকে খবর দিয়ে আনবে, তিনি যেন দোয়া করেন। তাঁর দোয়ার পরে মাটি দেয়া হবে।

ইমাম সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। তিনি কিছুটা সংকুচিত। সেই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে আনন্দিত। অতি ক্ষমতাবান একজনের হুকুম তিনি অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। এমন যুক্তিতে করেছেন যে ক্ষমতাবান মানুষটার বলার কিছু নাই। এই অঞ্চলে তাঁকেও লোকজন ক্ষমতাধর মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করবে।

বিডিবাংলা ডট কম

ইমাম সাহেবের নাম আব্দুল নূর। ফরিদপুরের মানুষ। এই অঞ্চলে স্থায়ী হয়ে গেছেন। ঘর-বাড়ি করেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেন। তাঁর বাড়ির নাম হয়েছে ইমামবাড়ি। ইমাম সাহেবের জিন-সাধনা আছে এমন জনশ্রুতি। এই বিষয়ে কেউ কিছু জানতে চাইলে তিনি মধুর ভঙ্গিতে হাসেন। হ্যাঁ-না কিছুই বলেন না।

আব্দুল নূর উঠানে সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে এসে অতি বিনয়ী গলায় বললেন, জনাব, আপনি আমার উপর বিরাগ হবেন না। অপঘাতে মৃতের জানাজা হবার নিয়ম নাই। ইসলামি কানুনের বরখেলাপ হয় এমন কিছুই আমি করব না। যদি করি তাহলে আল্লাহ্‌পাক নারাজ হবেন। মানুষের নারাজি আমি নিতে পারব, আল্লাহ্‌পাকের নারাজি নিতে পারব না।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আপনার নিজের যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে তো আপনারও জানাজা হবে না। ঠিক না?

জি ঠিক।

সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, আমার ছেলের যদি জানাজা না হয় তাহলে আপনারও যেন জানাজা না হয়— সেই ব্যবস্থা আমি নিতে পারি, তা কি আপনি জানেন?

আব্দুল নূর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি যে মানুষ খারাপ এটা সবাই জানে। আপনি বিদেশী লোক বলে আপনি জানেন না। আমার ছেলের জন্যে দোয়া করবেন এইজন্যে আপনারে আমি ডাকি নাই। এই কথাগুলি বলার জন্যে ডেকেছি। এখন আপনি যান।

আব্দুল নূর বিড়বিড় করে বললেন, জনাব, আমি জানাজা পড়াব।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, খুবই ভালো কথা, লাশ কবরে নামানো হয়ে গেছে, লাশ কবর থেকে তুলে জানাজার ব্যবস্থা করেন। একবার লাশ কবরে নামানোর পর সেই লাশ আবার তোলার বিষয়ে কি কোনো বিধি-নিষেধ আছে?

জি-না।

এখন আমার সামনে থেকে যান।

জি আচ্ছা।

আব্দুল নূর মাথা নিচু করে বের হয়ে গেলেন। আব্দুল নূর এবং সিদ্দিকুর রহমান দু'জনের কেউই টের পেলেন না এই নাটকীয় কথোপকথন বারান্দা থেকে শুনল পরীবানু। সিদ্দিকুর রহমান নামের মানুটার উপর থেকে হঠাৎ তার সব রাগ দূর হয়ে গেল।

'আমি কন্যা লীলাবতী, ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।'

আমার কোনো ভাই নেই। একটা ভাই ছিল। সে মারা গেছে। এখনো কি আমি ভাগ্যবতী? মানুষ আলাদা আলাদা ভাগ্য নিয়ে আসে না। একজনের ভাগ্যের সঙ্গে আরেকজনের ভাগ্য জড়ানো থাকে। একজনের ভাগ্যে ধ্বস নামলে, পাশের জনের ভাগ্যেও লাগে। আচ্ছা, এইসব আমি কী লিখছি? আর কেনইবা লিখছি? কে পড়বে আমার এই লেখা!

কেউ না পড়ুক, আমি আমার ভাইয়ের বিষয়টা গুছিয়ে লিখতে চাই। আমার মন বলছে, খুব গুছিয়ে বিষয়টা লিখলেই আমার মন অনেক হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু লিখবটা কী? আমি তো তাকে সেইভাবে জানি না। তার জানাজা পড়ানো হলো শহরবাড়ির সামনের মাঠে। জানাজায় মেয়েরা অংশ নিতে পারে না। জানাজার পুরো ব্যাপারটা আমি দেখলাম জানালা দিয়ে। আমার পাশে পরীবানুও দাঁড়িয়ে ছিল। একবার ভাবলাম তাকে বলি, তোমার দেখার দরকার নেই। তোমার মন খারাপ হবে। তারপরই মনে হলো, সে যে অবস্থায় আছে তারচে' খারাপ হবার তো কিছু নেই।

তবে পরীবানু শক্ত মেয়ে। সে কাঁদছিল, কিন্তু চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলছিল না। জানাজা প্রক্রিয়াটি সে দেখছিল যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে।

একটা নকশাদার খাটিয়ায় সাদা কাপড়ে মোড়ানো কফিন। তিনটা হ্যাজাক লাইট জ্বালানো হয়েছে। এর মধ্যে একটা নষ্ট। কিছুক্ষণ পর পর হ্যাজাকের সাদা আলো লাল হয়ে যাচ্ছে। খাটিয়ার চার মাথায় আগরবাতি জ্বলছে। আগরবাতির আলো জোনাকির মতো জ্বলছে নিভছে। বাতাস ছিল না বলে আগরবাতির ধোঁয়া সোজা উপরের দিকে উঠছে। চারদিকের গাঢ় অন্ধকারে সাদা ধোঁয়ার সুতা আকাশে মিশে যাচ্ছে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে।

সারি বেঁধে সবাই দাঁড়িয়েছে। নামাজ শুরু হবার আগে বাবা বললেন, জানাজার নামাজের আগে মৃত ব্যক্তির সৎগুণ নিয়ে আলোচনা নবীর সুন্নত। নবীজি এই কাজটি করতেন। আপনারা আমার ছেলে সম্পর্কে ভালো কিছু যদি জানেন তাহলে কি একটু বলবেন?

সারি বেঁধে দাঁড়ানো লোকজন একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। গুনগুন শব্দও হচ্ছে। কেউ এগিয়ে আসছে না। বাবা বললেন, মিথ্যা করে কিছু বলবেন না। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে মিথ্যা মিথ্যি ভালো ভালো কথা বলা হয়। দয়া করে কেউ মিথ্যাচার করবেন না।

কেউ এগিয়ে আসছে না। আমার খুবই রাগ লাগছে। আমি গুনে দেখেছি সর্বমোট একশ' ষোলজন মানুষ আছে জানাজায়। এতজন মানুষের কেউ আমার ভাই সম্পর্কে একটা ভালো কথা বলবে না ? কোনো সৎগুণই কি তার নাই ? পরীবানু আমার কাঁধে হাত রেখেছে। সেই হাত থরথর করে কাঁপছে। পরীবানু ভাঙা গলায় বলল, বুবু, কেউ কিছুই বলতেছে না কেন ? কেন কেউ কিছু বলে না ?

পরীবানুর ভাঙা গলা, তার শরীরের কাঁপুনি, আমার রাগ এবং দুঃখবোধ সব মিলিয়ে কিছু একটা হয়ে গেল— আমি জানালার পর্দা সরিয়ে উঁচু গলায় বললাম, আমি কিছু বলব। আমার গলার স্বর মনে হয় যথেষ্টই উঁচু ছিল। সবাই জানালার দিকে তাকাল। মওলানা সাহেবের ভুরু যে কুঁচকে উঠেছে তা আমি না দেখেও বুঝতে পারছিলাম। তিনি ফিসফিস করে বাবাকে কী যেন বললেন। খুব সম্ভবত তিনি বললেন— এইসব বিষয়ে মেয়েরা কিছু বলতে পারবে না। তারা থাকবে পর্দায়। মওলানা সাহেবের কথা না শোনা গেলেও বাবার কথা শোনা গেল। বাবা বললেন, মেয়েদের যদি কিছু বলার থাকে তারাও বলতে পারে। আমি তাতে কোনো দোষ দেখি না। মা তুমি বলো। পর্দার আড়াল থেকে বলো।

আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। আমি তো মাসুদের বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি তাকালাম পরীবানুর দিকে। পরীবানু বলল, বুবু বলেন— সে জীবনে কোনোদিন কোনো মিথ্যা কথা বলে নাই।

আমি নিচুগলায় পরীকে বললাম, কথাটা বোধহয় ঠিক না। তুমি ভেবে বলো, যেটা সত্যি সেটা বলো।

পরীবানু বলল, বুবু, আপনাকে ভুল বলেছি, সে মিথ্যা কথা বলতো। তার মতো নরম দিলের মানুষ তিন ভুবনে ছিল না, কোনোদিন হবেও না। আপনি এই কথাটা বলেন।

আমি বললাম, আমার ভাই ছিল অতি হৃদয়বান একজন মানুষ।

পরীবানু বলল, তার বিষয়ে আরো অনেক কিছু বলার আছে বুবু, এখন মনে আসতেছে না।

আমি বললাম, থাক আর দরকার নাই।

WWW.BDBANGLA.COM

মাসুদের কবর হলো বাড়ির পেছনে জামগাছের তলায়। পাশাপাশি দুটা জামগাছ— একটা বড়, একটা ছোট। গাছতলায় কবর দেয়ার কারণ হলো— গাছপালা সবসময় আল্লাহর জিকির করে। সেই জিকিরের সোয়াব কবরবাসী পায়।

স্বামীর কবরের কাছে যাওয়া পরীবানুর জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীরা না-কি স্বামীর কবরের কাছে যেতে পারে না। এতে পেটের সন্তানের বিরাট ক্ষতি হয়।

আমি পরীবানুকে বললাম, তোমার যখন ইচ্ছা হবে তুমি কবরের কাছে যাবে। এত নিষেধ মানার কিছু নাই। তবে রাতে যদি কখনো যেতে ইচ্ছা করে একা যাবে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

পরী বানু বলল, একা যাব না কেন ?

আমি বললাম, ভয় পেতে পারো।

পরীবানু বলল, ভয় পাব কেন ? যে জীবিত অবস্থায় আমাকে ভালোবেসেছে সে মৃত অবস্থায় আমাকে কেন ভয় দেখাবে ?

আমি বললাম, তোমার যদি একা যেতে ইচ্ছা করে তুমি একা যেও। অসুবিধা নেই।

পরীবানু প্রতি রাতেই মাসুদের কবরের কাছে যেত। বেশির ভাগ সময় আমি থাকতাম সঙ্গে। এক রাতে একটা ঘটনা ঘটল। শহরবাড়ি থেকে কবরে যেতে হলে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বাঁশঝাড়ে ঢুকেছি। সেখান থেকে হঠাৎ কবরের দিকে চোখ গেল। দেখি একটা ছায়ামূর্তি কবরে হাঁটাহাঁটি করছে। ছায়ামূর্তি দেখতে অবিকল মাসুদের মতো। মাসুদ যেমন মাথা ঢেকে চাদর পরত ছায়ামূর্তির গায়ে সেরকম চাদর। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। পরীবানু অস্ফুট শব্দ করে আমার হাত ধরে ফেলল। তারপরই চাপা গলায় বলল, বুবু, কিছু দেখেছেন ?

আমি বললাম, চল ফেরত যাই।

পরীবানু বলল, আপনি বাড়িতে চলে যান। আমি যাব না। আমি তার কাছে যাব। এই দেখেন আপনার ভাই হাত ইশারায় ডাকতেছে।

পরীবানুর গলার স্বর গম্ভীর। সে যে কবরের কাছে যাবে তা তার গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত দু'জনে মিলেই গেলাম। কবরের কাছাকাছি যাবার আগেই ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল।

সেই রাতেই এই ঘটনা বাবার কানে পৌঁছল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বাবা খাটে পা তুলে বসেছিলেন। তাঁর সামনে হুক্কা। তিনি নল হাতে বসে আছেন। হুক্কা টানছেন না। আমি তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি ইশারা করলেন বসতে। আমি তাঁর পাশে বসলাম। বাবা আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন— এইটা কি মাস জানো ?

আমি বললাম, আশ্বিন মাস।

বাবা বললেন, আশ্বিন মাসে চাঁদের দশ তারিখ থেকে বিশ তারিখ গ্রামের মানুষ ভূত-প্রেত বেশি দেখে, এইটা জানো ?

আমি বললাম, জানি না।

আশ্বিন মাসে কুয়াশা থাকে। কুয়াশার ভিতর জোছনা হয় মরা মরা। গাছের পাতার ফাঁকে এই জোছনা যখন আসে তখন মনে হয় ভূত-প্রেত।

আমি বাবার কথা বুঝতে পারছিলাম না। তিনি প্রস্তাবনা শুরু করেছেন। মূল বক্তব্যে এক্ষুনি যাবেন, তার জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো।

লীলা শোনো। জামগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আশ্বিন মাসের ১৩ তারিখে জোছনা নেমেছে। সেই জোছনায় ছায়া তৈরি হয়েছে। ছায়াটা পড়েছে কবরে। তোমরা সেই ছায়াটাকে মনে করেছ মাসুদ। মৃত মানুষ ফিরে আসে না। কায়া ধরেও আসে না, ছায়া ধরেও আসে না।

বাবার যুক্তি আমি সঙ্গে সঙ্গে মানলাম। এত পরিষ্কার চিন্তা গ্রামের মানুষ সাধারণত করে না। কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস না থাকলে চিন্তার মতো পরিশ্রমের কাজ গ্রামের মানুষজন করে না। এই মানুষটা করেন। ভালোমতোই করেন।

লীলা।

জি।

যদি একজন কেউ ভূত দেখে ফেলে তখন অন্যরাও দেখা শুরু করে। ভূত দেখা কলেরা রোগের মতো। একজনের হলে তার আশেপাশে দশজনের হয়। কাজেই তোমরা ভূত দেখাদেখি নিয়ে আলোচনা করবে না।

জি আচ্ছা।

কাল সকালে আমি জামগাছ দুটা কাটায়ে ফেলব। কবরের আশেপাশে গাছ থাকার প্রয়োজন নাই।

মনে হয় তাঁর কথা বলা শেষ হয়েছে। তিনি তামাক টানা শুরু করেছেন। আমি চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম না, বসেই রইলাম। অতি নিঃসঙ্গ এই

মানুষটার জন্যে মায়া লাগছে। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এত বড় ঘটনা ঘটে যাবার পরেও মানুষটার মানসিক শক্তি আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। বড় ধরনের ধাক্কা তিনি খেয়েছেন। তার ছাপ আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি আগের মতো হেঁটে জঙ্গলা ভিটায় যেতে পারেন না। তাঁকে এখন লোকমান-সুলেমানের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে হয়।

লীলা, তুমি কিছু বলতে চাও ?

আমি বললাম, আপনি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন না ?

বাবা তামাক টানা বন্ধ করে আমার দিকে ফিরলেন। আগে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম, এখন বসেছি মুখোমুখি। বাবা বললেন, মানুষ মরে ভূত-প্রেত হয় এইসব বিশ্বাস করি না, তবে অন্য কিছু আছে।

অন্য কিছুটা কী ?

ভূত-প্রেত জগতের জিনিস। আমি একবার দেখা পেয়েছিলাম। তুমি কি ঘটনাটা শুনতে চাও ?

শুনতে চাই।

তোমার মাকে বিবাহের রাতেই ঘটনাটা বলেছিলাম। সে অত্যধিক ভয় পেয়েছিল।

আমি সহজে ভয় পাই না।

বাবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমার মতো হয়েছ। আমার মধ্যে ভয়-ডর কম। সব মানুষের মৃত্যুভয় থাকে। আমার সেই ভয়ও নাই। মৃত্যু যখন হবার হবে। তার ভয়ে অস্থির হবার কিছু নাই।

আপনি ঘটনাটা বলেন।

আমার যৌবনকালের ঘটনা। বয়স কুড়ি-একুশ। তারচেয়ে কিছু কমও হতে পারে। তখন হলো টাইফয়েড। বাংলায় বলে সান্নিপাতিক জ্বর। তখন টাইফয়েড রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। এই রোগ হওয়া মানেই মৃত্যু। আমার মৃত্যু হলো না, একত্রিশ দিনের মাথায় জ্বর ছাড়ল। শরীর অতি দুর্বল। দুই পা হাঁটলে মাথা ঘুরে। কিছু খেতে পারি না। হজম হয় না। দুইবেলা জাউ ভাত আর শিং মাছের ঝোল খাই। আমার দাদি তখন আমার স্বাস্থ্য ঠিক করার দায়িত্ব নিলেন। তিনি হুকুম দিলেন, প্রতিদিন যেন আমাকে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে নিয়ে যাওয়া হয়। নদীর টাটকা হাওয়া রুচিবর্ধক। চারজন বেহারা পালকিতে করে আমাকে নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে পাটি পেতে দিয়ে দূরে গিয়ে গাজা ভাং খায়। সন্ধ্যা মিলাবার পর আমাকে নিয়ে ফিরে আসে। আমি নদীর দিকে তাকিয়ে শীতল পাটিতে শুয়ে থাকি।

জায়গাটা অতি নির্জন। আশেপাশে কোনো লোকবসতি নাই। নদীর ঐ পাশে ঘন বন। দিনেরবেলায়ও শিয়াল ডাকে।

একদিনের ঘটনা। সন্ধ্যা হয়েছে। দিনের আলো সামান্য আছে। আমি শুয়ে আছি। বেহারা চারজন দূরে কোথাও গেছে। গাজা-টাজা খাচ্ছে হয়তো। আমার দৃষ্টি নদীর পানির দিকে। হঠাৎ দেখি পানিতে ঘূর্ণির মতো উঠেছে। এটা এমন কোনো বিশেষ ঘটনা না। নদীর পানিতে প্রায়ই ঘূর্ণি ওঠে।

হঠাৎ আমার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। আমি শোয়া থেকে উঠে বসলাম। দেখি নদীর ঘূর্ণি থেকে কে যেন মাথা ভাসায়ে দিয়েছে। প্রথমে চুল দেখলাম, তারপর মাথা। সেই মাথা পুরাপুরি মানুষের মাথা না। চোখ নাই। যাদের চোখ থাকে না তাদের চোখে কোটর থাকে। এর তাও নাই। চোখের জায়গায় মুখের চামড়ার মতো চামড়া। বাকি সব ঠিক আছে। নাক আছে, মুখ আছে, কান আছে। জিনিসটা বুক পর্যন্ত পানির উপর উঠল। তারপর কথা বলল। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল— 'এই, মন দিয়ে শোন। পিতলের একটা ঘড়া মাটিতে পোতা আছে। তোকে দিলাম। তুই ভোগদখল কর। ঘড়াটা কই আছে নজর করে দেখ। তাকা আমার আঙুলের দিকে।'

এই বলেই সে আমার দিক থেকে আঙুল সরিয়ে নদীর পাড়ের একটা অংশ আঙুল দিয়ে দেখাল। যেভাবে সে পানি থেকে আস্তে আস্তে উঠেছিল সেইভাবেই আস্তে আস্তে পানিতে ডুবে গেল। সারাক্ষণই আঙুল নদীর পাড়ের দিকে ধরে থাকল। আমি অজ্ঞান হয়ে পাটিতে পড়ে গেলাম। বেহারারা অজ্ঞান অবস্থাতেই আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। আমার জ্ঞান ফিরে চার ঘণ্টা পরে। তখন আমার সারা শরীর দিয়ে 'বিজল' বের হচ্ছে। 'বিজল' চিন ? বিজল হলো তৈলাক্ত জিনিস।

বাবা থামলেন। এখন তিনি আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি আবারো মুখ ঘুরে বসেছেন। আমার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়েছে এরকম ভাব। আমি বললাম, আপনি তখন খুব অসুস্থ ছিলেন। শীতল পাটিতে শুয়ে থাকলেন। উঠে বসার মতো সামর্থ্যও ছিল না। আমার ধারণা আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা আপনার কাছে সত্যি মনে হয়েছে। মাঝে মাঝে অনেক স্বপ্ন আমাদের কাছে সত্যি মনে হয়।

বাবা বললেন, তোমার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। যুক্তির কথা আমার পছন্দ।

আমি বললাম, অন্ধ মানুষটা আপনাকে যে জায়গাটা দেখিয়েছিল সেই জায়গাটার কি আপনি খোঁজ করেছিলেন ?

বাবা শান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ। পরের দিনই সেখানে গিয়েছি।

কিছু পান নাই ?

বাবা শান্ত গলায় বললেন, খুঁড়াখুঁড়ি করি নাই।

কেন করেন নাই ? আপনার কৌতূহল হয় নাই ?

কৌতূহল হয়েছে, কিন্তু ভূত-প্রেতের কাছ থেকে কিছু নিতে ইচ্ছা করে নাই। তবে সেই জায়গা আমি পরে কিনে নিয়েছি। আমি মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার দিকে ঐ জায়গায় বসে থাকি।

অন্ধ লোকটার দেখা পাওয়ার জন্যে ?

হ্যাঁ, তবে তাকে লোক বলবে না। সে মানুষ না, অন্য কিছু।

আবার তার দেখা পেতে চান কেন ?

আমি তাকে জিজ্ঞেস করব, সে কে ?

'সে কে' এটা জেনে আপনার লাভ কী ?

কোনো লাভ নাই। কৌতূহল মিটানো। মানুষ কৌতূহল মিটানোর জন্যে অনেক কিছু করে। শুধু যে মানুষ করে তা-না। পশুপাখি কীটপতঙ্গ সবাই কৌতূহল মিটাতে চায়। তুমি যদি সন্ধ্যাবেলায় একটা কুপি জ্বালাও, দেখবে অনেক পোকা আগুনে এসে পড়ে। তাদের কৌতূহল হয় আগুন জিনিসটা কী জানার। জানতে এসে মারা পড়ে।

আপনি আমাকে একদিন আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন ? জায়গাটা দেখব।

অবশ্যই নিয়ে যাব। কবে যাবে বলো। কাল যেতে চাও ?

হ্যাঁ যাব।

আমি এখন আমার বাবার প্রসঙ্গে কিছু কথা বলি। তিনি শুরুতে আমার কাছে ছিলেন অতি দুষ্ট একজন মানুষ। যে তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে দূরে ঠেলে দেয়— আরেকটি বিবাহ করে। সুখে যে ঘর-সংসার করে তা-না। স্ত্রীকে তালা আটকে বন্দি করে রাখে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর মনে হলো— ভয়াবহ দুষ্ট মানুষদের একজন সম্ভবত তিনি না। ক্ষমতাধর মানুষদের দুর্বলতা তাঁর মধ্যে আছে। বদরাগ, অহঙ্কার— এইসব বিষয় তাঁর কাছে চরিত্রের অহঙ্কার। দুর্বলতা না।

এখন মনে হচ্ছে মানুষটা ভাবুক প্রকৃতির। শুধু যে ভাবুক তা-না। তার মধ্যে চিন্তা করার দুর্লভ ক্ষমতা আছে। মানুষটির ভালোবাসার ক্ষমতাও প্রবল। তাঁর ভালোবাসা আড়াল করার চেষ্টাটাও চোখে পড়ার মতো— আমি ভালোবাসব কিন্তু কেউ যেন তা বুঝতে না পারে।

এই মানুষটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ রহস্যময়তাও আছে। তাঁর মাথায় ঘুরছে 'আশ্রম'। সেই আশ্রমও তাঁর কল্পনার আশ্রম। বিশাল একটা এলাকা থাকবে। সেই এলাকায় পশুপাখি নিজের মতো করে ঘুরবে কিন্তু কোনো মানুষ থাকবে না। মানুষ বলতে তিনি একা থাকবেন।

বাবা তাঁর আশ্রম তৈরি করা শুরু করেছেন। আমি একদিন দেখে এসেছি। দুনিয়ার পাখি সেখানে। পাখি কেনইবা আসবে না ? তাদেরকে ধান, কুড়া, সরিষাদানা আর কী কী যেন খেতে দেয়া হয়। অনেক গাছে দেখলাম মাটির কলসি উল্টা করে বাঁধা। যে সব পাখি বাসা বাঁধতে জানে না তাদের জন্যেই এই ব্যবস্থা।

এই বিষয়টিকে কি আমি পাগলামি বলব ? কিছু পাগলামি সব মানুষের মধ্যেই আছে। তবে বেশির ভাগ মানুষ এইসব পাগলামি প্রশ্রয় দেয় না। বাবা দেন। পাগলামি প্রশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা আছে বলেই হয়তো দেন।

বাবার প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত গল্প এখন বলব। এই গল্পে আমার বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। ঘটনাটা আমি কাছ থেকে দেখেছি।

নান্দিপুর থেকে একবার বাবার কাছে এক লোক এলো তার ছেলেকে নিয়ে। নান্দিপুর আমাদের এখান থেকে প্রায় ছয় ক্রোশ অর্থাৎ বার মাইল দূর। ছেলেটার বয়স দশ-এগারো। খুবই অসুস্থ। কয়েক বছর ধরে না-কি সে কিছুই খেতে পারে না। হজম হয় না। অতি সহজপাচ্য ভাতের মাড়, চিড়ার ক্বাথ এইসব তাকে খাওয়ানো হয়। এটাও সে হজম করতে পারে না। ছেলেটা রোগা কাঠি। দেখে মনে হয় পাঁচ-ছয় বছর বয়স। তার বাবা এই দীর্ঘ পথ তাকে ঘাড়ে করে এনেছে। ছেলের হাঁটারও ক্ষমতা নেই।

বাবা বললেন, আমার কাছে আসছ কী জন্যে ? চিকিৎসার খরচা চাও ?

ছেলের বাবা বলল, না। চিকিৎসার খরচার জন্যে আপনার কাছে আসি নাই। আপনি তারে একটু 'উতার' (পানি পড়া) দেন।

আমি তারে উতার দিব ? আমি কি পীর-ফকির ?

আপনের দেওয়া 'উতার' খাইলে তার রোগ সারব।

তোমাকে কে বলেছে ?

লোকটা জবাব দিল না। মাথা গোঁজ করে ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা লোকমান চাচাকে বললেন, এদেরকে যেন বাড়ির সীমানা থেকে বের করে দেয়া হয়।

তাই করা হলো। লোকটা কিন্তু গেল না। বাড়ির সীমানার বাইরে একটা আমগাছের নিচে ছেলেকে নিয়ে বসে রইল। শীতের রাত। তারা কাপড়চোপড় নিয়ে আসে নি। লোকটা শুকনো লতাপাতা জোগাড় করে আগুন ধরাল। আগুনের পাশে ছেলেকে নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে রইল। অদ্ভুত এক দৃশ্য! রাত দশটার দিকে আমি বাবাকে গিয়ে বললাম, পানি পড়া চাচ্ছে, দিয়ে দেন। ছেলেকে নিয়ে চলে যাক।

বাবা বললেন, যে জিনিস আমি জানি না সেটা আমি কেন করব ?

আমি বললাম, তাদের মনের শান্তির জন্যে করবেন।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, অন্যের শান্তি নিয়া আমি মাথা ঘামাই না। তুমি এই বিষয়ে আমার সঙ্গে দরবার করবা না।

এরা গাছতলায় বসে আছে।

থাকুক।

রাত এগারোটার দিকে বাবা বললেন, ঝাল মুরগির সালুন রান্না করো। পোলাও রান্না করো। ছেলেকে ডাক। এই ছেলে দিনের পর দিন বিস্বাদ জাউ ভাত খায়। পোলাউ দেখে মুখে রুচি আসবে। আরাম করে খাবে। তাতেই কাজ হবার কথা। দেখা যাক।

তাদেরকে যত্ন করে খাবার দেয়া হলো। বড় বড় জামবাটি ভর্তি মাংস। পোলাও-এর ডিসে ধোঁয়া উঠা কালিজিরা চালের সুগন্ধি পোলাও।

ছেলেটার নাম নসু মিয়া। সে চোখ বড় বড় খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকল। বাবা বললেন, একে এলাচি লেবু দাও। পিয়াজ, কাঁচামরিচ দাও।

নসু মিয়া ভয়ে ভয়ে তার বাবার দিকে তাকাল। তার বাবা আগ্রহের সঙ্গে বলল, খাও গো বাপধন। উনি যখন খেতে বলেছেন খাও। বমি যদি হয়—হইব। নিশ্চিন্ত মনে খাও।

নসু ভরপেট খেল। তার কোনো সমস্যাই হলো না। সকালবেলা ডিমভুনা দিয়ে খিচুড়ি খেয়ে বাবার হাত ধরে বাড়ি রওনা হয়ে গেল।

ঘটনাটার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক বিষয় নেই। কিন্তু পিতা এবং পুত্র বিষয়টিকে 'ফকিরি' ঘটনা হিসেবে ধরেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম মনে করাই স্বাভাবিক। মানুষ অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতে পছন্দ করে।

আমি নিজেও তো করি। আমার মা রমিলা যা বলেন বিশ্বাস করি। (সৎ মা না বলে মা বললাম। উনাকে আমার মা ভাবতেই ভালো লাগে) মাসুদের মৃত্যুর পর উনি খুবই চুপচাপ হয়ে গেছেন। সারাদিন বিছানার এক কোনায় গুটিসুটি

মেরে বসে থাকেন। তবে সন্ধ্যার পর তার মধ্যে এক ধরনের ছটফটানি দেখা যায়। তিনি ঘরে বাতি দেবার জন্যে হৈচৈ শুরু করেন। চাপা গলায় তিনি বলতে থাকেন— বাতি দেও। সব ঘরে বাতি দেও। কোনো ঘর যেন বাকি না থাকে।

আমি তাঁকে একটা টর্চ লাইট কিনে দিয়েছি। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ লাইট। টর্চ লাইটটা তিনি খুব পছন্দ করেছেন। চাপা গলায় বলেছেন, ভালো করেছ মা। অন্ধকারে ভয় লাগে।

কিসের ভয় ?

আছে, বিষয় আছে। তোমার সব বিষয় জানার প্রয়োজন নাই। সব কিছু সবের জন্যে না।

আমার এই অপ্রকৃতস্ত মা পরীবানু বিষয়ে একটা ভবিষ্যতবাণী করেছেন। আমি মনেপ্রাণে তাঁর কথা বিশ্বাস করছি। তিনি বলেছেন— এই মেয়েটার যমজ সন্তান হবে। একটা ছেলে একটা মেয়ে। দুই সন্তানসহ সে আবার এক স্বামীর সংসার করবে। সেই স্বামীর মতো ভালো মানুষ ত্রিভুবনে নাই। মেয়েটার জীবন অতি সুখে কাটবে।

আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি। মানুষের বিশ্বাস যুক্তি মানে না। আমার বিশ্বাসের পিছনেও কোনো যুক্তি নেই। যুক্তি দিয়ে হবেই বা কী ? আমাদের চারপাশের যে জগৎ সেই জগৎ কতটা যুক্তিনির্ভর। এখন আমার ভাবতে ভালো লাগে, কেউ একজন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। কঠিন নিয়ন্ত্রণ। যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর কাছেই সবকিছু সমর্পণ করা ভালো না ? কী হবে চিন্তা-ভাবনা করে ?

জোছনা রাতে আমি প্রায়ই একা একা মাসুদের কবরের কাছে যাই। চুপচাপ বসে থাকি। আমার ভালো লাগে। আমাকে ঢাকায় ফিরে যেতে হবে। পড়াশোনা শেষ করতে হবে— এইসব নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাই না।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার বিএ পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। রেজাল্টের খবরে বাবা আরো একবার বাঁশগাছের মাথায় হারিকেন টানিয়েছেন। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ হারিকেন দেখেছে। তারা জানতে এসেছে ঘটনা কী। তাদের প্রত্যেককেই বাবা বলেছেন— আমার মেয়ে পেতলের ঘড়া ভর্তি সোনার মোহর পেয়েছে। বড় ভাগ্যবতী আমার এই মেয়ে।

শ্রাবণ মাস।

ভোমরা নদী ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। শহরবাড়ির সামনের বিস্তৃত মাঠ জলমগ্ন। পানি যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হয় শহরবাড়ির উঠানে পানি চলে আসবে। পাঁচ-ছয় বছর পর পর এরকম হয়, শহরবাড়ির উঠানে পানি চলে আসে। পানিতে জোয়ার-ভাটার টান পর্যন্ত হয়।

মঞ্জু অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর প্রধান কাজ গামবুট পরে পানিতে হাঁটাহাঁটি। সে নিজে নেত্রকোনা শহর থেকে গামবুট কিনে এনেছে। রাতে সে শহরবাড়িতে ঘুমায় না। পানশি নৌকায় ঘুমায়। পানশি নৌকা উত্তরের ঘাটে বাঁধা থাকে। নৌকার ছইয়ের ভেতর ডাবল তোষকের বিছানা। তোষকের উপর সুনামগঞ্জের শীতলপাটি। কোলবালিশ। এলাহি ব্যবস্থা। মঞ্জুর রান্নাবান্না নৌকার ভেতরই হয়। রান্না করে নিরঞ্জন। বদুও উঠে এসেছে নৌকায়। তার কাজ নৌকার গলুইয়ে ছিপ ফেলে বসে থাকা। এই কাজটা সে গভীর আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে করে। তাকে দেখে মনে হয়, এতদিনে সে মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু নামের মানুষটার সঙ্গে গল্প করতে তার বড় ভালো লাগে। সব গল্পই সে সাধারণভাবে শুরু করে, শেষ করে ভূত-প্রেতে। মঞ্জুকে কিছুদিন হলো সে মামা ডাকা শুরু করেছে।

মামা, পানি কেমন বাড়তাছে দেখছেন ?

হুঁ।

শহরবাড়ির ভিতরে যদি পানি না ঢুকে, আমি আমার দুই কান কাইট্টা কুত্তারে খাওয়াইয়া দিব। এইটা আমার ওয়াদা। আপনেরে সাক্ষি মাইন্যা কথাটা বললাম। ইয়াদ রাইখেন।

ইয়াদ রাখব।

আপনের ঘটনাটা কী বলেন দেখি, নিজ দেশ গ্রামে আর ফিরবেন না ?

ফিরব না কেন ? অবশ্যই ফিরব। এদের একের পর এক ঝামেলা যাচ্ছে, এখন যাই কীভাবে ? পরীবানুর সন্তান হোক তারপরে বিদায়।

বিডিবাংলা ডট কম

আপনারে একটা কথা বলি মামা ?

বলো।

আপনে যদি চইল্যা যান আপনার সাথে আমিও যাব।

তুমি চলে গেলে এখানে চলবে কীভাবে ?

না চললে নাই। আমি এই বাড়ির কিনা গোলাম না। আমার যেখানে ইচ্ছা আমি যাব। আমারে কিন্তু সাথে নিতে হবে।

আচ্ছা দেখা যাবে।

দেখা যাওয়া যাওয়ির কিছু নাই মামা। আমি যাবই।

মঞ্জু দেশের বাড়ি চলে গেলে তাঁর সঙ্গে বদু ছাড়াও আরো একজন যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার নাম জইতরী। তবে সে মঞ্জুকে বড়পীর সাহেবের নামে কসম কাটিয়েছে কথাটা কাউকে বলা যাবে না। কথাটা গোপন রাখতে হবে।

আজ মঞ্জুর ব্যস্ততার সীমা নেই। সে মূল বাড়ির সামনে দুপুর থেকেই হাঁটাহাঁটি করছে। পরীবানুর প্রসব বেদনা উঠেছে আজ ভোরবেলায়। যে-কোনো সময় সন্তান হতে পারে। উল্লাপাড়া থেকে বিখ্যাত ধাই রুসমের মা'কে আনা হয়েছে। সে ঘোষণা করেছে, কন্যার পেটে সন্তান দুইটা। অঘটন ঘটতে পারে। জোড়া মোরগ যেন ছদগা দেওয়া হয়। ছদগার মোরগ হতে হবে ধবধবে সাদা। সাদা মোরগের সন্ধানে লোক গেছে।

লীলা সতীশ ডাক্তাকে খবর দিয়ে আনিয়েছে। পুরুষ ডাক্তারের এখানে কিছুই করার নেই। আঁতুড়ঘরে কোনো পুরুষ মানুষই ঢুকতে পারে না। তারপরেও লীলা তাকে কেন আনিয়ে রেখেছে সে-ই জানে। সতীশ ডাক্তার বাংলাঘরে বসে পান-তামাক খাচ্ছেন।

সিদ্দিকুর রহমান আশেপাশে নেই। তিনি লোকমান-সুলেমানকে নিয়ে জঙ্গলে গেছেন। সেখানে পানি উঠেছে। বেশির ভাগ জায়গাই ডুবে গেছে। পানির উপর মাথা ভাসিয়েছে কচুগাছ। কচুগাছে ফুল ফুটেছে। সেই ফুলের গন্ধ নেশা ধরা। ফুলগুলি দেখতেও সুন্দর, ধবধবে সাদা। তিনি হাত ইশারায় লোকমানকে ডাকলেন। লোকমান-সুলেমান দুই ভাই-ই ছুটে এলো।

লোকমান!

জি চাচাজি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ ? জংলি ফুলের গন্ধ আর বাগানের ফুলের গন্ধ আলাদা। সব জংলি ফুলের গন্ধে নেশা নেশা ভাব হয়।

লোকমান কিছু বলল না। সিদ্দিকুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বললেন, আমি আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছি, জংলি ফুলের রঙ হয় সাদা।

এই বিষয়ে লোকমানের কিছু বলার ছিল। সে লাল-হলুদ অনেক রঙের ফুলই জঙ্গলে ফুটতে দেখেছে। এই জঙ্গলেই কয়েকটা জবা গাছ আছে। হাতের থাবার মতো বড় টকটকে লাল রঙের ফুল ফোটে। এই বিষয় নিয়ে চাচাজির সঙ্গে বাহাস করা তার পক্ষে সম্ভব না।

লোকমান!

জি চাচাজি।

জঙ্গলে পানি ঢুকেছে। হাঁটাচলা করা মুশকিল। আমার বসার ব্যবস্থা করো। একটা চৌকি এনে কোথাও পাতো। চৌকিতে বসে থাকব।

জি আচ্ছা।

জি আচ্ছা না। এখনই নিয়ে আসো। দুই ভাই চলে যাও।

আপনি একা থাকবেন ?

একা থাকব কী জন্যে ? আমার চারদিকে গাছপালা। এরাও আমার সঙ্গে আছে। তোমরা দাঁড়ায়ে থেকো না, চলে যাও।

লোকমান কিছু বলছে না, মাথা চুলকাচ্ছে। সুলেমান সাহস করে বলল, চাচাজি, আপনের ঘরে যাওয়া দরকার।

কেন ?

মাসুদ ভাইজানের স্ত্রীর সন্তান হবে। ধাই বলেছে অবস্থা ভালো না।

আমি সেখানে গিয়ে কি কিছু করতে পারব ? পারব না। মেয়েদের সন্তান প্রসবের বিষয়ে পুরুষদের কিছু করার নাই। তাছাড়া আমার বড় মেয়ে আছে। যা ব্যবস্থা নেবার সে নিবে। নিবে না সুলেমান ?

জি নিবেন।

তোমরা চলে যাও। বড় দেখে চৌকি আনবা। চৌকির পায়ার নিচে ইট দিয়া চৌকি উঁচু করবা।

লোকমান-সুলেমান চলে গেছে। আকাশে মেঘ করেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সিদ্দিকুর রহমান চাপা গলায় বললেন, এই তোমরা আছ কেমন ?

প্রশ্নটা গাছপালার উদ্দেশে। প্রশ্নটা করেই তার মনে হলো, চারপাশের বৃক্ষরাজি তাঁর প্রশ্ন বুঝতে পারছে। তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। উত্তর দেবার কৌশল জানা নেই বলে উত্তর দিতে পারছে না।

সিদ্দিকুর রহমান চোখ বন্ধ করে আবারো বললেন— তোমরা কেমন আছ ?

মাগরেবের আজানের পর পর দাই রুসমের মা লীলাবতীর হাত ধরে বলল, মা গো, সন্তান প্রসব হবে না। একটা সন্তান উল্টা হইয়া নিচে নামছে আরেকটা নামতে পারতেছে না। আমার করনের কিছু নাই। আমারে বিদায় দেও।

লীলা হতভম্ব হয়ে বলল, কিছুই করার নাই ?

রুসমের মা বলল, কিছুই করার নাই। বিষয়টা এখন ডাক্তার কবিরাজের হাতে নাই— আল্লাহপাকের হাতে। সদর হাসপাতালে নিয়া দেখতে পারো। শুনেছি সেইখানে পেট কাইট্টা বাচ্চা বাইর করে।

লীলা বলল, সদর হাসপাতাল তো অনেক দূরে, নেত্রকোনা। এত দূর নেয়ার সময় কি আছে ?

নেত্রকোনা যাইতে সারা রাইত নাও বাইতে হবে। অত সময় নাই।

সিদ্দিকুর রহমানের জন্যে জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায় খাট পাতা হয়েছে। তিনি মাগরেবের নামাজ শেষ করে খাটে পাতা জায়নামাজে বসেছেন, তখন খবরটা শুনলেন। সিদ্দিকুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, আমার মেয়ে কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে ?

লোকমান বলল, উনি নৌকা নিয়া এক্ষণ রওনা দিবেন বলে বলেছেন।

তোমরা দুই ভাই সঙ্গে যাও। ঝড়ের অগ্রে যেন নাও যায়।

আপনে বাড়িতে চলেন।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি এইখানেই থাকব। আমার কথা মাথা থাইক্যা দূর করো— তোমাদের যা করতে বলছি করো।

প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। নৌকা পড়েছে হাওরে। বিখ্যাত শনির হাওর। সামান্য বাতাস দিলেই বিশাল ঢেউ উঠছে। নৌকা টালমাটাল করছে। মঞ্জু নৌকার গলুইয়ে বসে ভিজছে। ছইয়ের ভেতর থেকে একেকবার কাতরানির শব্দ আসছে আর মঞ্জুর শরীর কেঁপে উঠছে। পরীবানু নামের মেয়েটির সঙ্গে তার কোনোদিন কোনো কথাও হয় নাই— অথচ মেয়েটার কষ্টে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ পরপর আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, হে আল্লাহপাক, একজনের জীবনের বিনিময়ে অন্য একজনের জীবন তুমি দিতে পারো। সম্রাট বাবর তার

পুত্র হুমায়ূনের জন্যে নিজের জীবন দিয়েছিলেন। আমি পরীবানু মেয়েটার কেউ না। আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও দুঃখী মেয়েটার জীবন তুমি রক্ষা করো আল্লাহপাক।

নৌকা নিয়ে সামনে এগুনো যাচ্ছে না। প্রবল বাতাস সামনের দিক থেকে আসছে। বৃষ্টি কমে এসেছে, কিন্তু বাতাসের প্রবল বেগ।

ছইয়ের দুই মুখ শাড়ির পর্দা দিয়ে ঢাকা। বৃষ্টিতে শাড়ি ভিজে ভারী হয়ে আছে। তারপরেও বাতাসে দুলছে। ছই থেকে একটা হারিকেন ঝুলানো হয়েছে। বাতাসে হারিকেন দুলছে। পরীবানুর গা চাদর দিয়ে ঢাকা। তার ফর্সা রক্তশূন্য মুখ চাদরের ভেতর থেকে বের হয়ে আছে। লীলাবতী বসেছে পরীর মাথার কাছে। সে পরীর হাত ধরে আছে। সেই হাত থরথর করে কাঁপছে। পরীবানু বলল, বুবু, আমার মৃত্যু ঘনাইছে ঠিক না ?

লীলা কিছু বলল না। সে একমনে দোয়া ইউনুস পড়ছে— 'লাইলাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজুয়ালেমিন।' সে দোয়া ঠিকমতো পড়তেও পারছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে, কোথাও কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে।

বুবু। ও বুবু।

লীলা পরীবানুর দিকে তাকাল। পরীবানু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার দুইটা সন্তানই কি মারা যাবে ? কেউ বাঁচবে না ?

শেষরাতে রমিলা খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর হাতের টর্চ দিয়ে জানালার শিকে বাড়ি দিচ্ছেন। গোঙানির মতো শব্দ করছেন। সিদ্দিকুর রহমান রমিলার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রমিলা বললেন, আমারে গরম পানি দিতে বলেন, নতুন সাবান দিতে বলেন, নয়া শাড়ি দিতে বলেন। আমি সিনান করব। আল্লাহপাকের দরবারে শুকরানা নামাজ পাঠাব। আপনার পুত্র মাসুদের দুইটা সন্তান হয়েছে। দুইটাই পুত্র সন্তান। তারা ভালো আছে। সন্তানদের মাতাও ভালো আছেন। বলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, রমিলা, এই সংবাদ কোথায় পেয়েছে ? কীভাবে পেয়েছে ?

মঞ্জু বিরাট দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে। দু'টা পুত্র সন্তান হয়েছে। এখন আযান কি একবার দেয়া হবে, না দুইবার ? কেউ তাকে কিছু বলতেও পারছে না। তারা

এখনো নৌকায়। হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি আছে। পরীবানুর সন্তান নৌকাতেই হয়েছে এবং ভালোমতোই হয়েছে। তার জ্ঞান আছে। সে জড়ানো গলায় কিছু কথাও বলছে। দুটি বাচ্চাকেই মায়ের বুকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। বাচ্চা দুটির গলায় বিপুল শক্তি। তারা ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে।

মঞ্জুর পাশে সতীশ ডাক্তার বসে আছেন। শেষ মুহূর্তে সন্তান প্রসবের কাজ তিনিই করিয়েছেন। মঞ্জু বলল, ডাক্তার সাহেব, আযান একবার দিব না দুইবার? কিছু একটা বলেন।

সতীশ ডাক্তার বললেন, আপনাদের ধর্মের বিষয়ে তো আমি কিছু জানি না।

আপনার বিবেচনায় কী বলে?

আমার বিবেচনা বলে দুইবার। সন্তান যখন দুইটা।

মঞ্জু বলল, আমি এই দুই ছেলের নাম রাখলাম। প্রথমজনের নাম ঝড়। দ্বিতীয় জনের নাম তুফান। দুই ভাই একত্রে ঝড়-তুফান। হা হা হা।

বদু নৌকার হাল ধরেছিল, সে আনন্দিত গলায় বলল, নাম অতি চমৎকার হয়েছে।

মঞ্জু আযান দিচ্ছে।

পরীবানু লীলার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, বুবু, আমার নাম দুইটা খুব পছন্দ হইছে— ঝড়-তুফান। বুবু, দুইজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর? ঝড় না তুফান?

লীলা জবাব দিতে পারছে না। সে কেঁদেই যাচ্ছে। তার কান্না থামবে এরকম মনে হচ্ছে না।

WWW.BDBANGLA.COM

কী নাম?

আনিসুর রহমান।

আর কোনো নাম আছে?

জি না।

মালেক বলে কাউকে চেনো?

জি না।

মালেক নাম তো খুবই কমন, এই নামে কাউকে চেনো না?

জি না।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহম্মাদ মালেক। উনাকে চেন না?

জি না।

শরিয়তুল্লাহ বলে কাউকে চেন? ঠিকানা তন্তুরীবাজার।

জি না।

সে তো তোমাকে তিনটা ডিকশনারি পাঠিয়েছিল, তাকে চেনো না?

জি না।

সফিকুর রহমান বলে কাউকে চেনো?

আমার বাবার নাম সফিকুর রহমান।

তাও ভালো, নিজের বাবাকে চিনতে পারছ। আমি ভেবেছিলাম, তুমি কাউকেই চিনবে না। নিজের বাবাকেও না।

প্রশ্নকর্তা হেসে ফেললেন। প্রশ্নকর্তার সঙ্গে যে তিনজন আছেন তারাও হাসলেন। যে ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে সেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। ছোট্ট ঘুপচি মতো ঘর। হলুদ রঙের দালান। ছাদ অনেক উঁচু। উঁচু ছাদ থেকে ঝুলন্ত লম্বা তারের মাথায় ইলেকট্রিক বাল্ব। ঘরে কোনো হাওয়া আসছে না কিন্তু বাল্বটা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। আনিসের দৃষ্টি বাল্বে আটকে যাচ্ছে। বাল্বের আলো উজ্জ্বল। মনে হয় একশ' পাওয়ারের বাল্ব। উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ায় সে তার সামনে বসা তিনজনকে ঠিকমতো দেখতে পারছে না। যিনি তাঁকে প্রশ্ন করছেন

তিনি পুলিশের কোনো সিনিয়র অফিসার হবেন। কারণ তাঁর পাশের দুজন অত্যন্ত সমীহ করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন। মূল প্রশ্নকর্তার গায়ে সার্ট-প্যান্ট। সার্টের রঙ হালকা নীল। বাকি দুজনের গায়ে পুলিশের পোশাক। প্রশ্নকর্তার সামনের টেবিলে ফুলতোলা একা রুমাল। রুমালে একটা পিস্তল।

তোমার নাম আনিসুর রহমান ?

জি।

তোমার বাবা নাম সফিকুর রহমান ?

জি।

এমএ পাশ করেছ ?

জি।

তোমার বিষয়বস্তু হলো ইতিহাস।

জি।

টেবিলে রাখা পিস্তলটা তুমি চেনো ? চেনো না ? তোমাকে চিনতেই হবে, কারণ তোমাকে ধরা হয়েছে পিস্তলসহ। এখন বলো, পিস্তলটা চেনো না ?

জি চিনি।

এই পিস্তল কখনো ব্যবহার করেছ ?

জি না।

ব্যবহার করো নাই কী জন্যে ?

আমাকে পিস্তলটা লুকিয়ে রাখার জন্যে দেয়া হয়েছে। ব্যবহার করার জন্য দেয়া হয় নি।

কে তোমাকে দিয়েছে ?

আমি তাঁর নাম বলব না।

নাম তো অবশ্যই বলবে। আমরা এখনো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি নাই। যখন জিজ্ঞাসাবাদ সত্যি সত্যি শুরু করব, তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাস করার আগেই উত্তর দিয়ে দিবে। তোমাকে তোমার নাম জিজ্ঞাস করব, তুমি নিজের নাম তো বলবেই, তোমার বাবার নাম বলবে, তোমার শ্বশুরের নামও বলবে। শ্বশুরের নাম কী ?

স্যার, আমি এখনো বিয়ে করি নি।

বিয়ে করো নি কেন ? পার্টির নিষেধ আছে ? তুমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার না ?

জি মেম্বার।

তোমাকে মেম্বার কে বানিয়েছেন ? মোহম্মদ মালেক ?

জি।

ভাষা আন্দোলনে জড়িত আছ ?

জি না।

জড়িত না কী জন্যে— বাংলা ভাষা পছন্দ করো না ? না-কি আরো বড় ধরনের আন্দোলনের জন্যে অপেক্ষা ?

স্যার, একটু পানি খাব।

অবশ্যই পানি খাবে। পানি কেন খাবে না! তোমাকে যদি এখন পানি না দেই, তাহলে রোজহাশরে আমি নিজে পানি পাব না। পানি দিচ্ছি পানি খাও। তারপর গরম এক কাপ চা দিচ্ছি চা খাও। ধূমপানের অভ্যাস আছে ?

জি আছে।

গুড। সিগারেট দিচ্ছি। সিগারেট খাও। মন শান্ত করো এবং সুবোধ বালকের মতো প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি যে কী ভয়াবহ অবস্থায় আছ তুমি জানো না। তুমি ধরা পড়েছ অস্ত্রসহ। অস্ত্র মামলায় তোমার যাবজ্জীবন সাজা হয়ে যাবে। আর আমরা যদি আরেকটু কায়দা-কানুন করি, তাহলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারব। ঠিক আছে। এখন কিছু সময়ের জন্যে আমরা ব্রেক নেব। ভালো কথা, সারাদিনে তুমি কিছু খেয়েছ ?

জি না।

তাহলে তো শুধু চা খাওয়া ঠিক হবে না। চায়ের সঙ্গে সামান্য কিছু হলেও খাওয়া। মাখন দেওয়া দুই পিস পাউরুটি দিতে বলি ? বলব ?

জি বলুন।

আমার নাম এবং তোমার বাবার নাম কিন্তু এক। আমার নামও সফিকুর রহমান। আইবি'র পুলিশ ইন্সপেক্টর সফিকুর রহমান। তোমার বাবা নিশ্চয়ই খুব ভালো মানুষ ছিলেন। ছিলেন না ?

জি।

আমি কিন্তু ভালো মানুষ না। আমি খুব খারাপ মানুষ। কতটা খারাপ কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাবে।

স্যার, একটু পানি খাব।

অবশ্যই পানি খাবে। তোমাকে তো বলেছি পানি দেয়া হবে। পানি, চা, সিগারেট, মাখন লাগানো দুই স্লাইস পাউরুটি। আচ্ছা আনিস, গত দুই বছর তুমি কোথায় ছিলে ?

ময়মনসিংহে, নয়াপাড়া। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের বাড়িতে।

বিডিবাংলা ডট কম

এই রিভলবার কি তখনো তোমার সঙ্গে ছিল ?

জি।

আর কেউ সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে গিয়েছিল ?

জি না।

মনে করে দেখ, কেউ না ?

জি না। স্যার পানি খাব।

ও হ্যাঁ পানি খাবে। পানি, চা-নাশতা দিতে বলছি। সিগারেট দিচ্ছি। সিগারেট টানতে থাকো এবং যে সব প্রশ্ন করব তার জবাবগুলি ঠিক করে রাখো। কাগজ দেয়া হবে। কাগজে গুছিয়ে লিখবে। তিনটা মাত্র প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি মন দিয়ে শোনো— প্রশ্ন এক. এ জাতীয় অস্ত্র তোমাদের কাছে কয়টি আছে ? কার কার কাছে আছে ? প্রশ্ন দুই. হিন্দুস্তানের সঙ্গে তোমাদের কি যোগাযোগ আছে ? প্রশ্ন তিন. তোমাদের মূল আন্দোলনটি বৃহৎ বাংলা আন্দোলন, সর্বহারা আন্দোলন না-কি ভালো পাকিস্তান আন্দোলন। সহজ প্রশ্ন— সহজ উত্তর। ঠিক না আনিস ?

জি স্যার।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক না পেলে আমি কী করব সেটাও একটু বলে রাখি, এতে সুবিধা হবে। আমি তোমার তিনটা আঙুলের নখের নিচে আলপিন ঢুকিয়ে দেব। কোন তিনটা আঙুল সেটা তুমিই ঠিক করবে। খুবই কষ্টকর প্রক্রিয়া, কিন্তু কী আর করা!

স্যার পানি খাব।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সফিকুর রহমান পানি দিতে বললেন। চা-সিগারেট দিতে বললেন। তাঁর মুখে হাসি।

আনিস কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। তার নিচে দুটা কালো কম্বল। আরেকটা কম্বল তার গায়ে। যে সেলে তাকে রাখা হয়েছে সেটি ফাঁসির আসামিদের জন্যে আলাদা করা কনডেম সেল। সেলের ছাদের সঙ্গে আলো-বাতাস আসা-যাওয়ার জন্যে চারকোনা একটি ভেন্টিলেটার আছে। এই মুহূর্তে ভেন্টিলেটার দিয়ে রোদ এসেছে। সেই রোদ পড়েছে দেয়ালে। আনিস রোদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেলের ভেতরে ভ্যাপসা গরম। আনিসের লাগছে ঠাণ্ডা। তার কাছে মনে হচ্ছে, মেঝের নিচ থেকে ঠাণ্ডা উঠে এসে তার গায়ে লাগছে। দুটা কম্বলে ঠাণ্ডা মানছে না। দিনেরবেলাতেও তার মুখের কাছে এবং কানের কাছে মশা ভনভন করছে। হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর উপায় নেই। দুটা হাতই ফুলে উঠেছে। নখের নিচে পিন ঢুকানোর ফল ফলেছে, হাত বিষিয়ে উঠেছে।

বেশির ভাগ সময় আনিস ঘোরের মধ্যে কাটাচ্ছে। ঘোরটা যখন আসে তখন তার ভালো লাগে। আঙুলের যন্ত্রণা টের পাওয়া যায় না। ঘোরের সময় সে কাউকে না কাউকে সেলের ভেতর বসে থাকতে দেখে। বেশির ভাগ সময় দেখে মালেক ভাইকে। মালেক ভাই নিচু গলায় কথা বলেন। তাঁর কথাগুলি বেশির ভাগ সময়ই গানের মতো মনে হয়। মনে হয় গানের সুরে কথা বলে এই মানুষটা তাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছে।

কেমন আছ আনিস ?

ভালো আছি। মনে হয় জ্বর আসছে কিন্তু আমি ভালো আছি।

তোমার কথা শুনে ভালো লাগল। আনিস শোনো, যেখানে থাকবে, যে অবস্থায় থাকবে ভালো থাকার চেষ্টা করবে। ভালো থাকার চেষ্টা করাটা খুব জরুরি।

জি।

আনিস শোনো, দেশের ভালোর জন্যে দেশের সব মানুষ কাজ করে না। অল্প কিছু মানুষ কাজ করে। তুমি অল্প কিছু মানুষের একজন। এটা ভেবে তোমার ভালো লাগছে না ?

জি লাগছে।

যে কষ্ট তুমি ভোগ করছ সেই কষ্ট তোমার পরের প্রজন্ম ভোগ করবে না। তারা বাস করবে স্বাধীন বাংলাদেশে।

মালেক ভাই, এইসব কথা অনেকবার বলেছেন। নতুন কিছু বলুন।

নতুন কথা শুনতে চাও ? এইগুলাও নতুন কথা।

আনিস মাঝে মাঝে সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে। তিনি সবসময়ই অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন।

মাস্টার।

জি।

ফুলের পাপড়ি সবসময় বেজোড় সংখ্যায় হয়। একটা ফুলের পাপড়ি হয় জোড় সংখ্যায়। ফুলের নামটা বলো।

বলতে পারছি না।

চিন্তা করো। চিন্তা করে বলো।

চিন্তা করতে ভালো লাগছে না।

কেন ভালো লাগছে না ?

গাছপালা বনজঙ্গল আমার ভালো লাগে না। তাদের নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। চিন্তা করতে হবে মানুষ নিয়ে।

গাছপালা, বনজঙ্গল এরা কি মানুষের অংশ না ?

এইসব আপনি কী বলেন, এরা মানুষের অংশ হবে কী জন্যে ?

আমার তো মনে হয় মানুষই বরং গাছপালার অংশ। মানুষকে গাছের ফুল হিসেবে কল্পনা করো। ফুলের থাকে পাপড়ি, মানুষের আঙুল হলো পাপড়ি। ফুলের থাকে গন্ধ— মানুষের গুণ হচ্ছে গন্ধ। ফুল থেকে ফল হয়...

আপনি কি চুপ করবেন ?

আচ্ছা যাও চুপ করলাম।

হঠাৎ হঠাৎ আনিস লীলাবতীকে দেখতে পায়। সে খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন তো।

কোথায় যাব ?

আমাদের বাড়িতে যাবেন। আমি আপনাকে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে রাখব, কেউ আপনাকে পাবে না।

এরা আমাকে ছাড়বে না।

তাহলে একটা কাজ করুন, এরা আপনার কাছে যা যা জানতে চায় সব বলে দিন। হড়হড় করে বলে দিন।

সম্ভব না।

অবশ্যই সম্ভব। পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবকে ডাকুন, ডেকে সব বলে দিন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবকে বেশির ভাগ সময়ই আনিস তার আশেপাশে দেখতে পায়। তিনি হাতে একটা আলপিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং একটা প্রশ্নই বারবার করতে থাকেন। আনিসও ক্লান্তিহীনভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

তোমার নাম কী ?

আনিস।

বনের ভেতর চৌকি পাতা। চৌকির উপর শীতলপাটি। সিদ্দিকুর রহমান শীতলপাটিতে শুয়ে আছেন। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাঁর গায়ে। রোদটা ভালো লাগছে। চৌকির উপর কিছু ধান ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। সিদ্দিকুর রহমানের ধারণা, পাখিরা ধান খেতে চৌকিতে এসে বসবে। তাঁর ধারণা ঠিক হয় নি। কোনো পাখি আসছে না। তারা মানুষের প্রতি তাদের ভয় দূর করতে পারে নি।

বন্য কোনো ফুল কাছেই কোথাও ফুটেছে। তিনি ফুলের কড়া ঘ্রাণ পাচ্ছেন। কাঁঠালচাপার তীব্র ঘ্রাণ। বনের ভেতরে কাঁঠালচাপার কোনো গাছ তাঁর চোখে পড়ে নি। গন্ধটা আসছে কোথা থেকে ? তিনি শোয়া থেকে উঠে বসলেন। সুলেমান-লোকমান কেউ তার পাশে নেই। ইদানীং তিনি তাদের বনের ভেতর ঢুকতে দেন না। তারা এসে পাটি বিছিয়ে চলে যায়। বনের বাইরে অপেক্ষা করে। আজ কেউ আশেপাশে থাকলে ভালো হতো। কাঁঠালচাপা গাছে ফুল ফুটেছে কি-না দেখতে বলতেন।

সিদ্দিকুর রহমানের পেছনে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে খুবই অবাক হলেন। নীল রঙের একটা পাখি খুঁটেখুঁটে ধান খাচ্ছে। পাখির মাথায় ঝুটি আছে। ঠোঁট টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো লাল। সিদ্দিকুর রহমান যে পাখিটার দিকে তাকিয়ে আছেন তা সে বুঝতে পারছে। কিন্তু ভয় পাচ্ছে না। খুট খুট শব্দে ধান খেয়ে যাচ্ছে। সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কিরে তুই একা কেন ? তোর সঙ্গীসাথিরা কই ? হঠাৎ কথা শুনে পাখি সামান্য চমকে গেল। ডানা ঝাপ্টাল। আবার শান্ত হয়ে গেল। সিদ্দিকুর রহমান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। নীল পাখির একটি সঙ্গীকে তাঁর মাথার উপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে যেতে দেখা গেল। সে মনে হয় সাহস সঞ্চয় করছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করছে।

তিনি আবারো শুয়ে পড়লেন। পাখিরা আসুক। কেউ কেউ এসে বসুক তার গায়ে।

ধর্মপাশা থানার ওসি সাহেব ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। জরুরি। লোকমান-সুলেমানের উপর দায়িত্ব

কেউ যেন বনে ঢুকতে না পারে। ওসি সাহেবকে তারা সাহস করে এই কথা বলতে পারল না।

ওসি সাহেব বললেন, উনি বনের ভেতর কী করেন ?

সুলেমান বলল, উনার শরীর খারাপ। উনি শুয়ে থাকেন।

শরীর খারাপ হলে বনের ভেতর শুয়ে থাকতে হবে কেন ?

সুলেমান জবাব দিল না। এই প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই। ওসি সাহেব বললেন, জঙ্গলে কোথায় শুয়ে থাকেন ?

ব্যবস্থা আছে।

কী ব্যবস্থা ?

চলেন নিজের চোখে দেখবেন।

ওসি সাহেব যে দৃশ্য দেখলেন তার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সিদ্দিকুর রহমান শুয়ে আছেন, তাকে ঘিরে রাজ্যের পাখি। কিছু পাখি আবার তার গায়ের উপর বসে আছে। পায়ের শব্দে সব পাখি উড়ে গেল। সিদ্দিকুর রহমান উঠে বসলেন। ওসি সাহেব বললেন, স্যার সাল্লামালিকুম। আমাকে চিনেছেন ? ওসি ধর্মপাশা।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, কী ব্যাপার ?

স্যার একজন লোক সম্পর্কে খোঁজ নিতে এসেছি। আনিস নাম। আপনার বাড়িতে জায়গির থাকত।

এখন সে নাই।

স্যার জানি। সে জেলে আছে। ঘুঘু লোক। পিস্তলসহ ধরা পড়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি করত।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, আমি তাকে ভালো লোক হিসাবে জানি।

ভালো-মন্দের বিচার একেকজনের কাছে একেক রকম। আপনার কাছে যে ভালো, অন্যের কাছে সে খারাপ।

সিদ্দিকুর রহমান বললেন, যে ভালো সে সবসময় ভালো। সবের কাছে ভালো।

ওসি সাহেব বললেন, স্যার, এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। আপনার কাছে একটা অনুমতির জন্যে এসেছি। আনিস যে ঘরে থাকত সেই ঘরটা সার্চ করব। ঘরে কাগজপত্র কী আছে দেখব।

অনুমতি না দিলে সার্চ করবেন না ?

অনুমতি না দিলেও সার্চ করব। আমার সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।

তাহলে অনুমতি চাইলেন কেন ?

ভদ্রতা করলাম স্যার। আমরা তো ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ না। আমরা পাকিস্তান সরকারের পুলিশ। আমরা ভদ্র।

যান সার্চ করেন।

সার্চটা আপনার সামনে করতে চাই।

আমি এখান থেকে যাব না। বাড়িতে আমার বড় মেয়ে আছে। নাম লীলা। সব কিছু এখন সে দেখে। সে থাকবে আপনার সঙ্গে।

স্যার, আরেকটা বেয়াদবি করব। আমরা শুধু আনিস যে ঘরে থাকত সেই ঘর সার্চ করব না। আমরা পুরো বাড়ি সার্চ করব। সরকারের হুকুম। আমরা হুকুমের গোলাম।

সিদ্দিকুর রহমান কিছু বললেন না। আবার চৌকিতে শুয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি সার্চ হলো। মূলবাড়ি, শহরবাড়ি। নদীর পাড়ে নিরঞ্জন যেখানে থাকে সেই ছনের ঘর। কিছুই বাদ গেল না। চারটা বাঁধাই করা মোটা মোটা খাতা ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। খাতার প্রতিটি পাতায় একটা শব্দ লেখা 'লীলাবতী'!

ওসি সাহেব লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার নামই তো লীলাবতী। এই লোক লক্ষবার আপনার নাম লিখেছে, কারণ কী ?

লীলাবতী বলল, আপনি যেমন কারণ জানেন না আমিও জানি না।

তার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না ?

লক্ষবার নাম লেখার মতো পরিচয় ছিল না।

সে যে অতি বিপদজনক ব্যক্তি তা কি জানেন ?

আগে জানতাম না। এখন জানলাম।

আগে কী জানতেন ?

আগে জানতাম উনি লাজুক ধরনের একজন মানুষ। ওসি সাহেব শুনুন, আমি খুব খুশি হবো খাতা চারটা যদি আপনি রেখে যান।

খাতাগুলি 'সীজ' করা হয়েছে। রাখা যাবে না।

আপনাদের কাছে চারটা খাতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সাংকেতিক ভাষায় অনেক গোপন তথ্য লুকানো ?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। তিনি মঞ্জুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আপনি কে ?

আমার নাম মঞ্জু। মঞ্জুল করিম।

আপনি এই বাড়ির কে?

আমি এই বাড়ির কেউ না।

এই বাড়ির কেউ না, তাহলে এই বাড়িতে আছেন কেন?

আমি লীলাবতীকে তার মামার বাড়ি থেকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছি।

সেটা কবে?

প্রায় দেড় বছর।

দেড় বছর ধরে এ বাড়িতে আছেন? আপনি কী করেন? অর্থাৎ এই বাড়িতে আপনার কাজটা কী?

মঞ্জু হকচকিয়ে গেলেন। তাই তো, এ বাড়িতে তাঁর কাজটা কী?

ওসি সাহেব বললেন, আপনাকে যে আমার সঙ্গে একটু থানায় যেতে হবে।

কেন?

জিজ্ঞাসাবাদ করব।

জিজ্ঞাসাবাদ এখানে করেন।

সব জিজ্ঞাসাবাদ সব জায়গায় করা যায় না।

আমি থানায় যাব না। জিজ্ঞাসাবাদ যা করার এখানে করেন।

ওসি সাহেব বললেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

পুলিশের দল রাত আটটায় মঞ্জুকে হ্যান্ডকাফ এবং কোমরে দড়ি বেঁধে ধর্মপাশা থানার দিকে রওনা হলো। সারা গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ল এই দৃশ্য দেখার জন্যে।

পরীবানু কাঁদছে। তার দুই পুত্র ঝড়-তুফান চিৎকার করে কাঁদছে। জইতরী-কইতরী কাঁদছে। সিদ্দিকুর রহমান তাঁর বাড়ির উঠানে ইজিচেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তাঁর পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সুলেমান-লোকমান। এক সময় সিদ্দিকুর রহমান চাপা গলায় বললেন, আমার বাড়ির মেহমান পুলিশ আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে গেল। এত বড় অপমান আল্লাহপাক আমার জন্যে রেখেছেন?

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সুলেমান নিঃশব্দে উঠান ছেড়ে গেল। সুলেমানের ছোড়া অলঙ্গায় (বর্শা জাতীয় অস্ত্র) ধর্মপাশা থানার ওসি নিহত হলেন, সেকেন্ডে অফিসার গুরুতর আহত হলেন। রিজার্ভ পুলিশ তলব করা হলো ময়মনসিংহ থেকে। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবকে গ্রেফতার করে

ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হলো পরের দিন ভোরে। সেই দিন দুপুরেই শত শত মানুষ ধর্মপাশা থানা ঘেরাও করে থানা জ্বালিয়ে দিল। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় যে রিপোর্টটি ছাপা হলো তার শিরোনাম—

ধর্মপাশা থানা ভস্মিভূত ও লুণ্ঠিত
চার পুলিশ নিহত

তারিখ ৪ জুলাই ১৯৫৭ সন।

সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের দিন কাটছে জেল হাজতে। মামলা চলছে দীর্ঘদিন। হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় তিনি দিনের পর দিন কোর্ট যাচ্ছেন। কোর্ট থেকে ফেরত আসছেন। উকিলদের জেরার মুখে তিনি একটি কথাই বলছেন, সুলেমান নিজের ইচ্ছায় কিছু করে নাই, আমি তাকে বলেছি মঞ্জুকে ছাড়িয়ে আনতে। মঞ্জু আমার বাড়ির অতিথি। তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে তা হয় না। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের উকিল বাবু নিত্যরঞ্জন সাহা তাঁকে অনেক বুঝিয়েছেন। তাঁকে বলেছেন, আপনি অপরাধ নিজের ঘাড়ে টেনে নিচ্ছেন, এতে লাভ হবে না। সুলেমান বাঁচবে না, তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। মাঝখান থেকে আপনি বিপদে পড়বেন। আপনি যেটা সত্যি সেটা বলুন। বলুন আপনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। সুলেমান যা করেছে নিজের দায়িত্বে করেছে। সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, আমি একেকবার একেক কথা বলি না উকিল সাহেব।

লীলা ময়মনসিংহ জেলখানায় অনেকবার বাবাকে দেখতে এসেছে। শুরুতেই সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন, মাগো, মামলা নিয়ে কোনো কথা বলবে না। মামলা নিয়ে চিন্তা করবে উকিল-মোক্তার। কথা বলবে উকিল-মোক্তার। তুমি অন্য বিষয়ে কথা বলো। দুঃখ-কষ্টের কথা বলবা না। আনন্দের কথা যদি থাকে বলো।

একটি আনন্দ সংবাদ লীলা দিয়েছে। তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছেন। পরীবানুর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে মঞ্জুর। সিদ্দিকুর রহমান সংবাদ শুনে বলেছেন, আমি আমার দীর্ঘ জীবনে অল্প কিছু ভালো সংবাদ পেয়েছি, এটা তার একটা। যদি সম্ভব হয় বিবাহের পরে পরীবানু এবং মঞ্জু যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বিবাহের উপহার হিসাবে আমি তাদের দানপত্র করে কিছু বিষয়-সম্পত্তিও দিব। মাগো এখন আমাকে বলো, এই দুইজনের বিবাহের চিন্তাটা কি তোমার মাথায় এসেছে?

লীলা বলল, হ্যাঁ।

সাবাস বেটি। সাবাস। কেউ কোনো বড় কাজ করলে আমরা বলি সাবাস। কেন বলি জানো?

জি না।

তাহলে আমার কাছ থেকে শোনো। পারস্যের এক সম্রাট ছিলেন, নাম শাহ আব্বাস। উনি ছিলেন মহান সম্রাট। সারাজীবন তিনি বড় বড় কাজ করে গেছেন। তারপর থেকে কেউ যদি বড় কোনো কাজ করত বা ভালো কাজ করত সবাই বলত— আরে এই লোক দেখি শাহ আব্বাসের মতো! সেখান থেকে হলো সাবাস। কেউ ভালো বা বড় কিছু করলেই আমরা বলি সাবাস।

এই গল্প আপনাকে কে বলেছে?

আনিস মাস্টার বলেছে। তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। মাগো শোনো, আনিস মাস্টারের মামলা কোর্টে উঠতেছে বলে খবর পেয়েছি। এই মামলার যাবতীয় খরচ আমি দিব। তুমি ব্যবস্থা করো।

আমি যা করার করব।

তোমার মা, সে কেমন আছে? সত্য কথা বলবা। আমি বুঝদার মানুষ। আমাকে বুঝ দেওয়ার কিছু নাই।

উনার শরীর ভালো না। শরীর খুবই খারাপ। তবে মাথা এখন ঠিক আছে। চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার।

আলহামদুলিল্লাহ। শরীরের সুস্থতা কোনো বিষয় না মা। মনের সুস্থতাই সুস্থতা।

রমিলাকে মূল বাড়ি থেকে শহরবাড়িতে নেয়া হয়েছে। তার সেবার সব দায়-দায়িত্ব নিয়েছে পরীবানু। কাজটা সে করে কঠিন শৃঙ্খলায়। একটুও এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। প্রতিদিন দুপুরে কর্পূর মেশানো গরম পানি দিয়ে গোসল। এই গোসল রমিলাকে করতেই হবে। একবেলার জন্যেও বাদ যাবে না। গায়ে জ্বর থাকলেও বাদ যাবে না। বিকালে পাকা পেঁপে। পরীবানু মুখে তুলে পেঁপে খাওয়াবে। সেখানেও না করা যাবে না। খাওয়া-খাদ্যের হাত থেকে বাঁচার জন্যে রমিলা প্রায়ই নানান কৌশল করেন। কোনো কৌশলই কাজ করে না। একদিন তিনি বললেন, মাগো, তোমাকে একটা সিমাসা দেই। যদি সিমাসা ভাঙাতে পারো তাহলে খাব। ভাঙাতে না পারলে খাব না। সিমাসাটা হলো—

নাই পুষকুনির নাই জলে
নাই পদ্ম ফোটে
কও দেখি জিনিসটা কী
বুদ্ধি থাকলে ঘটে।

পরীবানু বলল, আমার ঘটে কোনো বুদ্ধি নাই। একটা বুদ্ধি আছে, আপনি না খাওয়ার মতলব করছেন। লাভ নাই, হাঁ করেন।

রাতে পরীবানু ঘুমায় রমিলার সঙ্গে। রমিলা নানান বিষয়ে কথা বলেন কিন্তু একবারও জানতে চান না সিদ্দিকুর রহমান মানুষটার কী হলো। তিনি কোথায় আছেন কীভাবে আছেন। লীলা একদিন বলল, মা, চলেন আপনাকে বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গিয়ে বললেন, নাগো মা, না।

লীলা বলল, না কেন?

মানুষটাকে আমি সারাজীবন দেখেছি মাঠে ময়দানে, খোলা জায়গায়। আইজ সে তালাবন্ধ, এইটা দেখতে মন চায় না।

মা, আপনার কি মানুষটার জন্যে খারাপ লাগে না?

রমিলা লীলাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, সেই রকম খারাপ লাগে না।

কেন সেই রকম খারাপ লাগে না?

মানুষটা হিসাবের মধ্যে পড়ছে, এই জন্যে খারাপ লাগে না।

বুঝিয়ে বলেন। হিসাবের মধ্যে পড়েছে মানে?

রমিলা শান্ত গলায় বলেছেন, আল্লাহপাক হিসাবে দুনিয়া চালান। তাঁর হিসাবে ত্রুটি নাই। মাসুদরে তোমার পিতা তালাবন্ধ করছিল, আল্লাহপাক সেই হিসাবে উনাকে তালাবন্ধ করেছেন। মাসুদ চলে গেছে, আল্লাহপাক সেই হিসাব করে আরেকজনরে উপস্থিত করেছেন, তার নাম মঞ্জু।

আপনার মতো চিন্তা করতে পারলে সুখে থাকতে পারতাম।

তুমি যে আমার মতো চিন্তা করবা না, সুখে থাকবা না— এইটাও আল্লাহপাকের হিসাব।

লীলা বলল, মা, আপনি তো ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, এই মামলার রায় কী হবে বলতে পারেন?

রমিলা বললেন, কোরান মজিদে আল্লাহপাক বলেছেন— 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব।'

এর অর্থ কী?

এর অর্থ, 'আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন, যারা এর উপযুক্ত।' আমার

হুজুরের এই আয়াতটা খুব পছন্দ ছিল। হুজুরের কথা তো তোমাকে বলেছি। বলি নাই ?

বলেছেন। এখন বলুন বাবা কি বিজয়ের উপযুক্ত ?

সেই বিবেচনা আল্লাহপাক করবেন। হিসাব তাঁর কাছে।

পরীবানুর সঙ্গে এখন তাঁর প্রবল সখ্য হয়েছে। প্রায়ই নিশিরাতে তিনি ধাক্কা দিয়ে পরীবানুর ঘুম ভাঙান। পরীবানু আতঙ্কিত গলায় বলেন, মা, শরীর ঠিক আছে ? কোনো অসুবিধা ?

রমিলা চাপা গলায় বলেন, কোনো অসুবিধা নাই। তুমি একটা গীত করো। শুনি।

পরীবানু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গীত ধরে—

পীরিতের ভাঙা নাও
নিয়া বান্ধই কোথায় যাও
কোন পবনে নাম লেখাও
দেখাও যৈবনের বাহার ॥

গান শুনতে শুনতে রমিলা হাত রাখেন পরীবানুর পিঠে। নিজে গানের তালে তালে মাথা দোলাতে শুরু করেন। একসময় ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট স্বরে তিনিও পরীবানুর সঙ্গে গাইতে থাকেন— 'দেখাও যৈবনের বাহার।'

পরীবানু গান শেষ করে বলে, মা, খুশি হয়েছেন ?

রমিলা বলেন, তোমার সকল কর্মকাণ্ডেই আমি খুশি। আমার যদি বিষয়-সম্পত্তি থাকত সব তোমারে দিয়া যাইতাম। আমার কিছুই নাই।

আপনার এমন এক জিনিস আছে যা অন্য কারোর নাই, সেইটা আমারে দিয়া যান।

কোন জিনিসগো মা ?

ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা। এইটা আমারে দিয়া যান।

হাতে থাকলে দিতাম। আমার হাতে নাই।

আশ্বিন মাসের এক মধ্যরাতে রমিলা লীলাকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত গলায় বললেন, মাগো শোনো, আমার দাদি শাশুড়ির মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন তোমার পিতা তাঁর জন্যে দিঘির পাড়ে একটা ঘর বানায়ে দিলেন। মউত ঘর। আমার দাদি শাশুড়ির মৃত্যু মউত ঘরে হয়েছিল। তিনি বড়ই কষ্ট করেছিলেন। তাঁর শরীর পচে গিয়েছিল, চউখ গলে গিয়েছিল। আমি তাঁর সেবা করতাম। শেষের দিকে তাঁর উপর আমি বড়ই নারাজ হয়েছিলাম। আল্লাহপাক তাঁর হিসাব

ঠিক রাখবেন। আমারও আমার দাদি শাশুড়ির মতো কষ্টের মৃত্যু হবে। আমার শরীর পচে গেলে যাবে। আমি চাই না তখন কেউ আমার সেবা করুক। তুমি আমার জন্যে মউত ঘর বানাতে বলো।

লীলা বলল, আমি আপনার জন্যে মউত ঘর বানাব না। আপনার যদি মৃত্যু হয় এই বাড়িতে হবে। আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি আপনার সেবা করব।

মাগো, অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু আমার জন্যে অপেক্ষা করতেছে। আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতেছি।

রমিলার শেষ ভবিষ্যৎবাণী ফলে নি। তিনি কার্তিক মাসের তিন তারিখ নিজ বিছানায় শুয়ে মারা গেছেন। সামান্যতম মৃত্যুযন্ত্রণাও তার হয় নি। তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি দেখে মনে হচ্ছিল, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর মনে হয়েছে রঙ্গে ঢং-এ জীবনটা তো ভালোই পার করলাম।

লীলা তার মায়ের মৃত্যুর বিষয়ে লিখল— মৃত্যুর সময় আমি তাঁর পাশে ছিলাম। সেদিনই তিনি নতুন সাবান দিয়ে গোসল করে নতুন শাড়ি পরলেন। লজ্জিত গলায় আমাকে বললেন, কাঁচা সুপারি, খয়ের আর চুন দিয়ে একটা পান খাব মা। ঠোঁট লাল করব। আমি পান এনে দিলাম। উনি বললেন, চুনটা ভালো না। শঙ্খ চুন আনায়ে দেও। শঙ্খ চুন আনতে বাজারে লোক গেল। আমি বললাম, আজ মনে হয় আপনি ভালো বোধ করছেন। আসুন বাগানে গিয়ে বসি। তিনি বললেন, না। তারপরই তাঁর মধ্যে সামান্য অসুস্থতা দেখা গেল। তিনি বললেন, আমার মাথাটা তোমার কোলে নাও। আমি তাঁর মাথা কোলে নিলাম। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, আল্লাহপাক আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

আমি বললাম, মা, আপনি তো কোনো অপরাধ করেন নাই। অপরাধের ক্ষমার প্রশ্ন আসছে কেন ?

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সব মানুষই অপরাধের মধ্যে বাস করে গো মা। পায়ের নিচে পড়ে পিঁপড়া মারা যায়, সেটাও তো অপরাধ। আমার বিরাট ভাগ্য আল্লাহপাক আমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি এত সহজ এবং এত সুন্দর মৃত্যু আগে কখনো দেখি নি। ভবিষ্যতে কোনো দিন দেখব তাও মনে হয় না।

WWW.BDBANGLA.COM

মঞ্জু তাঁর স্ত্রী এবং ঝড়-তুফানকে নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে গেছেন। লীলাবতীকে বলেছেন, মা, আমি তো ঘরজামাই না। ঘরজামাই হলে ভিন্ন কথা ছিল। আমি এখন একা না, আমার স্ত্রী আছে, দুই পুত্র আছে।

লীলাবতী বলল, পরী কি আপনার সঙ্গে যেতে চায়?

মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বললেন, তার আবার চাওয়া-চাওয়ি কী? আমি যেখানে যাব সেও সেখানে যাবে।

দেখা গেল পরীবানু শুধু যে একা যেতে চাচ্ছে তা-না জইতরী-কইতরী দুই বোনও যেতে চাচ্ছে। লীলাবতী বলল, তোমরা কেন যাবে?

কইতরী জবাব দিল না। জইতরী বলল, আমি যাব।

লীলাবতী বলল, কেন?

জইতরী মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না। মঞ্জু বললেন, আমার অঞ্চলে ভালো স্কুল আছে। আমি তাদের স্কুলে ভর্তি করে দিব। চোখে চোখে রাখব। এইখানে তুই ছাড়া আর কে আছে? তুই নিজেও তো সারাজীবন থাকবি না। তোর বিয়ে হবে। তুই চলে যাবি স্বামীর সংসারে। এই দুই মেয়ে এত বড় জায়গায় একা একা ঘুরবে? এটা তোর কেমন বিবেচনা?

লীলাবতী চুপ করে গেল। তার একবার বলতে ইচ্ছা করছিল, মামা, তোমার যুক্তি মানলাম। কিন্তু আমি এখানে একা পড়ে থাকব এটা তোমার কেমন বিবেচনা? সে কিছু বলল না।

মঞ্জুর সঙ্গে যাবার জন্যে আরো দুজন তৈরি হলো। একজন বদু আরেকজন নিরঞ্জন। বদু বলল, আপনি যেখানে আমি সেখানে। এখন আমারে মারেন কাটেন আপনের বিষয়। নিরঞ্জন কিছু বলল না। সে বিনা প্রয়োজনে কথা বলে না। যাওয়া বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন সে বোধ করছে না। মঞ্জু ঠিক করেছেন, নিরঞ্জনকে নিয়ে তিনি একটা ভাতের হোটেল দিবেন। হোটেলের নাম দিবেন 'হিন্দু-মুসলিম হোটেল'। হোটেলের একজন বাবুর্চি নিরঞ্জন, আরেকজন তিনি নিজে। আগের মতো দিন কাটালে এখন হবে না। আয়-রোজগারের পথ

দেখতে হবে। ছিলেন একা মানুষ, হুট করে সংসার বড় হয়েছে। সংসারে এখন আটজন মানুষ। ঝড়-তুফান। ঝড়-তুফানের মা। জইতরী-কইতরী। বদু এবং নিরঞ্জন। এর মধ্যে বদু একাই তিনজনের ভাত খায়।

মঞ্জুর ভাতের হোটেল চালু হয়েছে। হোটেলের নাম 'হিন্দু-মুসলিম হোটেল' না। পরীবানু এই নাম রাখতে দেয় নি। পরীবানুর যুক্তি হলো, হিন্দু-মুসলিম হোটেল নাম দিলে হিন্দুও সেই হোটেলে যাবে না, মুসলমানও যাবে না। মঞ্জু পরীবানুর যুক্তিতে মোহিত হলেন। হোটেলের নাম হলো 'আদর্শ হোটেল'। মঞ্জু তাঁর স্বভাব মতো এক সপ্তাহ হোটেল দেখেছেন। এখন আর কিছু দেখছেন না। এখন দেখছে পরীবানু। সে ভালোভাবেই দেখছে। হোটেল ভালো চলছে। হাটের দিনে তিনবার হাঁড়ি চড়াতে হয়। হোটেলের ভেতর কাস্টমারদের জায়গা দেওয়া যায় না। কাস্টমাররা থালা হাতে হোটেলের বাইরে বসে যায়। তিন আইটেম রান্না হয়— ভাজি, ডাল, মাংস। মাছের কোনো আইটেম এখনো চালু করা হয় নি। এর পেছনেও পরীবানুর হাত আছে। পরীবানুর যুক্তি— মাছ সবাই বাড়িতেই খায়। হোটেল-রেস্টুরেন্টে সবাই মাংস খেতে চায়।

হোটেলের বাজার এবং টাকা-পয়সার হিসাবের দায়িত্বে আছে বদু। আগে তার দিন কেটেছে শুয়ে-বসে, এখন সে নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসুতও পাচ্ছে না। রাত ন'টায় হোটেল বন্ধ করে সে ঘরে ফিরে। তার সঙ্গে হোটেলের এক কর্মচারীও (মিলন হাওলাদার, ডাক নাম হাওলু মিয়া) আসে। যার কাজ হচ্ছে, বদুর গায়ে তেল ডলা। একসময় বদুর দিন কাটত অন্যের গায়ে তেল ডলাডলি করে, এখন অন্য একজন তার গায়ে তেল ডলাডলি করছে। জীবনের এই উত্থানে সে চমৎকৃত।

রাতে তেল ডলাডলির অংশটা সে বড়ই উপভোগ করে। হাওলু মিয়া কাজটা করেও চমৎকার। সরিষার তেলে রসুন দিয়ে জ্বাল দেয়। সেই তেলের বাটি হারিকেনের উপর দিয়ে রাখে। তেল থাকে গরম। গরম তেল গায়ে ডলা হয়। আরামে বদুর চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে নানান গল্প করতে তার বড় ভালো লাগে।

হাওলু মিয়া শোনো, কাজকর্মের চাপ একটু কমলে তোমারে আমাদের অঞ্চলে নিয়া যাব। আহারে কী জায়গা! কী বিরাট বাড়ি চাচাজির! মূল বাড়ি, উত্তর বাড়ি, শহর বাড়ি। তয় ভূতের উপদ্রব।

ভূতের উপদ্রব?

ছোট বাড়িতে ভূতের উপদ্রব থাকে না। বড় বড় সব বাড়িতে জিন-ভূত থাকে। অনেক ঘর থাকে খালি, এরা আশ্রয় নেয়।

আপনে জিন-ভূত দেখছেন ?

চাচাজির বাড়িতে থাকব, জিন-ভূত দেখব না এইটা হয়!

ভয় পাইছেন ?

নাহ্। রোজ রাতে দেখলে ভয় থাকে না। দেখতে চাইলে তোমারে দেখাব। কোনো অসুবিধা নাই। বেশি ভয় পাইলে আয়াতুল কুরসি পইড়া ফুঁ দিবা। আয়াতুন কুরসি জানো তো ?

জি না।

শিখা নিবা। আয়াতুল কুরসি মুখস্থ না করলে তোমারে নিয়া যাব না। কখন কী বিপদ হয়! বিবাহ করেছ ?

জি না।

ইচ্ছা করলে আমাদের অঞ্চলে বিবাহ করতে পারো। আমাদের অঞ্চলের মেয়ে অত্যধিক সুন্দর। তাদের আদব-লেহাজও ভালো। আমি ব্যবস্থা করে দিব। আমার এককথায় বিবাহ হয়ে যাবে। চাচাজির সঙ্গে কাজ করেছি তো। আমাদের ইজ্জতই অন্যরকম। কেউ কোনো কথা ফেলব না।

হাওলু মুগ্ধ হয়ে শোনে। অতি আশ্চর্য সেই ভাটি অঞ্চলে তার যেতে ইচ্ছা করে।

মঞ্জু বাগদীর বাজারের হাট থেকে একটা ঘোড়া কিনেছেন! গাধা ধরনের ঘোড়া। সাইজে ছোট। গাধার মতোই লম্বা লম্বা কান। হাঁটা-চলার আগ্রহ খুবই কম। সে তার চার ঠ্যাঙ মাটিতে পুতে দাঁড়িয়ে থাকে। লাগাম ধরে টানাটানি, পিঠে বাড়ি কিছুতেই কাজ হয় না।

পরীবানু বিরক্ত। সে বেজার মুখে বলল, এটা কী ঘোড়া কিনেছেন। গাধা মার্কা ঘোড়া।

মঞ্জু বলেছেন, গাধা মার্কা ঘোড়াই দরকার। আমি গাধা মার্কা লোক। আমার ঘোড়াও গাধা মার্কা।

ঘোড়া কেনার আপনার দরকারটা কী ছিল ?

দরকার আছে বলেই কিনেছি। বিনা দরকারে আমি কিছু করি না। ঘোড়া আমি তোমার জন্যেও কিনি নাই। আমার জন্যেও কিনি নাই। ঝড়-তুফানের জন্যে কিনেছি। এরা ঘোড়ায় চড়া শিখবে। এরা দুইজন হেজি-পেজি না। এরা সিদ্দিক সাহেবের নাতি।

ঘোড়া উঠানে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝড়-তুফান দুই ভাই মহানন্দে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকে। এদের আনন্দ দূর থেকে দেখে পরী। আনন্দে তার চোখেও পানি আসে। সে তার জীবনের আনন্দ-সংবাদ জানিয়ে লীলাবতীকে একটি চিঠিও লিখেছে—

বুবু,

শত সহস্র সালাম। নিবেদন আমরা সকলে মঙ্গলমতো আছি। তুফান কিছুদিন কাশিতে কষ্ট পাইয়াছে। বাসক পাতার রস খাইবার পর আরোগ্য হইয়াছে। ঝড় মাশাল্লাহ ভালো আছে। অসুখ-বিসুখ তার তেমন হয় না।

এইদিকে আমি ঘর-দুয়ার গুছাইবার চেষ্টা করতেছি। আপনার মামাকে আপনি চিনেন। তিনি বিনা কাজের কাজি। সকাল হইতে নিশিরাত পর্যন্ত কর্ম ছাড়াই অতি ব্যস্ত। লাটিমের মতো ঘূর্ণনের মধ্যে আছেন। নিজের বিষয়-সম্পত্তি কী আছে কিছুই জানেন না। আমি এখানে না আসিলে সমস্তই দশভূতে লুটিয়া খাইত।

তাহার বিষয়-সম্পত্তি খারাপ না, ভালোই। বাড়ির পেছনের বাগানে সুপারি গাছ আছে একচল্লিশটা। কাঁঠাল গাছ সতেরোটা, আম গাছ সাতটা, পেয়ারা গাছ আঠারোটা।

আপনি নিশ্চয়ই আমার পত্র পাঠ করিয়া হাসিতেছেন এবং আপনার ধারণা হইয়াছে, আমার বর্তমান কাজ গাছ গোনা। ইহা সত্য। আমি এখন উনার কী আছে না আছে তাহা নিয়াই ব্যস্ত। উনার প্রতিটি জিনিসই মনে হয় আমার জিনিস। আপনাদের বিশাল ভূ সম্পত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার কোনো কিছুই আমার আপন মনে হয় নাই। বুবু, আমার কথায় মনে কষ্ট নিবেন না।

আপনার মঞ্জু মামার মা মৃত্যুকালে প্রচুর গয়না রাখিয়া গিয়াছিলেন। উনি কিছুই জানিতেন না। পুরাতন বাক্স পোঁটলা পুঁটলি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আমি তার সন্ধান পাই। স্যাকরা আনাইয়া গয়না ওজন করাইয়াছি। সর্বমোট ছাপ্পান্ন ভরি সোনার গয়না আছে।

বুবু, আপনি জইতরী-কইতরীকে নিয়া কোনো দুশ্চিন্তা করিবেন না। দুইবোন ভালো আছে। আনন্দে আছে।

বিডিবাংলা ডট কম

আপনার মামা বাড়ির পেছনের বাগানে দুই বোনের জন্য দুইটি খড়ের চালা নির্মাণ করিয়াছেন। একটির নাম দিয়াছেন কইতর মহল। অন্যটির নাম দিয়াছেন জইতর মহল। দুইবোন দিনের বেশিরভাগ সময় এই দুই চালাতে থাকে।

আপনার মঞ্জু মামার বাড়িতে পানির ভালো ব্যবস্থা ছিল না। আমি একটি টিউবওয়েল বসাইয়াছি। আল্লাহর মেহেরবানি, টিউবওয়েলের পানি অতি সুস্বাদু প্রমাণিত হইয়াছে। নিজেদের বাড়িতে টিউবওয়েল থাকা সত্ত্বেও অনেকে আমাদের টিউবওয়েলের পানি নিতে আসে। এই বাড়িতে একটি কুয়া ছিল। সংস্কারের অভাবে কুয়া বুজিয়া গিয়াছিল। আমি ঠিক করাইয়াছি এবং কুয়াতলা বাঁধাইয়া দিয়াছি। জায়গাটা এখন অতি মনোরম হইয়াছে।

বুবু, আপনাকে লেবু বাগানের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লেবু বাগান আমার শাশুড়ির নিজের হাতে করা। সারা বৎসর বাগানে লেবু থাকে। বাড়ির সামনের পুকুরের পাড়ে আমার শাশুড়ির হাতে লাগানো নারিকেল গাছ আছে ত্রিশটা। প্রতিটা গাছই ফলবতী। আগে ডাব-নারিকেল দশ ভূতে নিয়া যাইত। এখন আর হইতেছে না। পুকুরের চার দিকে কাঁটাতারের বেড়া দিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। ইনশাল্লাহ আগামী বর্ষার আগেই কার্য সমাধা করিব।

বুবু, অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি। পত্রে কোনো ভুল-ত্রুটি করিয়া থাকিলে ক্ষমা দিবেন।

ইতি—

আপনার স্নেহের হতভাগিনী

পরীবানু

আনিসের মামলা কোর্টে উঠেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর—রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ১৮৭৮ সনের আইন। ১২৮ ধারা। একই সঙ্গে অস্ত্র আইন, ১৯-ক ধারা। দুটিতেই সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন।

আনিস খুব অবাক হয়ে লক্ষ করল, তিনজন বিখ্যাত আইনজীবী তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন। এই তিনজনের একজন ব্যারিস্টার শমসের এলাহী। ক্রিমিন্যাল মামলায় যার খ্যাতি তুঙ্গস্পর্শী।

শমসের এলাহী আনিসকে প্রথম দেখাতেই বললেন, আমরা খুব বেশি কিছু আপনার জন্যে করতে পারব সেরকম মনে হয় না, তবে আপনাকে জেলে থাকার মেয়াদ কিছু কমাতে পারব। আশা করছি সাত-আট বছরে নিয়ে আসব।

আনিস বলল, আপনাদের কে নিয়োগ করেছে জানতে পারি?

শমসের এলাহী বললেন, সিদ্দিকুর রহমান বলে একজন। তবে উনি পেপার হেড। মূল পরিচালক একজন মহিলা। নাম লীলাবতী। এই নামে কেউকে চেনেন?

চিনি।

উনি কি আপনার কোনো আত্মীয়?

না।

উনারা জলের মতো অর্থব্যয় করছেন বলেই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্নটা করলাম। কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছু মনে করি নি।

উনি আপনাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন। চিঠিটা সেন্সার করতে দেয়া হয়ে গেছে। সেন্সারে যদি প্রমাণিত হয় চিঠি নির্দোষ, আপনি পেয়ে যাবেন।

ঠিক আছে।

আনিস চিঠি পেয়েছে একমাস পর।

চিঠির নানান জায়গায় তিন-চারজনের সিগনেচার। এক জায়গায় সিল মারা, লেখা Passed. লীলাবতী লিখেছে—

আনিস সাহেব,

সালাম নিন। বাবা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আপনার মামলা পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করা হয়। আমি বাবার নির্দেশ পালন করছি। উনি আপনাকে খুব পছন্দ করতেন এবং এখনো করেন।

আপনি সম্ভবত জানেন না, বাবা এক জটিল পরিস্থিতির শিকার হয়ে বর্তমানে জেল-হাজতে আছেন। ময়মনসিংহ জজ কোর্টে তাঁর মামলা চলছে। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। নানান বিষয়ে কথা হয়, সেখানে আপনার প্রসঙ্গও আসে।

বাবার কাছে শুনেছি, আপনার নাকি অভ্যাস ছিল রেললাইনে বসে থাকা। অনেকবারই তিনি দেখেছেন— আপনি রেললাইনে মাথা নিচু করে বসে আছেন। কেন বসে থাকতেন বলুন তো? আমি ঠিক করেছি, এক রাতে আপনার মতো রেললাইনে বসে থেকে দেখব ব্যাপারটা কী?

আপনার লেখা চারটা বিশাল খাতা এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে। পুলিশ সাংকেতিক কোনো লেখা মনে করে সীজ করেছিল, পরে আমাকে দিয়ে দিয়েছে।

চারটি খাতায় আপনি মোট কতবার 'লীলাবতী' নামটি লিখেছেন আমি গুনেছি। হাতে এখন আমার প্রচুর অবসর। কোনো কাজ নেই বলেই এই কাজটি করা। লীলাবতী নামটি সর্বমোট কতবার লেখা তা আমি এখন জানি। আপনি কি জানেন? আপনি চাইলে খাতা চারটি পাঠাতে পারি, আপনি গুনে দেখতে পারেন।

ভালো কথা, চার নম্বর খাতার শেষ তিনটা পৃষ্ঠা খালি। আপনি কি লেখার সময় পান নি? না-কি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন? শেষের তিনটা সাদা পাতা দেখে মন খারাপ হয়। মনে হয় বিরাটা একটা কাজ (!) অসম্পূর্ণ থেকে গেল। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে অসম্পূর্ণ কাজটা নিজেই সম্পূর্ণ করি। তিনটা পাতা আমি নিজেই লিখে ফেলি। আবার মনে হয়, এটা ঠিক হবে না। আমার হাতের লেখা আপনার মতো সুন্দর না। তাছাড়া নিজের নাম লিখতে সংকোচও লাগে।

সবচে' ভালো হয় কী জানেন? সবচে' ভালো হয় আপনি যদি কোনো একদিন চলে আসেন। জেলখানা থেকে একসময় না একসময় ছাড়া তো পাবেনই। চলে আসবেন আমাদের এখানে। শেষ তিন পৃষ্ঠা লিখে আপনার চার খণ্ডের বড় একটি কাজের সমাপ্তি টানবেন।

আমি অপেক্ষা করে থাকব।

বিনীতা
লীলাবতী

WWW.BDBANGLA.COM

লীলাবতী মূল বাড়ির উঠানে বসে আছে। সে মজার একটা দৃশ্য দেখছে। তার সামনে হাত পঁচিশেক দূরে একটা কাঁঠালগাছ। কাঁঠালগাছের নিচে গর্তমতো হয়েছে। বর্ষার পানি জমেছে গর্তে। সেই পানিতে একটা কাক গোসল করছে। গোসল সারছে অতি ব্যস্ততায়। ঠোঁটে পানি নিয়ে পালকে মাখছে। কাকের স্নান মুগ্ধ হয়ে দেখার কিছু না। অস্বাভাবিক কোনো দৃশ্য না। সব পাখিই স্নান করে। তবে কাকের বিশেষত্ব তার তাড়াহুড়ায়। কাকের স্নান দেখলে মনে হয়, জরুরি কোনো কাজ ফেলে সে এসেছে, তাকে অতি দ্রুত চলে যেতে হবে। তারপরেও এই দৃশ্যটা লীলাবতী মুগ্ধ চোখে দেখছে অন্য কারণে। কাকের স্নান দেখার জন্যে অন্য আরেকটা কাক পাশে বসে আছে। সে ঘাড় বাঁকিয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে কা কা করছে।

লোকমান এসে লীলাবতীর পাশে দাঁড়াল। লীলাবতী বলল, লোকমান ভাই, আপনি পুরুষ কাক কোনটা আর মেয়ে কাক কোনটা বুঝতে পারেন? যে কাকটা গোসল করছে সে ছেলে না মেয়ে?

লোকমান না-সূচক মাথা নাড়ল।

লীলাবতী বলল, মাথা নেড়ে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন? আপনি জানেন না?

জানি না।

আমার ধারণা যে কাকটা গোসল করছে সেটা মেয়ে কাক। দেখুন সাইজে ছোট।

কিছু খাবেন আপা?

না।

আজ দুপুরে কি জঙ্গলে খাবেন?

তাও জানি না। এখন আপনি সামনে থেকে যান। আপনাকে সবসময় আমার চোখের সামনে থাকতে হবে না।

লোকমান সরে গেল। লীলাবতী আবার তাকালো কাকটার দিকে। প্রথম কাকটার গোসল হয়ে গেছে, এখন দ্বিতীয় কাকটা গোসল করছে। এটাও মনে হয় বিস্মিত হবার মতো ঘটনা। গর্তটা দুটা কাকের একসঙ্গে গোসল করার মতো

বড় ছিল। তারা তা করল না কেন? তাদের মধ্যেও কি সৌজন্যবোধের কোনো ব্যাপার আছে?

লীলাবতী উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল স্নানরত কাকটার দিকে। তাকে দেখলে একসময় তারা দুজন ভয় পেয়ে উড়ে চলে যাবে। ভয়টা কখন পাবে এটা তার পরীক্ষা করার ইচ্ছা। সব পাখি মানুষকে সমান ভয় পায় না। কোনো পাখি হয়তো তার দশ গজের কাছাকাছি আসতে দেবে। আবার কেউ দেবে পাঁচ গজ পর্যন্ত। পাখিদের ভয়ের একটা স্কেল তৈরি করা যেতে পারে।

কাক ১০ গজ

শালিক ১৫ গজ

বক ২০ গজ

লীলাবতী কাক দুটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এরা নড়ছে না। দুজনই বিরক্ত হয়ে তাকে দেখছে কিন্তু ভয় পাচ্ছে না। জংলা ভিটার পাখিরা তাকে ভয় পায় না। সেখানে লীলাবতীর জন্যে চেয়ার-টেবিল রাখা হয়েছে। চিঠি লেখার ব্যবস্থা। মাসে একটি চিঠি সে তার বাবাকে লিখতে পারে। চিঠি সে জঙ্গলের ভেতর সাজিয়ে রাখা চেয়ার-টেবিলে বসে লেখে। পাশেই বড় পাটিপাতা বড় চৌকি। শুয়ে বিশ্রাম করার জন্য রাখা। সে যখন চিঠি লেখে তখন চৌকিতে ধান ছিটিয়ে দেয়। দুনিয়ার পাখি নেমে আসে। লীলাবতীকে জঙ্গলের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় লিখতে হয়। লিখতে হয় বলা ঠিক হয় নি। সিদ্দিকুর রহমান কখনো মেয়েকে এই বিষয়ে কিছু লিখতে বলেন নি। লীলাবতী নিজ থেকেই লেখে। যে মানুষটা হাজতের অতি ক্ষুদ্র একটা ঘরে আটকা পড়ে গেছেন, তার কাছে একটা খোলা জানালা নিয়ে যাওয়া।

'বাবা, মাছরাঙ্গা পাখি যে ফুল খায়— এই তথ্য কি আপনি জানেন? মাছরাঙ্গা পাখি মাছ খায়— এটাই আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমি নিজে ফুল খেতে দেখেছি। জঙ্গলের মাঝামাঝি ডোবার মতো যে জায়গা আছে, সেখানে ছোট ছোট লতানো গাছে ফুল ফুটেছে। ফুলের রঙ নীল। মাছরাঙ্গা পাখিকে দেখলাম শাঁ করে আকাশ থেকে নেমে ঠোঁটে ফুল নিয়ে উড়ে চলে গেল। আমি যে শুধু একবার ঘটনাটা দেখেছি তা না। অনেকবার দেখেছি। কচুরিপানার ফুল ছিঁড়ে নিতেও দেখেছি।

ফুলের বিষয়ে আরেকটা মজার কথা বলি। বনের একেবারে শেষ মাথায় যেখানে কয়েকটা তালগাছ আছে সেই জায়গায় ঝোপমতো জায়গায় কিছু সাদা ফুল ফুটেছে। ফুলগুলি লম্বাটে ধরনের। ফুলের গোড়ায় এবং গাছে প্রচুর কাঁটা। আমি ফুল ছিঁড়ে হাতে নিলাম। গন্ধ শুকলাম। মিষ্টি গন্ধ। অনেকটা খেজুর গুড়ের

গন্ধের মতো। তারপরই সমস্যা শুরু হলো। যে সব জায়গায় ফুলটা লেগেছে সে সব জায়গায় হঠাৎ চুলকানি এবং জ্বলুনি শুরু হলো। আমার হাত গেল ফুলে। গন্ধ শোকার সময় নাকেও ফুল লেগেছিল। নাকও ফুলে গেল। নিঃশ্বাস নিতে পারি না এমন অবস্থা। ফুলটা আমি অনেককে দেখিয়েছি। কেউ নাম বলতে পারে না। আমি একটা বইয়ের ভেতর ফুলটা রেখে বই চাপা দিয়ে ফুল শুকিয়েছি। আপনাকে আবার যখন দেখতে আসব, ফুলটা সঙ্গে করে নিয়ে আসব। এই ফুলের নিশ্চয়ই কোনো নাম আছে, আমি নাম দিয়েছি বিষফুল।...'

লীলাবতীর চিঠি দীর্ঘ হয়। সেইসব দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কিছু লেখা থাকলেও তার নিজের কথা কিছুই থাকে না। সে লেখে না যে, আমি একটি বিশাল বাড়িতে সম্পূর্ণ একা থাকি। আমাকে পাহারা দেবার জন্যে লাঠি হাতে লোকমান ভাই শুধু একা উঠানে বসে থাকেন।

এই বাড়িতে কেউ আসে না। সবাই ভয় পায়। বাড়িতে নাকি জিন-ভূত-প্রেত ঘুরে বেড়ায়। যে দু'তিনজন গ্রামের মহিলাকে লোকমান নিয়ে এসেছিল তারা সবাই চলে গেছে। তারা নাকি নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেছে। নিশিরাতে সাদা কাপড় পরা লম্বা লম্বা মানুষরা নাকি উঠানে হাঁটাহাঁটি করে।

নিশিরাতের শূন্য বাড়ির বিশাল খাটের মাঝখানে বসে মাঝে মাঝেই লীলার মনে হয়, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একদিন বাবাকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখতে আসাটা কি ভুল ছিল ? নাকি এটা ছিল পূর্ব নির্ধারিত ? সে আসবে এবং মাকড়সার জালে পোকা আটকে পড়ার মতো আটকে যাবে।

লীলার যখন সাত বছর বয়স সে থাকত তার মামার বাড়িতে, তখন তাদের অনেকগুলি রাজহাঁস ছিল। এদের মধ্যে একটা কী কারণে যেন অন্ধ হয়ে গেল। হাঁটতে পারত না। মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেত। শুধু যখন কেউ তাকে ধরে পুকুরের পানিতে ছেড়ে দিত, সে স্বস্তি পেত। একা একা নিজের মনে সাঁতার কাটত। এখন লীলার মনে হয়, সে নিজেই অন্ধ রাজহাঁস। অন্ধ রাজহাঁসটা একা একা দিঘির শান্ত জলে ঘুরত, সে হয়তো অপেক্ষা করত কিছু একটা ঘটবে, বদলে যাবে তার পৃথিবী। লীলাও অপেক্ষা করে। আমরা সবাই অপেক্ষা করি। প্রকৃতি তার মানব সন্তান তৈরিই করেছে অপেক্ষা করার জন্যে।

—

বিডিবাংলা ডট কম